উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্‌
নিবোধত

১৩/১৮/৭৩

উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০-০০৩

মাঘ, ১৩৮০
৭৬তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

স্থায়িত্ব ও
কর্ম্মক্ষমতার জন্য

বিশ্বের
শ্রেষ্ঠ ব্যাটারী

তাই এক্সাইড ব্যাটারীর সুনাম
এবং চাহিদা সবচেয়ে বেশী

*

পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান সার্ভিস এজেন্ট—

দি হাওড়া মোটর কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ

২২, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১

ফোন : ২৩-৭১৪৭

অন্যান্য শাখা | শিলিগুড়ি * মালদহ * পাটনা * ধানবাদ * কটক
বহরমপুর (গঞ্জাম) * দিল্লী * গৌহাটী

উদ্বোধন, মাঘ

সূচীপত্র

নূতন পুস্তক ! সদ্য প্রকাশিত !

নারদীয় ভক্তিসূত্র

স্বামী প্রভবানন্দ

[ক্রিষ্টোফার ঈশারউড্ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত]

স্বামী প্রভবানন্দ রচিত Narada's Way of Divine Love গ্রন্থের শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ কৃত বঙ্গানুবাদ। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে সরল ভাষায় মূল সূত্রগুলির ব্যাখ্যার সময় স্বামী প্রভবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণের সান্নিধ্যলাভকালে তাঁহাদের মুখে আলোচ্য প্রসঙ্গে যে সব কথা শুনিয়াছিলেন তাহা, এবং তাঁহাদের জীবনের বহু ঘটনাও যথাযোগ্যস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে সূত্রগুলির অর্থ সহজবোধ্য এবং গ্রন্থটি ভক্তগণের পক্ষে অতি উপাদেয় হইয়াছে।

পৃঃ ১৬৪ + ১৬ ; সুদৃশ্য প্রচ্ছদ, ভাল কাগজে ছাপা।

মূল্য : শোভন সংস্করণ ৭.৫০ টাকা ; সাধারণ সংস্করণ ৫৲ টাকা।

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর

স্বামী বুধানন্দ

মূল্য : পঞ্চাশ পয়সা

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

নিত্যপাঠ্য কয়েকখানি গ্রন্থ

সারদা-রামকৃষ্ণ

"যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম"

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

যুগান্তর : সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত। গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥

বহু চিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ : অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। একই সঙ্গে ঈশ্বরানুভূতির এমন মূর্ত প্রতীক এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী আদর্শ চরিত্রের পুণ্যবতী নারী এযুগে বিরল। ..."দুর্গামা" জীবনচরিতখানি একবার অন্ততঃ পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—এককথায় অপরিহার্য॥ বহুচিত্রে শোভিত—৮৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত।

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা : ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥

বহুচিত্রে শোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৬৲

সাধনা

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে

দেশ : সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি, বহু সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক (এবারে সাড়ে তিন শতাধিক) মনোহর বাংলা ও হিন্দী সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক ভাবোদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত এবং আবৃত্তিযোগ্য রচনাও ইহাতে আছে॥ পরিবর্ধিত সংস্করণ—৬৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা—৪

সূচীপত্র

নব প্রকাশিত পুস্তক—

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

ধর্মসমীক্ষা—১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা—১৩০ মূল্য—২.৫০

ধর্মবিজ্ঞান—৭ম সংস্করণ পৃষ্ঠা—১০২ মূল্য—২.০০

বেদান্তের আলোকে—১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা—৮১ মূল্য—১.৫০

বাহির হইল বাহির হইল

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী

স্বামী গম্ভীরানন্দ

২য় ভাগ ষষ্ঠ সংস্করণ পৃষ্ঠা—৪৪৮ মূল্য—৭.৫০

৩য় ভাগ পঞ্চম সংস্করণ পৃষ্ঠা—৪৫৮ মূল্য—৭.৫০

প্রাপ্তিস্থান :

উদ্বোধন কার্যালয়—১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্মসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মবক্তা ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, এম. এ. পি. এইচ. ডি., ডি. লিট মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্মীয় অবদান—

১। গীতাধ্যান (ছয় খণ্ড)—প্রতি খণ্ড ২·৫০, ৪র্থ খণ্ড ২·০০। ২। গৌরকথা (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড—২·০০। ৩। সপ্তশতীসমন্বিত চণ্ডীচিন্তা—৪.০০ ৪। উদ্ধবসন্দেশ—৩·০০। ৫। শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০ম স্কন্ধ, ১ম খণ্ড—১৫.০০, ২য় খণ্ড—৮.৫০, ৩য় খণ্ড—৮.৫০। ৬। মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ—২.৫০। ৭। উপনিষদ্ ভাবনা ১ম খণ্ড—৫·০০ ও অন্যান্য রসসমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান : ১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়—৫৯ মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। ৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন
দেশী বিদেশী বহু কাগজের ভাণ্ডার

এইচ, কে, ঘোষ অ্যাণ্ড কোং

২৫এ, সোয়ালো লেন, কলিকাতা-১
টেলিফোন : ২২-৫২০১

উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৮০

সূচীপত্র

নূতন পুস্তক ! সদ্য প্রকাশিত !

নারদীয় ভক্তিসূত্র

স্বামী প্রভবানন্দ

[ক্রিস্টোফার ঈশারউড্ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত]

স্বামী প্রভবানন্দ রচিত Narada's Way of Divine Love গ্রন্থের শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ কৃত বঙ্গানুবাদ। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে সরল ভাষায় মূল সূত্রগুলির ব্যাখ্যার সময় স্বামী প্রভবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণের সান্নিধ্যলাভকালে তাঁহাদের মুখে আলোচ্য প্রসঙ্গে যে সব কথা শুনিয়াছিলেন তাহা, এবং তাঁহাদের জীবনের বহু ঘটনাও যথাযোগ্যস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে সূত্রগুলির অর্থ সহজবোধ্য এবং গ্রন্থটি ভক্তগণের পক্ষে অতি উপাদেয় হইয়াছে।

পৃঃ ১৬৪ + ১৬ ; সুদৃশ্য প্রচ্ছদ, ভাল কাগজে ছাপা।

মূল্য : শোভন সংস্করণ ৭.৫০ টাকা ; সাধারণ সংস্করণ ৫্ টাকা।

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর

স্বামী বুধানন্দ

মূল্য : পঞ্চাশ পয়সা

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

নিত্যপাঠ্য কয়েকখানি গ্রন্থ

সারদা-রামকৃষ্ণ

"যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম"
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।
যুগান্তর : সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত। গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥
বহু চিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।
শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।
বেতার জগৎ : অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। একই সঙ্গে ঈশ্বরানুভূতির এমন মূর্ত প্রতীক এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী আদর্শ চরিত্রের পুণ্যবতা নারী এযুগে বিরল। ..."দুর্গামা" জীবনচরিতখানি একবার অন্ততঃ পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—এককথায় অপরিহার্য॥ বহুচিত্রে শোভিত—৮৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত।
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।
আনন্দবাজার পত্রিকা : ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥
বহুচিত্রে শোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫৲

সাধনা

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে
দেশ : সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি, বহু সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক (এবারে সাড়ে তিন শতাধিক) মনোহর বাঙলা ও হিন্দী সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক ভাবোদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত এবং আবৃত্তিযোগ্য রচনাও ইহাতে আছে॥ পরিবর্ধিত সংস্করণ—৬৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা—৪

স্বামী বিবেকানন্দের অনুধ্যান!

স্বামীজী সম্পর্কে অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ

বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

॥ মোহিতলাল মজুমদার। ২য় সং পাঁচ টাকা॥

যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ

॥ স্বামী অপূর্বানন্দ। ২য় সং তিন টাকা॥

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ

॥ মণি বাগচি। ২য় সং দুই টাকা॥

[জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত ও পরিবেশিত]

। জেনারেল বুকস্ ।

এ-৬৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

নব প্রকাশিত পুস্তক—

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

ধর্মসমীক্ষা—১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা—১৩০ মূল্য—২.৫০

ধর্মবিজ্ঞান—৭ম সংস্করণ পৃষ্ঠা—১০২ মূল্য—২.০০

বেদান্তের আলোকে—১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা—৮১ মূল্য—১.৫০

বাহির হইল বাহির হইল

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী

স্বামী গম্ভীরানন্দ

২য় ভাগ ষষ্ঠ সংস্করণ পৃষ্ঠা—৪৪৮ মূল্য—৭.৫০

৩য় ভাগ পঞ্চম সংস্করণ পৃষ্ঠা—৪৫৮ মূল্য—৭.৫০

প্রাপ্তিস্থান :

উদ্বোধন কার্যালয়—১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩

MAKING MACHINES

KUSUM

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্মসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমবক্তা ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, এম. এ. পি. এইচ. ডি., ডি. লিট মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্মীয় অবদান—

১। গীতাধ্যান (ছয় খণ্ড)—প্রতি খণ্ড ২.৫০, ২। গৌরকথা (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড—২.০০ ৩। সপ্তশতীসমন্বিত চণ্ডীচিন্তা—৪.০০। ৪। উদ্ধবসন্দেশ—৩.০০। ৫। শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০ম স্কন্ধ, ১ম খণ্ড—১৫.০০, ২য় খণ্ড হইতে ৪র্থ খণ্ড পর্যান্ত প্রতি খণ্ড—৮.৫০, ৬। মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ—২.৫০। ৭। উপনিষদ্ ভাবনা ১ম খণ্ড—৫.০০ ও অন্যান্য রসসমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান : ১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়—৫৯ মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। ৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন
দেশী বিদেশী বহু কাগজের ভাণ্ডার

এইচ, কে, ঘোষ অ্যাণ্ড কোং

২৫এ, সোয়ালো লেন, কলিকাতা-১
টেলিফোন : ২২-৫২০৭

উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৮০

সূচীপত্র

নূতন পুস্তক ! সদ্য প্রকাশিত !

নারদীয় ভক্তিসূত্র

স্বামী প্রভবানন্দ

[ক্রিস্টোফার ঈশারউড্-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত]

স্বামী প্রভবানন্দ রচিত Narada's Way of Divine Love গ্রন্থের শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ কৃত বঙ্গানুবাদ। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থটিতে সরল ভাষায় মূল সূত্রগুলির ব্যাখ্যার সময় স্বামী প্রভবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণের সান্নিধ্যলাভকালে তাঁহাদের মুখে আলোচ্য প্রসঙ্গে যে সব কথা শুনিয়াছিলেন তাহা, এবং তাঁহাদের জীবনের বহু ঘটনাও যথাযোগ্যস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে সূত্রগুলির অর্থ সহজবোধ্য এবং গ্রন্থটি ভক্তগণের পক্ষে অতি উপাদেয় হইয়াছে।

পৃঃ ১৬৪ + ১৬ ; সুদৃশ্য প্রচ্ছদ, ভাল কাগজে ছাপা।

মূল্য : শোভন সংস্করণ ৭.৫০ টাকা ; সাধারণ সংস্করণ ৫৲ টাকা।

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর

স্বামী বুধানন্দ

মূল্য : পঞ্চাশ পয়সা

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

নিত্যপাঠ্য কয়েকখানি গ্রন্থ

সারদা-রামকৃষ্ণ

"যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম"
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

যুগান্তর : সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত। গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥

বহু চিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।
শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ : অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। একই সঙ্গে ঈশ্বরানুভূতির এমন মূর্ত প্রতীক এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী আদর্শ চরিত্রের পুণ্যবতী নারী এযুগে বিরল। ..."দুর্গামা" জীবনচরিতখানি একবার অন্তত: পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—এককথায় অপরিহার্য॥ বহুচিত্রে শোভিত—৮৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত।
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা : ইহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥

বহুচিত্রে শোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫৲

সাধনা

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে

দেশ : সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি, বহু সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক (এবারে সাড়ে তিন শতাধিক) মনোহর বাংলা ও হিন্দী সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক ভাবোদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত এবং আবৃত্তিযোগ্য রচনাও ইহাতে আছে॥ পরিবর্ধিত সংস্করণ—৬৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা—৪

Gram : DYNOLIGHT

Phone : 23-4387
23-7774

With the Compliments of

GOSWAMI & CO.

**14, BENTINCK STREET,
CALCUTTA-1**

Dealers in : Cycle & Accessories

সূচীপত্র

নব প্রকাশিত পুস্তক—

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

ধর্মসমীক্ষা—১ম সংস্করণ　পৃষ্ঠা—১৩০　মূল্য—২.৫০

ধর্মবিজ্ঞান—৭ম সংস্করণ　পৃষ্ঠা—১০২　মূল্য—২.০০

বেদান্তের আলোকে—১ম সংস্করণ　পৃষ্ঠা—৮১　মূল্য—১.৫০

বাহির হইল　　　　বাহির হইল

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী

স্বামী গম্ভীরানন্দ

২য় ভাগ　ষষ্ঠ সংস্করণ　পৃষ্ঠা—৪৪৮　মূল্য—৭.৫০

৩য় ভাগ　পঞ্চম সংস্করণ　পৃষ্ঠা—৪৫৮　মূল্য—৭.৫০

প্রাপ্তিস্থান :

উদ্বোধন কার্যালয়—১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩

CRUSHING & GRINDING MACHINES

Rotary Crusher	Pan Mill
Jaw Crusher	Edge Runner Mill
Roller Crusher	Rod Mill
Disintegrator	Pot Mill

Grinding Cylinder (Ball Mill)
Continuous Ball Mill

KUSUM ENGINEERING CO. LTD.

25, Swallow Lane,
Calcutta-1

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্মসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মবক্তা **ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী,** এম. এ. পি. এইচ. ডি., ডি. লিট মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্মীয় অবদান—

১। **গীতাধ্যান** (ছয় খণ্ড)—প্রতি খণ্ড ২.৫০, । ২। **গৌরকথা** (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড—২.০০ । ৩। **সপ্তশতীসমন্বিত চণ্ডীচিন্তা**—৪.০০ । ৪। **উদ্ধবসন্দেশ**—৩.০০ । ৫। **শ্রীমদ্ভাগবতম্** ১০ম স্কন্ধ, ১ম খণ্ড—১৫.০০, ২য় খণ্ড হইতে ৪র্থ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রতি খণ্ড—৮.৫০, ৬। **মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ**—২.৫০। ৭। উপনিষদ্ ভাবনা ১ম খণ্ড—৫.০০ ও অন্যান্য রসসমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান : ১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়—৫৯ মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। ৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন
দেশী বিদেশী বহু কাগজের ভাণ্ডার

এইচ, কে, ঘোষ অ্যাণ্ড কোং

২৫এ, সোয়ালো লেন, কলিকাতা-১
টেলিফোন : ২২-৫২০১

উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৮১

সূচীপত্র

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন

বৈষ্ণবাচার্য্য ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারিজীর

গীতা, চণ্ডী ও উপনিষদের

অপূর্ব ব্যাখ্যা :

১। **গীতাধ্যান** (৬ খণ্ড) ... ৫.০০

২। **চণ্ডীচিন্তা** ৪.০০

৩। **উপনিষদ্ ভাবনা** (১ম খণ্ড) ... ৫.০০

প্রাপ্তিস্থান :

১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়

৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪

২। মহেশ লাইব্রেরী

২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নিত্যপাঠ্য কয়েকখানি গ্রন্থ

সারদা-রামকৃষ্ণ

"যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম"

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

যুগান্তর : সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত। গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে ॥

বহু চিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ : অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। একই সঙ্গে ঈশ্বরানুভূতির এমন মূর্ত প্রতীক এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী আদর্শ চরিত্রের পুণ্যবতা নারী এযুগে বিরল। ···"দুর্গামা" জীবনচরিতখানি একবার অন্ততঃ পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—এককথায় অপরিহার্য ॥ বহুচিত্রে শোভিত—৮৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত।

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা : ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন ॥

বহুচিত্রে শোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৪৲

সাধনা

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে

দেশ : সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি, বহু সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক (এবারে সাড়ে তিন শতাধিক) মনোহর বাঙলা ও হিন্দী সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক ভাবোদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত এবং আবৃত্তিযোগ্য রচনাও ইহাতে আছে॥ পরিবর্ধিত সংস্করণ—৬৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ
পাইওনীয়ার বিল্ডিংস্, কলিকাতা-২
ফোন : ৫৬-২৯৮৩

সূচীপত্র

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

ধর্মসমীক্ষা—১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা—১৩০ মূল্য—২.৫০

ধর্মবিজ্ঞান—৭ম সংস্করণ পৃষ্ঠা—১০২ মূল্য—২.০০

বেদান্তের আলোকে—১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা—৮১ মূল্য—১.৫০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী

স্বামী গম্ভীরানন্দ

২য় ভাগ ষষ্ঠ সংস্করণ পৃষ্ঠা—৪৪৮ মূল্য—৭.৫০

৩য় ভাগ পঞ্চম সংস্করণ পৃষ্ঠা—৪৫৮ মূল্য—৭.৫০

প্রাপ্তিস্থান :

উদ্বোধন কার্যালয়—১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩

Free ! Free !! Free !!!

ধবল বা শ্বেত চিকিৎসা

পণ্ডিতেরা বলেছেন, কোন পরিশ্রমই বৃথা যায় না। বৎসরাধিক দৃঢ় প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফলে আমরা সাদা দাগের ঔষধের ওপর আধিপত্য লাভ করেছি। এই ঔষধ এত কার্যকরী যে একবার ব্যবহার করলেই এর সুফল পাওয়া যায়। আপনি নিজে একবার মাত্র ব্যবহার করে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখুন। সহস্রাধিক ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন। প্রচারের জন্য এক শিশি ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। শীঘ্র লিখুন। নকলকারীদের কাছ থেকে সাবধান হউন।

PREM TRADING COMPANY (S. N.) M.

P. O. Katrisarai (Gaya) **India**

KUSUM

CRUSHING & GRINDING MACHINES

Rotary Crusher	Pan Mill
Jaw Crusher	Edge Runner Mill
Roller Crusher	Rod Mill
Disintegrator	Pot Mill

Grinding Cylinder (Ball Mill)
Continuous Ball Mill

KUSUM ENGINEERING CO. LTD.

25, Swallow Lane,
Calcutta-1

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্মসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মবক্তা **ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী,** এম. এ. পি. এইচ. ডি., ডি. লিট মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্মীয় অবদান—

১। **গীতাধ্যান** (ছয় খণ্ড)—প্রতি খণ্ড ২.৫০, । ২। **গৌরকথা** (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড—২.০০ । ৩। **সপ্তশতীসমন্বিত চণ্ডীচিন্তা**—৪.০০ । ৪। **উদ্ধবসন্দেশ**—৩.০০ । ৫। **শ্রীমদ্ভাগবতম্** ১০ম স্কন্ধ, ১ম খণ্ড—১৫.০০, ২য় খণ্ড হইতে ৪র্থ খণ্ড পর্যন্ত প্রতি খণ্ড – ৮.৫০, ৬। **মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ**—২.৫০। ৭। উপনিষদ্ ভাবনা ১ম খণ্ড—৫ ০০ ও অন্যান্য রসসমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান : ১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়—৫৯ মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। ৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন
দেশী বিদেশী বহু কাগজের ভাণ্ডার

এইচ, কে, ঘোষ অ্যাণ্ড কোং

২৫এ, সোয়ালো লেন, কলিকাতা-১

টেলিফোন : ২২-৫২০৯

উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১

সূচীপত্র

বাহির হইল   বাহির হইল

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি

ভগিনী নিবেদিতা

পঞ্চম সংস্করণ

পৃষ্ঠা—৩৬১ :   মূল্য—৬.০০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

(দুই খণ্ড একত্রে)

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

তৃতীয় সংস্করণ

পৃঃ—২৫৮   মূল্য—৪.৫০

নিত্যপাঠ্য কয়েকখানি গ্রন্থ

সারদা-রামকৃষ্ণ

"যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম"

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত

যুগান্তর : সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত। গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥

বহু চিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত

বেতার জগৎ : অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। একই সঙ্গে ঈশ্বরানুভূতির এমন মূর্ত প্রতীক এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী আদর্শ চরিত্রের পুণ্যবতী নারী এযুগে বিরল। ..."দুর্গামা" জীবনচরিতখানি একবার অন্ততঃ পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—এককথায় অপরিহার্য॥ বহুচিত্রে শোভিত—৮৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত।

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা : ইহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥

বহুচিত্রে শোভিত পঞ্চম মুদ্রণ— ৫৲

সাধনা

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে

দেশ : সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী রামায়ণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি, বহু সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক (এবারে সাড়ে তিন শতাধিক) মনোহর বাংলা ও হিন্দী সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক ভাবোদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত এবং আবৃত্তিযোগ্য রচনাও ইহাতে আছে॥ পরিবর্ধিত সংস্করণ—৬৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা- ৪

PIONEER
VESTS

are
hygienically
bleached

**EVERY BODY
NEEDS PIONEER VESTS**

They are standard in size too

PIONEER KNITTING MILLS LTD.
Pioneer Buildings, Calcutta-2

সূচীপত্র

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

ধর্মসমীক্ষা—১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা—১৩০ মূল্য—২.৫০

ধর্মবিজ্ঞান—৭ম সংস্করণ পৃষ্ঠা—১০২ মূল্য—২.০০

বেদান্তের আলোকে—১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা—৮১ মূল্য—১.৫০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী

স্বামী গম্ভীরানন্দ

২য় ভাগ ষষ্ঠ সংস্করণ পৃষ্ঠা—৪৪৮ মূল্য—৭.৫০

৩য় ভাগ পঞ্চম সংস্করণ পৃষ্ঠা—৪৫৮ মূল্য ৭.৫০

প্রাপ্তিস্থান :

উদ্বোধন কার্যালয়—১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩

Free ! Free !! Free !!!

ধবল বা শ্বেত চিকিৎসা

পণ্ডিতেরা বলেছেন, কোন পরিশ্রমই বৃথা যায় না। বৎসরাধিক দৃঢ় প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফলে আমরা সাদা দাগের ঔষধের ওপর আধিপত্য লাভ করেছি। এই ঔষধ এত কার্যকরী যে একবার ব্যবহার করলেই এর সুফল পাওয়া যায়। আপনি নিজে একবার মাত্র ব্যবহার করে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখুন সহস্রাধিক ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন। প্রচারের জন্য এক শিশি ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। শীঘ্র লিখুন। নকলকারীদের কাছ থেকে সাবধান হউন।

PREM TRADING COMPANY (S. N.) M.

P. O. Karrisarai (Gaya) **India**

উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩৮১

সূচীপত্র

নূতন বই ! নূতন বই !

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

[যন্ত্রস্থ ; জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহের পর পাওয়া যাইবে]

'শিশুদের বিবেকানন্দ'-র মতো শিশুদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় লিখিত ও প্রতিটি লেখার সঙ্গে চারিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্র শোভিত। প্রতি পৃষ্ঠায় ছবি ও তাহার পাশে লেখা ; এরূপ ৩৯টি চিত্রে ও লেখায় শ্রীরামকৃষ্ণজীবন পরিবেশিত। চারিবর্ণে মুদ্রিত সুদৃশ্য প্রচ্ছদ পিছনে বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের নতুন ফটো চারিবর্ণে মুদ্রিত। মোটা ম্যাপ লিথো কাগজে ছাপা। সাইজ ক্রাউন ৪। পৃষ্ঠা ৪০। দাম তিন টাকা।

উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৩

নিত্যপাঠ্য কয়েকখানি গ্রন্থ

সারদা-রামকৃষ্ণ

"যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম"
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

যুগান্তর : সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত। গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥

বহু চিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।
শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ : অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। একই সঙ্গে ঈশ্বরানুভূতির এমন মূর্ত প্রতীক এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন-মহীয়সী আদর্শ চরিত্রের পুণ্যবতা নারী এযুগে বিরল। …"দুর্গামা" জীবনচরিতখানি একবার অন্ততঃ পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—এককথায় অপরিহার্য॥ বহুচিত্রে শোভিত—৮৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত।
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা : ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন।

বহুচিত্রে শোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫৲

সাধনা

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে

দেশ : সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি, বহু সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক (এবারে সাড়ে তিন শতাধিক) মনোহর বাঙলা ও হিন্দী সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক ভাবোদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত এবং আবৃত্তিযোগ্য রচনাও ইহাতে আছে॥ পরিবর্ধিত সংস্করণ—৬৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা—৪

সূচীপত্র

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

ধর্মসমীক্ষা—১ম সংস্করণ　পৃষ্ঠা—১৩০　মূল্য—২.৫০

ধর্মবিজ্ঞান—৭ম সংস্করণ　পৃষ্ঠা—১০২　মূল্য—২.০০

বেদান্তের আলোকে—১ম সংস্করণ　পৃষ্ঠা—৮১　মূল্য—১.৫০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী

স্বামী গম্ভীরানন্দ

২য় ভাগ　ষষ্ঠ সংস্করণ　পৃষ্ঠা—৪৪৮　মূল্য—৭.৫০

৩য় ভাগ　পঞ্চম সংস্করণ　পৃষ্ঠা—৪৫৮　মূল্য—৭.৫০

প্রাপ্তিস্থান :

উদ্বোধন কার্যালয়—১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩

বাহির হইল　　　　বাহির হইল

স্তবকুসুমাঞ্জলি

স্বামী গম্ভীরানন্দ

পৃঃ—৪০৮　　৮ম সংস্করণ　　মূল্য—৭.০০

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্যালয়,

১নং উদ্বোধন লেন

কলিকাতা ৭০০-০০৩

যুগনায়ক বিবেকানন্দ

২য় সংস্করণ

স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত

সাইজ — মিডিয়াম

মূল্য পুরা সেট ১৮৲ টাকা ;
প্রতি খণ্ড ৮৲ আট টাকা

১ম খণ্ড — ৪৭৪ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড — ৪৯০ পৃষ্ঠা
৩য় খণ্ড - ৪৮৪ পৃষ্ঠা

তিন খণ্ড একত্র লইলে — ২৩৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান — উদ্বোধন কার্যালয়,
১, উদ্বোধন লেন কলিকাতা ৭০০ ০০৩

চতুর্দশ খণ্ড বাহির হইল !

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ বিরচিত

শ্রীম-দর্শন

॥ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'কার কর্তৃক কথামৃতের ব্যাখ্যা ॥

এই খণ্ডে আছে : গায় মানুষ, ফিরে দেবতা ; আহবা , বেদান্তবক্তা 'কালী তপস্বী' ; একদিকে জগন্নাথ, অন্যদিকে বেদান্ত ; পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু খাওয়া , চৈতন্যদেবের লীলাভূমি পুরী ; জগন্নাথের আহ্বান , শ্রীক্ষেত্রে ক্রাইস্টের জন্মদিনে , গির্জায় ও সিদ্ধাশ্রমে , দেবত্বের সন্ধানে — ক্রাইস্ট ও রামকৃষ্ণ ; এই ব্রহ্মজ্ঞান যাবে ওয়েস্টে, তবে তাঁরা বাঁচবে ; নকুলতলে ব্রহ্ম হরিদাস ; ভুবনেশ্বরের পথে ; লিঙ্গরাজ মন্দিরে ; প্রত্যাবর্তন , জগন্নাথের রাজবেশ , পরিক্রমা , চৈতন্যময় পুরী ; ধর্মজীবন — বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব ; এই সব দেবচিত্র মনের খোরাক ; ডায়েরিপাঠ — এখন তুলে খোলে থাক । এই একুশটি অধ্যায় আর পরিশিষ্টে আছে শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত চিরস্মরণীয় কয়েকটি দিনের স্মৃতিকথা। মূল্য বার টাকা ॥ অন্যান্য খণ্ড : ১ম খণ্ড (৩য় সং) — ১২'০০ ॥ ৪—৬ খণ্ড : ৫'০০ ॥ ২, ৩, ৭—১৩ খণ্ড : ৮'০০ টাকা ॥

[জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড পরিবেশিত]

॥ জেনারেল বুকস্ ॥

উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৮১

সূচীপত্র

নূতন বই ! নূতন বই !

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

'শিশুদের বিবেকানন্দ'-র মতো শিশুদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় লিখিত ও প্রতিটি লেখার সঙ্গে চারিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্র শোভিত। প্রতি পৃষ্ঠায় ছবি, ছবির নীচে কবিতা ও পাশে লেখা ; এরূপ ৩৯টি চিত্রে ও লেখায় শ্রীরামকৃষ্ণজীবন পরিবেশিত। চারিবর্ণে মুদ্রিত সুদৃশ্য প্রচ্ছদ, পিছনে বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের নতুন ফটো চারিবর্ণে মুদ্রিত। মোটা ম্যাপ লিথো কাগজে ছাপা। সাইজ ক্রাউন ৪। পৃষ্ঠা ৪০। দাম তিন টাকা।

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৩

নিত্যপাঠ্য কয়েকখানি গ্রন্থ

সারদা-রামকৃষ্ণ

"যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম"
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

যুগান্তর : সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত। গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥

বহু চিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।
শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ : অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। একই সঙ্গে ঈশ্বরানুভূতির এমন মূর্ত প্রতীক এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী আদর্শ চরিত্রের পুণ্যবতা নারী এযুগে বিরল। ..."দুর্গামা" জীবনচরিতখানি একবার অন্ততঃ পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—এককথায় অপরিহার্য॥ বহুচিত্রে শোভিত—৮৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত।
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা : ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥

বহুচিত্রে শোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫৲

সাধনা

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে

দেশ : সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি, বহু সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক (এবারে সাড়ে তিন শতাধিক) মনোহর বাংলা ও হিন্দী সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক ভাবোদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত এবং আবৃত্তিযোগ্য রচনাও ইহাতে আছে॥ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—৬৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা—৪

সূচীপত্র

সর্দ্দি ও কাশিতে

দুলালের

তাল মিছরী

প্রস্তুতকারক:

শ্রীদুলালচন্দ্র ভড়

৪, দত্তপাড়া লেন, কলিকাতা-৬

ফোন: ৩৩-৫৬৭৩

যুগনায়ক বিবেকানন্দ

২য় সংস্করণ

স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত

সাইজ—মিডিয়াম

মূল্য পুরা সেট ২৪৲ টাকা ;
প্রতি খণ্ড ৮৲ আট টাকা

১ম খণ্ড—৪৭৪ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড—৪৯০ পৃষ্ঠা,
৩য় খণ্ড—৪০৪ পৃষ্ঠা

তিন খণ্ড একত্রে লইলে—২০৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্যালয়,
১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩

The Pioneer Fertilizer Industry in India producing various types of Chemicals and Chemical Fertilizers of standard and quality. We are serving farmers to yield more by using chemical fertilizer as well as serving the country to become self-sufficient in food production. We are in the walk of national service.

THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LTD.

Eastern Marketing Zone, 41, Chowringhee Road, Calcutta-16.

উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৮১

সূচীপত্র

নূতন বই ! নূতন বই !

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

'শিশুদের বিবেকানন্দ'-র মতো শিশুদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় লিখিত ও প্রতিটি লেখার সঙ্গে চারিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্র শোভিত। প্রতি পৃষ্ঠায় ছবি, ছবির নীচে কবিতা ও পাশে লেখা ; এরূপ ৩৯টি চিত্রে ও লেখায় শ্রীরামকৃষ্ণজীবন পরিবেশিত। চারিবর্ণে মুদ্রিত সুদৃশ্য প্রচ্ছদ, পিছনে বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের নতুন ফটো চারিবর্ণে মুদ্রিত। মোটা ম্যাপ লিথো কাগজে ছাপা। সাইজ ক্রাউন ৳। পৃষ্ঠা ৪০। দাম তিন টাকা।

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৩

নিত্যপাঠ্য কয়েকখানি গ্রন্থ

সারদা-রামকৃষ্ণ

"যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম"

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

যুগান্তর : সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত। গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥

বহু চিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ— ৮৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ : অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। একই সঙ্গে ঈশ্বরানুভূতির এমন মূর্ত প্রতীক এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী আদর্শ চরিত্রের পুণ্যবতা নারী এযুগে বিরল। ..."দুর্গামা" জীবনচরিতখানি একবার অন্ততঃ পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—এককথায় অপরিহার্য॥ বহুচিত্রে শোভিত—৮৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত।

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা : ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥

বহুচিত্রে শোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫৲

সাধনা

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে

দেশ : সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি, বহু সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক (এবারে সাড়ে তিন শতাধিক) মনোহর বাঙলা ও হিন্দী সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক ভাবোদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত এবং আবৃত্তিযোগ্য রচনাও ইহাতে আছে॥ পরিবর্ধিত সংস্করণ—৬৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা—৪

সূচীপত্র

Space Donated

By :

ARABINDA HOSIERY MILLS

16-B, Beniatola Street

Calcutta-5

"আমাদের চাই কি জিনিস? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর বিজ্ঞান পড়ানো; চাই কারিগরি শিক্ষা, চাই—যাতে শিল্প (Industry) বাড়ে; লোকে চাক্‌রি না ক'রে দু-পয়সা ক'রে খেতে পারে"

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
এই বাণী

শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

The Pioneer Fertilizer Industry in India producing various types of Chemicals and Chemical Fertilizers of standard and quality. We are serving farmers to yield more by using chemical fertilizer as well as serving the country to become self-sufficient in food production. We are in the walk of national service.

THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LTD.

Eastern Marketing Zone, 41, Chowringhee Road, Calcutta-16.

উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৮১

সূচীপত্র

নূতন বই ! **শিশুদের রামকৃষ্ণ** নূতন বই

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

"যে বিষয়ে এই বই, তাকে আর কখনও এত সুন্দর ও মনোগ্রাহী করে ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল থেকে তিরোভাব পর্যন্ত যাবতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীকে যেমন সরস গদ্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অন্যদিকে আবার তেমনি প্রতি পৃষ্ঠায় আছে পদ্যে লেখা তার সংক্ষিপ্তসার। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর আঁকা অসংখ্য ছবি। গদ্যে-পদ্যে-চিত্রে উপস্থাপিত এমন চমৎকার বই সত্যিই চোখে পড়ে না।..." বইটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। 'দেশ' পত্রিকা বলেছেন, "স্বদেশীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি এবং মহান ব্যক্তির যুগান্তকারী কর্মের সঙ্গে পরিচয় রাখার কর্তব্য আমাদের সবার। এর ভিত গড়ার প্রকৃষ্ট সময়টিকে বলতে পারি শৈশব।...অধুনা প্রকাশিত স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দের গ্রন্থ 'শিশুদের রামকৃষ্ণ'তে এ ধরনের আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখা গেছে।...গ্রন্থটি ছোটদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক। রচয়িতা তাঁর শিশুশিক্ষামূলক সরস সচিত্র গ্রন্থটির জন্য ধন্যবাদার্হ।' দাম তিন টাকা

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

নিত্যপাঠ্য কয়েকখানি গ্রন্থ

সারদা-রামকৃষ্ণ

"যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম"
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।
যুগান্তর: সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত। গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥
বহু চিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।
শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।
বেতার জগৎ: অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। একই সঙ্গে ঈশ্বরানুভূতির এমন মূর্ত প্রতীক এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী আদর্শ চরিত্রের পুণ্যবতী নারী এযুগে বিরল। ..."দুর্গামা" জীবনচরিতখানি একবার অন্ততঃ পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—এককথায় অপরিহার্য॥ বহুচিত্রে শোভিত—৮৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত।
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।
ষষ্ঠ মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে।

সাধনা

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে
দেশ: সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি, বহু সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক (এবারে সাড়ে তিন শতাধিক) মনোহর বাংলা ও হিন্দী সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক ভাবোদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত এবং আবৃত্তিযোগ্য রচনাও ইহাতে আছে॥ পরিবর্ধিত সংস্করণ—৬৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা—৪

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

পাঁচ ভাগে সম্পূর্ণ

সাধারণ বাঁধাই	— ১ম, ৩য়, ৪র্থ —	৭.৫০	প্রতি খণ্ড
”	— ২য়, ৫ম	৮.০০	”
কাপড়ে বাঁধাই	— ১ম, ৩য়, ৪র্থ —	৮.৫০	”
”	— ২য়, ৫ম	৯.০০	”

প্রাপ্তিস্থান—

কথামৃত ভবন
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন কলি-৬
Phone No. 35-1751

উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, কলি-৩

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

সহাস্য বিবেকানন্দ ১৫.০০

বিবেকানন্দ অগণ্যশিখা সূর্যের মতো। তাই কে কি ভাবে তাঁকে দেখবে ঠিক নেই। এই বইয়ে এক নতুন রূপে তাঁকে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি রসিকোত্তম

লেখক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য মন্থন করে স্বামীজীর অজস্র হাসির কথা ও গল্প সংগ্রহ করেছেন। তার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যদের রসিকতাও যোগ করেছেন। তার ফলে সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠার এই বইটি আনন্দসাগরের রূপ ধরেছে।

স্বামীজী বলেছেন, আমরা আনন্দের অমৃতের সন্তান—আমরা হাসবো না তো কে হাসবে? লেখক দেখিয়েছেন, ধর্মের মানুষই যথার্থ হাসতে পারেন, কারণ তাঁরা আনন্দের নিত্য উৎসের সন্ধান পেয়েছেন বিবেকানন্দ সেই আনন্দপ্রবাহের গঙ্গোত্রী।

নবভারত পাবলিশার্স
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
ফোন: ৩৪-৯৪৪৬

"আমাদের চাই কি জিনিস? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি আর বিজ্ঞান পড়ানো; চাই কারিগরি শিক্ষা, চাই- যাতে শিল্প (Industry) বাড়ে; লোকে চাকুরি না ক'রে দু-পয়সা ক'রে খেতে পারে।"

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
এই বাণী

শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

The Pioneer Fertilizer Industry in India producing various types of Chemicals and Chemical Fertilizers of standard and quality. We are serving farmers to yield more by using chemical fertilizer as well as serving the country to become self-sufficient in food production. We are in the walk of national service.

THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LTD.

Eastern Marketing Zone, 41, Chowringhee Road, Calcutta-16.

উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৮১

সূচীপত্র

নূতন বই ! **শিশুদের রামকৃষ্ণ** নূতন বই!

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

"যে বিষয়ে এই বই, তাকে আর কখনও এত সুন্দর ও মনোগ্রাহী করে ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল থেকে তিরোভাব পর্যন্ত যাবতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীকে যেমন সরল গদ্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অন্যদিকে আবার তেমনি প্রতি পৃষ্ঠায় আছে পদ্যে লেখা তার সংক্ষিপ্তসার। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর আঁকা অসংখ্য ছবি। গদ্যে-পদ্যে-চিত্রে উপস্থাপিত এমন চমৎকার বই সত্যিই চোখে পড়ে না।..." বইটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। 'দেশ' পত্রিকা বলেছেন, "স্বদেশীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি এবং মহান ব্যক্তির যুগান্তকারী কর্মের সঙ্গে পরিচয় রাখার কর্তব্য আমাদের সবার। এর ভিত্ত গড়ার প্রকৃষ্ট সময়টিকে বলতে পারি শৈশব।...অধুনা প্রকাশিত স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দের গ্রন্থ 'শিশুদের রামকৃষ্ণ'তে এ ধরনের আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখা গেছে।...গ্রন্থটি ছোটদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক। রচয়িতা তাঁর শিশুশিক্ষামূলক সরস সচিত্র গ্রন্থটির জন্য ধন্যবাদার্হ।" দাম তিন টাকা

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

নিত্যপাঠ্য কয়েকখানি গ্রন্থ

সারদা-রামকৃষ্ণ

"যুক্তভাবে রচিত জীবনকথা এই প্রথম"
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।
যুগান্তর: সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত। গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥
বহু চিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।
শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।
বেতার জগৎ: অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। একই সঙ্গে ঈশ্বরানুভূতির এমন মূর্ত প্রতীক এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী আদর্শ চরিত্রের পুণ্যবতী নারী এযুগে বিরল। ..."দুর্গামা" জীবনচরিতখানি একবার অন্ততঃ পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—এককথায় অপরিহার্য॥ বহুচিত্রে শোভিত—৮৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত।
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।
ষষ্ঠ মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে।

সাধনা

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে
দেশ: সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি, বহু সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক (এবারে সাড়ে তিন শতাধিক) মনোহর বাঙলা ও হিন্দী সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক ভাবোদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত এবং আবৃত্তিযোগ্য রচনাও ইহাতে আছে॥ পরিবর্ধিত সংস্করণ—৬৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা—৪

সূচীপত্র

সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

গ্রামো সাইকেল ষ্টোরস্

২১এ, আর. জি. কর রোড,

শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪

ফোন : ৫৫-৭১৩২
৫৫-৭১৩৩

গ্রাম : গ্রামোসাইকেল

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

সহাস্য বিবেকানন্দ ১৫·০০

বিবেকানন্দ অগণ্যশিখা সূর্যের মতো। তাই কে কি ভাবে তাঁকে দেখবে ঠিক নেই। এই বইয়ে এক নতুন রূপে তাঁকে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি রসিকোত্তম।

লেখক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য মন্থন করে স্বামীজীর অজস্র হাসির কথা ও গল্প সংগ্রহ করেছেন। তার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যদের রসিকতাও যোগ করেছেন। তার ফলে সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠার এই বইটি আনন্দসাগরের রূপ ধরেছে। স্বামীজী বলেছেন, আমরা আনন্দের অমৃতের সন্তান—আমরা হাসবো না তো কে হাসবে? লেখক দেখিয়েছেন, ধর্মের মানুষই যথার্থ হাসতে পারেন, কারণ তাঁরা আনন্দের নিত্য উৎসের সন্ধান পেয়েছেন. বিবেকানন্দ সেই আনন্দপ্রবাহের গঙ্গোত্রী।

নবভারত পাবলিশার্স

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৪-১৪৪৬

"আমাদের চাই কি জিনিস? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজ আর বিজ্ঞান পড়ানো; চাই কারিগরি শিক্ষা, চাই–যাতে শিল্প (Industry) বাড়ে; লোকে চাকুরি না ক'রে দু-পয়সা ক'রে খেতে পারে।"

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
এই বাণী

শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

FCI

The Pioneer Fertilizer Industry in India producing various types of Chemicals and Chemical Fertilizers of standard and quality. We are serving farmers to yield more by using chemical fertilizer as well as serving the country to become self-sufficient in food production. We are in the walk of national service.

THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LTD.

Eastern Marketing Zone, 41, Chowringhee Road, Calcutta-16.

উদ্বোধন, পৌষ, ১৩৮১

সূচীপত্র

নূতন বই! **শিশুদের রামকৃষ্ণ** নূতন বই!

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

"যে বিষয়ে এই বই, তাকে আর কখনও এত সুন্দর ও মনোগ্রাহী করে ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল থেকে তিরোভাব পর্যন্ত যাবতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীকে যেমন সরস গদ্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অন্যদিকে আবার তেমনি প্রতি পৃষ্ঠায় আছে পদ্যে লেখা তার সংক্ষিপ্তসার। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর আঁকা অসংখ্য ছবি। গদ্যে-পদ্যে-চিত্রে উপস্থাপিত এমন চমৎকার বই সত্যিই চোখে পড়ে না।..." বইটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। 'দেশ' পত্রিকা বলেছেন, "স্বদেশীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি এবং মহান ব্যক্তির যুগান্তকারী কর্মের সঙ্গে পরিচয় রাখার কর্তব্য আমাদের সবার। এর ভিত গড়ার প্রকৃষ্ট সময়টিকে বলতে পারি শৈশব।...অধুনা প্রকাশিত স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দের গ্রন্থ 'শিশুদের রামকৃষ্ণ'তে এ ধরনের আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখা গেছে।...গ্রন্থটি ছোটদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক। রচয়িতা তাঁর শিশুশিক্ষামূলক সরস সচিত্র গ্রন্থটির জন্য ধন্যবাদার্হ।' দাম তিন টাকা

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

নিত্যপাঠ্য কয়েকখানি গ্রন্থ

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

যুগান্তর : সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত। গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে॥

বহু চিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ —৮৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত।

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইতেছে।

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত

বেতার জগৎ : অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। একটি সমগ্র ঈশ্বরানুভূতির এমন মূর্ত প্রতীক এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী আদর্শ চরিত্রের পুণ্যবতী নারী এযুগে বিরল। ..."দুর্গামা" জীবনচরিতখানি একবার অন্ততঃ পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—একরকম অপরিহার্য। বহুচিত্রে শোভিত —৮৲

সাধনা

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে

দেশ : সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি, বহু সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক (এবারে সাড়ে তিন শতাধিক) মনোহর বাংলা ও হিন্দী সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক ভাবোদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত এবং আবৃত্তিযোগ্য রচনাও ইহাতে আছে॥ পরিবর্ধিত সংস্করণ—৬৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা—৪

সূচীপত্র

সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

গ্রামো সাইকেল ষ্টোরস্

২১এ, আর. জি. কর রোড,

শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪

ফোন : ৫৫-৭১৩২
৫৫-৭১৩৩

গ্রাম : গ্রামোসাইকেল

সদ্য প্রকাশিত ! নতুন বই !

বেদান্তের আলোকে খ্রীস্টের শৈলোপদেশ

স্বামী প্রভবানন্দ

ধর্মের সর্বোচ্চ কথাগুলি অবতারগণ বাছাই করা কয়েকজন শিষ্যকেই উপদেশ করেন—যাঁহারা তাহা যথাযথভাবে ধারণা ও জীবনে রূপায়িত করিয়া জীবনের মাধ্যমে তাহা প্রচার করিতে সক্ষম। খ্রীস্টের শৈলোপদেশও তাই—যীশুখ্রীস্টের কয়েকজন বাছাইকরা শিষ্যের নিকট উক্ত তাঁহার বাণী—খ্রীস্টধর্মের সার কথা। শুধু খ্রীস্টধর্মেরই নয়, ইহা যে সব ধর্মেরই মূল কথা, সব ধর্মের, সব ধর্মসাধনার সার কথা যে মূলতঃ এক, স্বামী প্রভবানন্দ সহজ সরল ভাবে বইটিতে তাহাই দেখাইয়াছেন। ধর্ম-ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে বইটি সকল ভগবান্‌লাভেচ্ছুর নিকটই অতি উপাদেয় বিবেচিত হইবেই। আধ্যাত্মিক জীবন বলিতে কি বুঝায়, বইটি পড়িলে তাহার সুস্পষ্ট ধারণা সকলেরই আসিবেই। পৃষ্ঠা ৮২ + ১৬ ; দাম সাধারণ সংস্করণ চার টাকা, শোভন সংস্করণ ছয় টাকা।

উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

"আমাদের চাই কি জিনিস? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর বিজ্ঞান পড়ানো; চাই কারিগরি শিক্ষা, চাই- যাতে শিল্প (Industry) বাড়ে; লোকে চাকুরি না ক'রে দু-পয়সা ক'রে খেতে পারে।"

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
এই বাণী

শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

The Pioneer Fertilizer Industry in India producing various types of Chemicals and Chemical Fertilizers of standard and quality. We are serving farmers to yield more by using chemical fertilizer as well as serving the country to become self-sufficient in food production We are in the walk of national service.

THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LTD.

Eastern Marketing Zone, 41, Chowringhee Road, Calcutta-16.

দিব্য বাণী

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না ।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৯।৬

(শ্রীহরির দরশনে বালক ধ্রুবের মনে
জাগি উঠে স্তুতির বাসনা ;
বাক্যহীন হেরি তারে নারায়ণ নিজ করে
শঙ্খস্পর্শে দিলেন প্রেরণা ।
পাঞ্চজন্য কপোলেতে, ধ্রুব করে হৃষ্টচিতে
পরমেশ-মহিমা ঘোষণা :)

আমার অন্তরে পশি' প্রসুপ্ত এ বাণীরাশি
করিছেন যিনি সঞ্জীবিত,
শুধু এই বাণী নয়, প্রাণাপান-শক্তিচয়
জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয় হয়ে ধৃত
সদা যাঁর শক্তিবলে এই দেহপুরে চলে
সেই তুমি সর্বশক্তিময়
(জীবের আশ্রয়ভূমি) পরমপুরুষ তুমি
ভগবান প্রণাম তোমায় ।

কথাপ্রসঙ্গে

'উদ্বোধনে'র নববর্ষ ও গৌরবময় অতীত

ঈশ্বরেচ্ছায় 'উদ্বোধন' এই মাঘে ৭৬তম বর্ষে **পদার্পণ করিল।** নববর্ষারম্ভে আমরা এই পত্রিকার লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, **শুভানুধ্যায়ী** সকলকে আমাদের **আন্তরিক প্রীতি-অভিনন্দন জ্ঞাপন** করিতেছি। দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ এই পত্রিকার প্রবর্তন করেন। আমরা এই শুভদিনে ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করি—বাংলার কল্যাণ হউক, ভারতের কল্যাণ হউক, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হউক।

স্বামী বিবেকানন্দ-নির্ধারিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া **'উদ্বোধন' দীর্ঘ** পঁচাত্তরটি বৎসর জাতির সেবা করিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ-প্রমুখ মহাপুরুষগণের এই পত্রিকার জন্য সুকঠোর তপস্যাই ইহার দীর্ঘজীবনের কারণ। তাঁহাদের বিবেক-বৈরাগ্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ঈশ্বরপরায়ণতা, পরহিতচিকীর্ষা আদি দৈবী সম্পদই ইহার রক্ষাকবচ।

নববর্ষের প্রারম্ভে তাঁহাদের উদ্দেশে ভক্তি-প্রণতি জানাইয়া আমরা এই পত্রিকার গৌরবময় অতীতের কথা শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি। এই 'উদ্বোধন'-পত্রিকা স্বামী বিবেকানন্দ-লিখিত 'প্রস্তাবনা' আশীর্বাদস্বরূপ শিরে ধারণ করিয়া ১৩০৫ সালের শুভ মাঘ মাসে জয়যাত্রা শুরু করিয়াছিল। তাহার পর স্বামীজীর বহু মৌলিক রচনাই একের পর আর 'উদ্বোধনে'র পৃষ্ঠাসমূহ অলঙ্কৃত করিয়াছে। সেই 'বর্তমান ভারত' যাহার—'ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই;··· বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ;'—স্বদেশ-মন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়া অসংখ্য দেশভক্তকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহা এই 'উদ্বোধনে'রই ১ম ও ২য় বর্ষে প্রবন্ধাকারে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই 'পরিব্রাজক' যাহার—'নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে'—আজও বিদ্যালয়ের সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রী হইতে বিশ্রুতকীর্তি বিদগ্ধ বাগ্মি-প্রবরগণের কণ্ঠে অনুরণিত হইয়া ভাবী ভারতের নবযুগের উজ্জ্বল সম্ভাবনার শিহরণ জাগায়, তাহাও 'বিলাতযাত্রীর পত্র'-শিরোনামে এই 'উদ্বোধনে'ই ১ম ও ২য় বর্ষে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' যাহার—"ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি ক'রে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য—স্বধর্ম কর হে বাপু! অন্যায় ক'রো না, অত্যাচার ক'রো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান

করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জন ক'রে স্ত্রী-পরিবার দশজনকে প্রতিপালন—দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে তো তুমি কিসের মানুষ ? গৃহস্থই নও—আবার 'মোক্ষ' !!"—ধর্ম ও মোক্ষের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের সামঞ্জস্যের অভ্রান্ত নির্দেশ দেয়, তাহা এই 'উদ্বোধনের'ই ২য় ও ৩য় বর্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই 'সখার প্রতি' যাহার—

'ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু,
সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ
কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

—সহস্র সহস্র ত্যাগী ও গৃহীর সেবাব্রতের মহামন্ত্র, তাহা এই 'উদ্বোধনে'রই ১ম বর্ষে প্রকাশিত হয়। সেই 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' যাহার—'জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?' ইত্যাদি তেজোদীপ্ত উদাত্ত আহ্বান দুর্বলকেও সবল করিয়াছে, কাপুরুষকেও বীর করিয়াছে, তাহা এই 'উদ্বোধনে'-রই ২য় বর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' যাহার—'দাস তোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে', 'দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে', 'দাস তব প্রস্তুত সতত সাধিতে তোমার কাজ', 'প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর। কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি' ইত্যাদি উক্তিনিচয় 'ত্রিলোকসন্ত্রাসী সিংহবিক্রম' রামভক্ত হনুমানের কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাও এই 'উদ্বোধনে'রই ৫ম বর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে স্বামীজীর এই তিনটি বিখ্যাত কবিতা 'বীরবাণী'-পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বামীজী কর্তৃক মূল সংস্কৃতে রচিত 'অম্বাস্তোত্রম্' ও 'শিবস্তোত্রম্'ও অনুরূপভাবে 'উদ্বোধনে'রই ২য় ও ৫ম বর্ষে প্রথম প্রকাশিত হইয়া পরে বীরবাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বামীজীর এই সকল মৌলিক রচনা ব্যতীত, ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত তাঁহার বহু বক্তৃতার বঙ্গানুবাদও 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই 'উদ্বোধনে'রই ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ 'প্রদত্ত' 'পরমহংসদেবের উপদেশ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহা পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ 'সঙ্কলিত' 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ' নামে পুস্তিকাকারে উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। এই উপদেশগুলি লিখিবার কালে দেখা গিয়াছে গভীর রাত্রে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া কোনদিন পাণ্ডুলিপিটি সংশোধিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—"ঠাকুর এসে বলে গেলেন, 'একথা তো আমি বলিনি—আমি এই বলেছি'।" এই কারণে আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এই সঙ্কলনটি বিশ্বাসীর দৃষ্টিতে অতীব মূল্যবান। ইহা ছাড়া 'পরমহংসদেবের সত্যনিষ্ঠা'-শীর্ষক একটি স্বল্পকায় নিবন্ধ এবং 'গুরু' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ শ্রীশ্রীমহারাজ কর্তৃক লিখিত হইয়া যথাক্রমে 'উদ্বোধনে'র ১ম ও ৫ম বর্ষে প্রকাশিত হয়।

যিনি বলিতেন—আমি কিছু লিখতে পারি না, কিছু লিখতে গেলে আগেই সিদ্ধান্ত এসে যায়, লেখা আর হয় না—সেই স্বামী শিবানন্দ মহারাজ পর্যন্ত তাঁহার প্রাণপ্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত এই 'উদ্বোধনে'র জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'সাধন—প্রাণায়াম' ও 'একবারকার রোগী আর একবার রোজা' এই প্রবন্ধদ্বয় যথাক্রমে 'উদ্বোধনে'র ৫ম ও ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশিত হয়।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 'উদ্বোধনে'র প্রথম সম্পাদক। প্রথম বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষ (১৩০৫ মাঘ—১৩০৯ পৌষ) অবধি তিনি সম্পাদনা কার্য করেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বলিতে যাহা বোঝায়, তিনি সেইরূপ কিছু নিয়মিত লিখিতেন না। তবে তাঁহার অনেক রচনা 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম: 'জাতীয়ত্ববোধ', 'আজ্ঞাপালন', 'কামিনীকাঞ্চন ও ভক্তি-বিশ্বাস', 'ব্রহ্মচর্য', 'গুরুকরণ' ইত্যাদি। আমেরিকা হইতেও তিনি 'উদ্বোধনে'র জন্য পত্রাকারে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। প্রবন্ধটি 'মায়ের এক মনোহর উদ্যান' শিরোনামে ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশিত হয়।

স্বামী সারদানন্দ 'উদ্বোধনে'র দশম হইতে ত্রয়োদশ বর্ষ (১৩১৪ মাঘ হইতে ১৩১৮ পৌষ) পর্যন্ত সম্পাদক এবং তাঁহার জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর (১৩২৯ ভাদ্র হইতে ১৩৩৪ শ্রাবণ) অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। ১লা ভাদ্র, ১৩৩৪ তিনি মহাসমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার রচিত সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' 'উদ্বোধনে'র ১১শ হইতে ২১শ বর্ষ পর্যন্ত একাদিক্রমে একাদশ বর্ষ ধরিয়া প্রবন্ধাকারে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। কামারহাটির ব্রাহ্মণী 'গোপালের মা'র পূতচরিত যাহা বর্তমানে লীলা-প্রসঙ্গের গুরুভাব-উত্তরার্ধের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত তাহাই একাদশ বর্ষের একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দ্বাদশ বর্ষ হইতে গুরুভাব-পূর্বার্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৯৮ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন সভা, বিবেকানন্দ সমিতি প্রভৃতি সভায় তিনি যে সকল বক্তৃতা দেন তাহা প্রথমে 'উদ্বোধনে' প্রবন্ধাকারে নিবদ্ধ হইয়া পরে 'গীতাতত্ত্ব'-নামক গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ করে। 'বিবিধ-প্রসঙ্গ'-গ্রন্থের প্রবন্ধ-গুলিও অনুরূপভাবে প্রথমে 'উদ্বোধনে'ই প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার 'ভারতে শক্তিপূজা' গ্রন্থের প্রথম হইতে চতুর্থ প্রস্তাব 'উদ্বোধনে'র ৫ম, ৭ম, ৮ম ও ১০শ বর্ষে প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত 'স্থাপকঃ সর্বধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপকঃ' ইত্যাদি বিখ্যাত স্তবটি তাঁহার দেহান্তের পর 'বন্দনা' শিরোনামে 'উদ্বোধনে' ১৩৩৪-এর কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ রচিত 'রামানুজচরিত' 'উদ্বোধনে'র ১ম হইতে ৮ম বর্ষ পর্যন্ত একাদিক্রমে আট বৎসর ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়া পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ইহা ছাড়া তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধও 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্বে মান্দ্রাজে স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে রচিত 'শ্রীমদ্বিবেকানন্দপঞ্চকম্'-নামক সংস্কৃত স্তব তাঁহার শেষ রচনা। তাঁহার দেহান্তের পর 'উদ্বোধনে'র ১৪শ বর্ষের ১ম সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হয়।

স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রণীত 'তিব্বতের পথে হিমালয়ে'-নামক পুস্তক প্রথমে 'তিব্বতে তিন বৎসর'-শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধরূপে উদ্বোধনে' ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম বর্ষে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মঠাধ্যক্ষের বাণী হিসাবে কিছু লিখিতে বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি স্বীকৃত হন নাই, পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অশরীরী বাণী শ্রবণ করিয়া রাত্রির অন্ধকারে নিজেই মোমবাতি জ্বালিয়া লিখিতে থাকেন: 'এবার প্রভুর আগমন পর্ণকুটীরে। প্রভুর দ্বাদশবর্ষব্যাপী অমানুষিক তপস্যা, সাধন, সিদ্ধি—মহাশক্তি ও মহাভাবের অরুণোদয় সুরধুনী ভাগীরথীর বিমলতটে—বিশাল পঞ্চবটী ও নিভৃত বিল্বমূলে।' ইত্যাদি। রচনাটি 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ'-শিরোনামে 'উদ্বোধনে'র

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সংখ্যায় (ফাল্গুন, ১৩৪২) প্রকাশিত হয়।

'শ্রীম'-লিখিত সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র অনেকাংশই 'উদ্বোধনে' প্রবন্ধাকারে প্রথম বর্ষ হইতে ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষে এবং পরে অষ্টম, নবম, দ্বাদশ ও সপ্তবিংশ বর্ষে প্রকাশিত হয়।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বহু প্রবন্ধ ও কয়েকটি কবিতা 'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষ হইতে ত্রয়োদশ বর্ষ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। 'স্বামী বিবেকানন্দের সাধনফল'-শীর্ষক তাঁহার শেষ প্রবন্ধ 'উদ্বোধন' ১৩১৮-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরই মাঘ মাসে তিনি দেহত্যাগ করেন।

এই দিক্‌পাল লোকোত্তর পুরুষগণ আজ অপ্রকট। তাঁহাদের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের স্পর্শপূত রচনাদি আর 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইবে না। আর সেই 'বিলাত যাত্রীর পত্র', সেই 'বর্তমান ভারত', সেই 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', সেই 'নাচুক তাহাতে শ্যামা', সেই 'লীলাপ্রসঙ্গ', সেই 'কথামৃত' 'উদ্বোধনে'র পৃষ্ঠাসমূহ গৌরবমণ্ডিত করিবে না। ইহা নির্মম নিষ্ঠুর সত্য। তবে স্বামীজীর বাণী স্মরণ করি : 'অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পারো অতীতের দিকে তাকাও, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার জল পান কর, তারপর সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হও'। তাই নব বর্ষের প্রারম্ভে প্রার্থনা করি : অতীত গৌরবের স্মৃতি আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে সর্বদা জাগরূক থাকুক। অতীতই আমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে অনুপ্রাণিত করুক—শক্তি দিক্। কবির ভাষায় বলি : 'হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার কথা কও, কথা কও'।

'ভারত-হিতৈষী' ম্যাক্সমূলার : সার্ধশতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর জার্মানীর 'Dessau'-নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে বিশ্ব-বিখ্যাত অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের জন্ম হয়। আঠারো বৎসর বয়সে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন শুরু করেন। বিশ বৎসর বয়সে দর্শনে ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত হন। পর বৎসর তিনি বার্লিনে যাইয়া ভাষাতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ক তাঁহার পূর্বারব্ধ গবেষণাকার্য চালাইতে থাকেন। তাহার পর বৎসর প্যারী নগরীতে যান। বৎসরাধিক কাল সেখানে থাকাকালীন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত Eugene Burnouf তাঁহাকে ঋগ্বেদ প্রকাশিত করিতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিলে লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গ্রন্থাগারে কিছু প্রয়োজনীয় পাণ্ডুলিপি আছে জানিয়া তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হন। সেখানে প্রাশিয়ার মন্ত্রী ব্যারন বুনসেন ২৩ বৎসর বয়স্ক এই যুবকের আশা-আকাঙ্ক্ষায় মুগ্ধ হন এবং মুখ্যতঃ তাঁহার ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক উইলসনের চেষ্টায় স্থির হয় যে, উক্ত কোম্পানী ঋগ্বেদ প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয়-ভার বহন করিবে। ঋগ্বেদের প্রথম সংস্করণের মুদ্রণব্যাপারে ম্যাক্সমূলারকে অক্সফোর্ডে যাইতে হয় এবং পরে তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ওখানে স্থায়ীভাবে থাকার ফলে তিনি বৃটিশ নাগরিক হইয়া যান। ১৮৪৯ সালে তাঁহার সম্পাদিত ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাহার পর ২৮ বৎসর ধরিয়া তিনি নানাভাবে ঋগ্বেদের বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত করেন। ঐ কার্যে কখনও কখনও তাঁহার আর্থিক ক্ষতি হইলেও তিনি কখনও তাঁহার জীবনব্রত ঋগ্বেদ প্রচার হইতে বিরত হন নাই। তিনি 'Sacred Books of the East'-অনুবাদ-গ্রন্থের ৫১টি খণ্ডের সম্পাদনা করেন এবং সংস্কৃত

সাহিত্যের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি'-পত্রিকায় 'A Real Mahatman' (একজন প্রকৃত মহাত্মা) নামক শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় তাঁহার একটি প্রবন্ধ ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এই প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ মহামনীষীর দেহান্ত হয়।

৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ তাঁহার জন্মের পর একশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, এই সার্ধশতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইবে। আমাদের নিকট ইহা একটি বিশেষ আনন্দের সংবাদ। কারণ, আজ হইতে প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্বে (১৪ই মার্চ ১৮৯৯) এই 'উদ্বোধন'-পত্রিকাতেই মূল বাংলায় লিখিত একটি প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ম্যাক্সমূলারকে 'ভারত-হিতৈষী', 'ভারতগত-প্রাণ মহাত্মা' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ জন্মলগ্ন হইতেই এই পত্রিকার ও ম্যাক্সমূলারের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সংযোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম বর্ষেরই বিভিন্ন সংখ্যায় ম্যাক্সমূলারের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখা যায়। ম্যাক্সমূলার সম্পর্কে স্বামীজী বিভিন্ন সময়ে যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন এবং প্রবন্ধ বা পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় স্বতই দ্রবীভূত হয়। এই শুভ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমরা সেগুলির অংশবিশেষ উল্লেখ করিয়া এই মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমাদের অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাসভার নবম দিবসের অধিবেশনে স্বামীজী 'হিন্দুধর্ম'-শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহাতে 'benotheism' শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়। 'বৈদিক ধর্মাদর্শ' নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতাতেও ইহার বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। এই শব্দটি আনুমানিক ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সমূলার কর্তৃক গঠিত হয়। ঋগ্বেদে দেখা যায় বহু দেবতার মধ্য হইতে কোনও একটি দেবতা হঠাৎ দেবত্বের স্তর হইতে একেবারে ঈশ্বরত্বে উন্নীত, অথচ তখনও অন্যান্য দেবতাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত নহে। ইহা একেশ্বরবাদ বা বহু-ঈশ্বরবাদ নহে। ম্যাক্সমূলার ইহাকেই 'henotheism' আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার 'Introduction to the Science of Religion', 'India—what can it teach us?' ইত্যাদি বিখ্যাত গ্রন্থে বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবশ্য ঋগ্বেদের চরম কথা হইতেছে—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। সে যাহাই হউক, স্বামীজী যে ম্যাক্সমূলারের চিন্তাধারা ও মতবাদের সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিলেন, ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়।

স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম'-নামক পূর্বোক্ত প্রবন্ধে জন্মান্তরবাদ বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনা চরমে উঠিয়াছে যখন স্বামীজী শেষ করিয়াছেন—'ঋষিগণ সমগ্র জগতে সদর্পে ঘোষণা করিতেছেন: স্মৃতিসাগরের গভীরতম প্রদেশ কিরূপে আলোড়িত করিতে হয়, সেই রহস্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। সাধন কর, তোমরাও পূর্বজন্মের সকল কথা মনে করিতে পারিবে'। ম্যাক্সমূলার জন্মান্তরবাদ মানিতেন না। কিন্তু ভারতের প্রত্যেকটি ধর্মান্দোলনের তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ রাখিতেন। আমেরিকায় ও লণ্ডনে স্বামীজীর বেদান্ত-প্রচার ম্যাক্সমূলারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ফলতঃ তিনি জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই বিষয়ে স্বামীজী হেল ভগিনীগণকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন: 'যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে। ...

সর্বদাই মনে হ'ত, কালে সমগ্র তত্ত্বই তিনি বুঝিতে পারিবেন। যত শীঘ্র পারো, 'বেদান্তবাদ' (Vedantism) নামে তাঁর শেষ বইখানা সংগ্রহ কর। বইখানিতে দেখবে তিনি সবই সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন—মায় জন্মান্তরবাদ। আমি তোমাদের এ যাবৎ যা বলেছি, তারই কিছু অংশ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, বইখানি তোমাদের মোটেই দুরূহ বলে মনে হবে না। অনেক বিষয়ে দেখবে চিকাগোয় আমি যা সব বলেছি, তারই আভাস। বৃদ্ধ যে সত্য বস্তু ধরতে পেরেছেন—এতে আমি এখন আনন্দিত। কারণ আধুনিক গবেষণা ও বিজ্ঞানের বিরোধিতার মুখে ধর্ম অনুভব করবার এই হল একমাত্র পথ।' মিস্ মেরী হেলকে লিখিত তাঁহার আরো দুটি পত্রে আছে: "অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের 'আত্মার অমরত্ব'-শীর্ষক প্রবন্ধগুলি মাদার চার্চকে পাঠিয়েছি। আশা করি, এখন সেগুলি পড়ে তুমি আনন্দ পাচ্ছ। বেদান্তের কোন অংশই বৃদ্ধ উপেক্ষা করেননি। সাবাস তাঁর নির্ভীক কৃতিত্ব!" "মাদার চার্চকে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার লিখিত 'অমরত্ব'-নামক যে প্রবন্ধটি পাঠাই, সেটি পড়ে দেখে থাকবে—তাঁর মতে, ইহজীবনে যারা আমাদের প্রীতিভাজন অতীত জন্মেও তারা নিশ্চয় তেমনি ছিল।"

১৮৯৫ সালে স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিতেছেন: 'মোক্ষমূলারকে—তিনি ভারতের পরম সহায়—এইভাবে পত্র লিখিবে। বোধ হয় লিখিয়াছ।...সে বই আমি অনেকদিন দেখেছি, তাতে আমার ভাবের আভাসও আছে।' বইখানি কি এবং ম্যাক্সমূলার প্রণীত কিনা তাহা গবেষণার বিষয়। কিন্তু একটি কথা পরিষ্কার, স্বামীজী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ম্যাক্সমূলার 'ভারতের পরম সহায়'।

১৮৯৬ সালে স্বামীজী লণ্ডনে দ্বিতীয়বার বেদান্ত প্রচার করেন। লণ্ডনে যাইবার পূর্বে একটি চিঠিতে স্বামীজী লিখিতেছেন: 'আমি সকালবেলা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার চিঠিতে জানিয়েছেন—যদি আমি অক্সফোর্ডে বক্তৃতা করতে যাই, তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।'

৩০শে মে ১৮৯৬ সালে লণ্ডন হইতে স্বামীজী দুইখানি পত্র লেখেন একটি মিসেস বুলকে অপরটি মেরী হেলকে। মিসেস বুলকে লিখিত পত্র হইতে জানা যায় যে ২৮শে মে ১৮৯৬ হইতেছে সেই বিশেষ দিন যেদিন বিশ্বের অন্যতম এই দুইজন মহামনীষীর শুভ সম্মিলন ঘটিয়াছিল। উভয় পত্রেই ম্যাক্সমূলারের প্রতি স্বামীজীর গভীর শ্রদ্ধা সুপরিস্ফুট। স্থানাভাবে সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নহে। বিশেষ উল্লেখ্য এই যে, মিসেস বুলকে যেমন লিখিয়াছেন 'হায়! ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁহার যেরূপ ভালবাসা তার অর্ধেক যদি আমার থাকত!', মেরী হেলকেও অনুরূপভাবে লিখিয়াছেন—'ভারত-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হল। হায়! ভারতের প্রতি তাঁর প্রেমের অর্ধেকও যদি আমার থাকত!'

৬ই জুন ১৮৯৬ লণ্ডন হইতে 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার সম্পাদককে একটি সুদীর্ঘ পত্রে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন: "অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার একজন অসাধারণ ব্যক্তি।...আমি তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়াছিলাম। ...তাঁহাকে দর্শন করিতে যাওয়া আমি তীর্থযাত্রাতুল্য জ্ঞান করি।...আমি তাঁহাকে ভাষাতত্ত্ববিদ্ বা পণ্ডিতরূপে দেখি নাই, দেখিলাম যেন কোন আত্মা দিন দিন ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্ব অনুভব করিতেছে, যেন কোন হৃদয় অনন্তের সহিত এক হইবার জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রসারিত হইতেছে। ...তাঁহার হৃদয়ধ্বনি যেন উপনিষদের সেই সুরে সেই তালে ধ্বনিত হইতেছে,......সেই এক

আত্মাকে জানো, অন্য কথা ত্যাগ কর। যদিও তিনি একজন পৃথিবী-আলোডনকারী পণ্ডিত ও দার্শনিক, তথাপি তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দর্শন তাঁহাকে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চে লইয়া গিয়া আত্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ করিয়াছে, তাঁহার অপরা বিদ্যা বাস্তবিকই তাঁহাকে পরাবিদ্যালাভে সহায়তা করিয়াছে।...আর ভারতের প্রতি তাঁহার কি অনুরাগ! যদি আমার সে অনুরাগের শতাংশের একাংশও থাকিত, তাহা হইলে আমি ধন্য হইতাম। এই অসাধারণ মনস্বী পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় চিন্তারাজ্যে বাস ও বিচরণ করিয়াছেন, পরম আগ্রহ ও হৃদয়ের ভালবাসার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অনন্ত অরণ্যের আলো ও ছায়ার বিনিময় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, শেষে ঐ সকল তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সর্বাঙ্গে উহার রঙ ধরাইয়া দিয়াছে। ম্যাক্সমূলার একজন ঘোর বৈদান্তিক। তিনি বাস্তবিক বেদান্তেরও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সুরের ভিতর উহার প্রকৃত তানকে ধরিয়াছেন। ...ভারতীয় চিন্তাগগনে কোন নূতন নক্ষত্র উদিত হইলেই, ভারতবাসিগণ উহার মহত্ব বুঝিবার পূর্বেই এই পাশ্চাত্য ঋষি উহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উহার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'আপনি কবে ভারতে আসিতেছেন?'...বৃদ্ধ ঋষির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার নয়নে এক বিন্দু অশ্রু নির্গতপ্রায় হইল, মৃদুভাবে শির সঞ্চালিত হইল, ধীরে ধীরে এই বাক্যগুলি স্ফুরিত হইল, 'তাহা হইলে আমি আর ফিরিব না; আমাকে সেখানেই সমাহিত করিতে হইবে।' আর অধিক প্রশ্ন মানব-হৃদয়ের পবিত্র রহস্যপূর্ণ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের ন্যায় বোধ হইল। ... তিনি নিশ্চয়ই অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ পূর্বজন্মের বন্ধুত্বের কথা ভাবিতেছেন। তাঁহার জীবন জগতের পক্ষে পরম মঙ্গলস্বরূপ হইয়াছে।"

১৮৯৭ সালে স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। আনুমানিক মার্চের শেষাশেষি তিনি কলিকাতায় বলরাম বসুর বাটীতে কিছুদিন অবস্থান করিতেছিলেন এবং শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে সায়নভাষ্যসহ ঋগ্বেদ পড়াইতেছিলেন। একদিন কিছুক্ষণ পাঠ চলিবার পর স্বামীজী বলিলেন: 'মনে হল কি জানিস্, সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার করতে ম্যাক্সমূলার রূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন হইতেই ঐ ধারণা। ম্যাক্সমূলারকে দেখে সে ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এমন অধ্যবসায়ী, এমন বেদবেদান্তসিদ্ধ পণ্ডিত এদেশে দেখা যায় না! তার উপর আবার ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) প্রতি কি অগাধ ভক্তি! তাঁকে অবতার ব'লে বিশ্বাস করে রে! বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম—কি যত্নটাই করেছিল! বুড়ো-বুড়ীকে দেখে মনে হত, যেন বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর মতো দুটিতে সংসার করছে।—আমায় বিদায় দেওয়ার কালে বুড়োর চোখে জল পড়ছিল!' 'সায়নই যদি ম্যাক্সমূলার হইয়া থাকেন তো পুণ্যভূমি ভারতে না জন্মিয়া ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মিলেন কেন?' শিষ্যের এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলিলেন: "অজ্ঞান থেকেই মানুষ 'আমি আর্য, উনি ম্লেচ্ছ' ইত্যাদি অনুভব ও বিভাগ করে। কিন্তু যিনি বেদের ভাষ্যকার, জ্ঞানের জলন্ত মূর্তি, তাঁর পক্ষে আবার বর্ণাশ্রম, জাতিবিভাগ কি? তাঁর কাছে ওসব একেবারে অর্থশূন্য। জীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই আছে, সেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাপাবার খরচই বা কোথায় পেতেন?"

১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাসে ম্যাক্সমূলার প্রণীত 'Ramakrishna: His Life and

Sayings'-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'উদ্বোধন'-পত্রিকার ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় উহার সমালোচনা এবং ৩য় সংখ্যায় 'পাইওনিয়র'-পত্রিকা কর্তৃক উক্ত গ্রন্থের সমালোচনার সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ১৪ই মার্চ ১৮৯৯ স্বামীজী কর্তৃক ঐ গ্রন্থের সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ 'উদ্বোধনে'র ১ম বর্ষের ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পূর্বেই আমরা এই প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে উহা হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি-সহায়ে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি :

'অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞদিগের অধিনায়ক। যে ঋগ্বেদসংহিতা পূর্বে সমগ্র কেহ চক্ষেও দেখিতে পাইত না, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিপুল ব্যয়ে ও অধ্যাপকের বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমে এক্ষণে তাহা অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের পাঠ্য।'

'অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের আধুনিক ভারতবর্ষের দেশদেশান্তরের রীতি নীতি ও সাময়িক জ্ঞান দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ।'

ধর্ম-সম্বন্ধে ভারতের কোথায় কি নূতন তরঙ্গ উঠিতেছে, অধ্যাপক সেগুলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবেক্ষণ করেন এবং পাশ্চাত্য জগৎ যাহাতে সে বিষয়ে বিজ্ঞপ্ত হয়, তাহারও বিশেষ চেষ্টা করেন।'

'পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য-সাম্রাজ্যের চক্রবর্তী অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার।'

'পাশ্চাত্য জগতে কতকগুলি মহাত্মা আছেন, যাঁহারা নিশ্চিত ভারতের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু ম্যাক্সমূলারের অপেক্ষা ভারত-হিতৈষী ইউরোপ-খণ্ডে আছেন কিনা, জানিনা। ম্যাক্সমূলার যে শুধু ভারত-হিতৈষী তাহা নহেন, ভারতের দর্শন-শাস্ত্রে, ভারতের ধর্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা; অদ্বৈতবাদ যে ধর্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া তাহা অধ্যাপক সর্বসমক্ষে বারম্বার স্বীকার করিয়াছেন। যে সংসারবাদ (পুনর্জন্মবাদ) দেহাত্মবাদী খ্রীষ্টিয়ানের বিভীষিকাপ্রদ, তাহাও তিনি স্বীয় অনুভূতি-সিদ্ধ বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন, এমন কি, বোধ হয় যে, ইতিপূর্ব জন্ম তাঁহার ভারতেই ছিল এবং পাছে ভারতে আসিলে এই বৃদ্ধ শরীর সহসা সমুপাহত পূর্ব স্মৃতিরাশির প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারে, অধুনা এই ভয়ই ভারতাগমনের প্রধান প্রতিবন্ধক।'

"আমি বলিলাম, 'অধ্যাপক মহাশয়, আজকাল সহস্র সহস্র লোকে রামকৃষ্ণের পূজা করিতেছে।' অধ্যাপক বলিলেন, 'এরূপ ব্যক্তিকে লোকে পূজা করিবে না তো কাহাকে পূজা করিবে?'...সুন্দর-উদ্যানসমন্বিত সেই মনোরম ক্ষুদ্র গৃহ, সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম হবেও তাঁহার স্থির প্রসন্ন আনন, বালসুলভ মসৃণ ললাট, রজতশুভ্র কেশ, ঋষি-হৃদয়ের কোন নিভৃত অন্তরালে গভীর আধ্যাত্মিকতার খনির অস্তিত্বসূচক সেই মুখের প্রত্যেক রেখা, তাঁহার সমগ্র জীবনের (যে-জীবন প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের চিন্তারাশির প্রতি সহানুভূতি-আকর্ষণ, উহার প্রতি লোকের বিরোধ- ও ঘৃণা-অপনয়ন এবং অবশেষে শ্রদ্ধা-উৎপাদনরূপ দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর কার্যে ব্যাপৃত ছিল) সঙ্গিনী সেই উচ্চাশয়া সহধর্মিণী, তাঁহার সেই উদ্যানের তরুরাজি, পুষ্পনিচয়, তথাকার নিস্তব্ধ ভাব ও নির্মল আকাশ—এই সমুদয় মিলিয়া কল্পনায় আমাকে প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবের যুগে লইয়া গেল—যখন ভারতে ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ, উচ্চাশয় বানপ্রস্থগণ, অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠগণ বাস করিতেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দস্তোত্রম্

স্বামী জীবানন্দ

ধ্যানে মগ্নং 'বিবেকং' যুগযতিবরমানন্দরূপং সুবীরং
ধীরং পদ্মাসনস্থং স্থিরমতিমচলং শুদ্ধবুদ্ধং বিমুক্তম্।
জ্ঞানৈর্দীপ্তং পবিত্রং যতিমুখকমলং লোচনানন্দরূপং
ধ্যায়েৎ প্রেম্ণা কৃপাভির্বিগলিতহৃদয়ং রামকৃষ্ণস্য শিষ্যম্॥ ১

যতিঃ স্বাত্মারামো বিষয়বিষশূন্যো যুগশিবঃ
সদা বাণীকণ্ঠো নরবরমহাত্মা ভয়হরঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুর্নতজগণসেবাপররতি-
র্যুগাচার্যো ধ্যেয়ো নবযুগবিবেকঃ শুভমতিঃ॥ ২

বিশিষ্টো বাগ্মী বৈ প্রবচনপটুশ্চ স্থিরমতিঃ
সদানিত্যদ্রষ্টা পরমযতিরাজো রবিসমঃ।
অভীনাদোদ্গাতা সকলভয়হীনঃ স্মরহরো
যুগাচার্যো ধ্যেয়ো নবযুগবিবেকঃ শুভমতিঃ॥ ৩

ভাবাতীতং পরকৃপয়াবিভূতং
প্রেম্ণা পূর্ণং জনগণসন্তাপঘ্নম্।
শান্তং সৌম্যং শুভমতিদানে দক্ষং
ধ্যায়েন্নিত্যং বিমলবিবেকানন্দম্॥ ৪

ধ্যায়েৎ সদা পরমভক্তমহাপবিত্রং
বুদ্ধং যতিং নবযুগস্য পরং বিবেকম্।
আশ্চর্যশক্তিধরধীরমতিং সুশান্তং
মুক্তং নরেন্দ্রনরবীরবরং হি নিত্যম্॥ ৫

প্রতিষ্ঠানং শুদ্ধং বিগলিতকৃপয়া স্থাপিতং পূজ্যপাদৈঃ
প্রভাবস্তস্যাত্র ভুবনজনহিতে সার্থকঃ সুপ্রমাণম্।
রতাঃ সেবাকার্যে সুবিমলযতয়ো রামকৃষ্ণস্য সংঘে
বিবেকানন্দস্য ক্ব ভবতি তুলনা মর্ত্যধামেঽস্মদীয়ে।॥ ৬

রামকৃষ্ণপদাম্ভোজে ভৃঙ্গায়তে হি যঃ সদা।
নৌমি তং স্বামিনং ভক্ত্যা বিবেকানন্দসংজ্ঞিতম্॥ ৭

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস ঃ 'পত্রাবলী'

ডক্টর প্রণব রঞ্জন ঘোষ

বাংলা গদ্যের রূপান্তরের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা সুবিদিত। সাহিত্যের আনন্দ-অমৃত যে সব অনুভূতির মাধ্যমে আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়, তার মধ্যে হাস্যরস অন্যতম, আর সে ক্ষেত্রেও স্বামীজীর ভূমিকা অনন্যসাধারণ। বস্তুত বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ লেখকদের পাশাপাশি তাঁর রস-বোধ ও প্রকাশকুশলতা। কিন্তু জাতীয় পুনরুজ্জীবনে তাঁর স্বদেশমন্ত্রের মন্দ্রধ্বনির বিস্তারে তাঁর এই সহজাত রসিকসত্তাটির কথা আমাদের মনে থাকে না। অথচ বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয়ে তাঁর কৌতুক, পরিহাস, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ এবং আনন্দদৃষ্টি (হিউমার) যেমন অবশ্য লক্ষণীয়, তেমনি তাঁর সাহিত্যিক সত্তার উপলব্ধিতেও বিশেষ সহায়ক।

'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রধান লেখকরূপে বাংলা-সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের আগে যে সব রচনার পরিচয় পাই, তাতে হাস্যরসের অবকাশ বা প্রয়োজন দেখা যায়নি। কিন্তু সবার অগোচরে যে সাহিত্যিক-সত্তা তাঁর 'পত্রাবলী'তে বিকশিত হয়ে উঠছিল, সেই পত্র-সাহিত্যেই তাঁর সহজাত হাস্যরস-সৃজনশক্তির প্রকাশসূচনা। এ শক্তির মূলে তাঁর পৌরুষদৃপ্ত আত্মপ্রত্যয়। সে পৌরুষ কেবল যে অসঙ্গতিই দেখিয়ে দেয়, তা নয়, সেই সঙ্গে মানুষের সব অপূর্ণতার কথা জেনেই তাকে মহত্তর পরিণামের পথে চালিত করে। ফলে লঘু বা তীব্র যে সুরেই তাঁর হাস্যরস ধ্বনিত হোক,—তার আড়ালে রয়েছে একটি মরমী সত্তা।

পত্রসাহিত্যে স্বামীজী ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। সাধু ও চলতি —দু'ধরনের গদ্যেই তাঁর পত্রাবলী সমৃদ্ধ। তবে চলতিভাষার যে নৈপুণ্য পরবর্তীকালে তাঁকে বাংলা-গদ্যের বন্ধনমুক্তিতে সহায়তা করেছে, সেই চলতিভাষার ভূমিকারচনার দিক থেকে পত্রাবলীর গুরুত্ব অসামান্য। আর এই চলতি ভাষায় লেখা চিঠিগুলির মধ্যেই তাঁর মুক্ত হৃদয়ের উজ্জ্বল প্রতিফলন হাস্যরসের নানা ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু যেমন তিনি নিজে, স্বামীজীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। নিজের বা পরের বা অন্য কোনো বিষয়ের কথাই তিনি লিখুন না কেন, প্রকাশ-ভঙ্গীটি যেখানে তাঁর নিজস্ব মুখের কথার মতো, সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্বটি স্বভাবতঃই আরো প্রত্যক্ষ এবং আরো মুগ্ধকর। সবার আগে তেমন একটি উদাহরণ পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করি—"বাবুরামের লম্বা পত্র পড়লাম। বুড়ো বেঁচে আছে—বেশ কথা। তোমাদের আড্ডাটা নাকি বড় malarious (ম্যালেরিয়াগ্রস্ত)—রাখাল আর হরি লিখছেন। রাজাকে আর হরিকে আমার বহুত দণ্ডবৎ লাটিবৎ ইষ্টিকবৎ ছত্রীবৎ দিবে। · আমার বহুত চিঠি লেখবার সময় বড় একটা হয় না। Lecture (লেকচার) ফেকচার তো কিছু লিখে দিই না। একটা লিখে দিয়েছিলুম, যা ছাপিয়েছ। বাকি সব দাঁড়াঝাঁপ যা মুখে আসে, গুরুদেব জুটিয়ে দেন। কাগজ-পত্রের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। একবার ডেট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়েছিলুম। আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে ; 'মধো'

তোর পেটে এতও ছিল, !”[১]

উত্তর কলকাতার শিমলা পাড়ার তরুণেরা—বিশেষতঃ শিক্ষিতশ্রেণী সেকালে যে বাংলায় কথা বলতেন, উদ্ধৃত পত্রাংশে স্বামীজীর সেই ভঙ্গীটি—তাঁর কথাবার্তার স্বভাবসরস ভঙ্গীটি এক্ষেত্রে জীবন্ত করে তুলেছে। ‘দণ্ডবৎ’ থেকে দণ্ডের নানা প্রতিশব্দ এসে কথা ও কল্পনার যুগপৎ খেলা এমন এক খেয়ালরসের পরিচয় বহন করে যা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং পরিশীলিত বাগ-বৈদগ্ধ্যের পরিচয়বাহী। আবার নিজের বক্তৃতা সম্বন্ধে নিজেই অমন পরিহাস করতে পারা—সেও খুব উঁচুদরের আত্মবিশ্বাসেই সম্ভব। উদ্ধৃত চিঠিটির কিছুদিন পরেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা আর একটি চিঠিতে আমেরিকায় স্বামীজীকে যে মননসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, তার বিবরণ দিতে গিয়ে যে নির্ভীক দৃঢ়সংকল্প যোদ্ধার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে, তাতে একই সঙ্গে কৌতুক পরিহাস ও বেপরোয়া মনোভাবের সার্থক সংমিশ্রণ—“শশী প্রভৃতি যে ধুমক্ষেত্র মাচাচ্ছে, এতে আমি বড়ই খুশী। ধুমক্ষেত্র মাচাতে হবে, এর কম চলবে না। কুছ পরোয়া নেই। দুনিয়াময় ধুমক্ষেত্র মেচে যাবে, ‘বাহ্ গুরুকা ফতে।’ আরে দাদা, ‘শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি’, ঐ বিঘ্নের গুঁতোয় বড়লোক তৈরী হয়ে যায়। ··বলি মোহন, মিশনরী-ফিশনরীর কর্ম কি এ ধাক্কা সামলায়? এখন মিশনরীর ঘরে বাঘ সেঁদিয়েছে। এখানকার দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পাদ্রীতে ঢের চেষ্টা-বেষ্টা করলে—এ গিরিগোবর্ধন টলাবার জো কি। মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল—এখন কি তাঁতীর কর্ম ফার্সি পড়া? ওসব চলবে না ভায়া, কিছু চিন্তা ক'রো না। সকল কাজেই একদল বাহবা দেবে, আর একদল দুষমনাই করবে। আপনার কার্য করে চলে যাও—কারুর কথার জবাব দেবার আবশ্যক কি?”[২]

শব্দ-নির্বাচনে স্বামীজীর অপক্ষপাতিত্ব চলতি ভাষার পক্ষে একটি বড়ো গুণ। এ বিষয়ে প্যারীচাঁদ বা হুতোমের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা। কিছুটা এই বেপরোয়া ভাব হুতোমের রচনা-ভঙ্গীতেও মেলে—কিন্তু সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র হওয়ার ফলে হুতোমের রচনায় নেতিবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রাধান্য। অন্যপক্ষে স্বামীজীর লেখায় ইতিমূলক প্রেরণার ফলে কঠোর বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গও শেষ অবধি জলন্ত বিশ্বাসেরই অনুরূপ।

‘কুছ পরোয়া’, ‘ওয়া গুরু কী ফতে’, ‘শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি’ ‘মোগল পাঠান হদ্দ হল’ প্রভৃতি প্রয়োগে নানা ভাষার অব্যর্থ প্রয়োগ যেমন, তেমনি আবার প্রবাদ-প্রবচনের সুপ্রয়োগও লক্ষণীয়। হাস্যরসের অন্যতম প্রধান উপকরণ প্রবাদ-প্রবচনের যথাযোগ্য ব্যবহার। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দু'জনারই দক্ষতা প্রণিধানযোগ্য।

কথায় কথায় কল্পিত কোনো ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বক্তব্য প্রকাশও চলতি ভাষার একটি প্রধান গুণ। ‘মধো, তোর পেটেও এত ছিল!’ ‘বলি মোহন’ ‘রামচন্দ্র!’ ‘নিধে পেলা’ এজাতীয় কথাগুলির এক নিজস্ব ব্যঞ্জনা আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তায় শোনা যায়। স্বামাজী সেই ভঙ্গীটি অবিকল তাঁর লেখার ভাষায়ও সঞ্চার করেছেন। আমাদের ঘরোয়া কথায় এক এক যুগে এই সম্বোধনের নামটি হয়তো এক এক রকম, তবে মূলত স্বল্পবুদ্ধি এবং অন্যের কথায় চালিত ব্যক্তি-রাই এর লক্ষ্যস্থল।

যে ‘জীব শিব’ মন্ত্র তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

---

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৪২৫, ১৮৯৪ [গ্রীষ্মকাল]

২ তদেব : পৃঃ ৪৮২

কাছে লাভ করেছিলেন সে মন্ত্রের প্রচার ও জীবন-ময় উদ্‌যাপনে ব্যাকুলতা তাঁর লেখায় মাঝে মাঝে ব্যঙ্গের স্পর্শ এনে দিয়েছে। তারই অন্যতম উদাহরণ—"মুক্তি-ভক্তির ভাব দূর করে দে। এই একমাত্র রাস্তা আছে দুনিয়ায়—পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং পরার্থং প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ (পরোপকারের জন্যই সাধুদের জীবন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্যই তা উৎসর্গ করবেন)। তোমার ভাল করলেই আমার ভাল হয়, দোসরা আর উপায় নেই, একেবারেই নেই। 'হে ভগবান, হে ভগবান!' আরে ভগবান হেন করবেন, তেন করবেন—আর তুমি বসে বসে কি করবে? ...তুই ভগবান, আমি ভগবান। মানুষ ভগবান দুনিয়াতে সব করছে ; আবার ভগবান কি গাছের উপর বসে আছেন?"[৩]

সমাজে সংসারে নানাভাবে মানুষের এই বুদ্ধির দৌড় দেখতে দেখতে তীব্র ব্যঙ্গে তাঁর শাণিত লেখনী প্রচলিত হিন্দুয়ানির ভণ্ডামিকে জর্জরিত করেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা একটি পত্রে 'বিমলা' ও 'শশী সাণ্ডেল' নামে দু'জনের উপলক্ষে স্বামীজীর ভাষাভঙ্গী—[শশী সাণ্ডেলের] "পুঁথি পড়ে বিমলা অবগত হয়েছেন যে, এ দুনিয়াতে যত লোক আছে, তারা সকলে অপবিত্র, এবং তাদের প্রকৃতিতে আসল ধর্ম হবার জো-টি নাই। কেবল ভারতবর্ষের একমুষ্টি ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন তাঁদেরই ধর্ম হতে পারবে। আবার তাদের মধ্যে শশী আর বিমলাচরণ—এঁরা হচ্ছেন চন্দ্রসূর্যস্বরূপ। সাবাস, কি ধর্মের জোররে বাপ! বিশেষ বাঙলা দেশে ঐ ধর্মটা বড়ই সহজ। অমন সোজা রাস্তা তো আর নাই। তপ-জপের সার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি পবিত্র আর সব অপবিত্র।"[৪]

উল্লেখিত শশী সাণ্ডেলের লেখা একখানি 'আধ্যাত্মিক' বিষয়ে বাংলা বই ছাপানোর জন্য আমেরিকা থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় কি না, এই ছিল বিমলার চিঠির জিজ্ঞাস্য। অথচ ব্রাহ্মণকুলমাহাত্ম্যে এদেশে বা বিদেশে আর সকলেই যে ঘৃণ্য, সেইটি এঁদের মজ্জাগত ধারণা। দুনিয়াশুদ্ধ লোককে যত ঘৃণা করা যাবে, তারা ততই প্রণাম ঠুকে এঁদের মহিমা বাড়াবেন। এমন স্পর্দ্ধিত প্রত্যাশার ক্ষেত্রে স্বামীজীর মন্তব্য —"যদি আমেরিকার লোকের ধর্ম হতে পারে না, যদি এদেশে ধর্ম প্রচার করা ঠিক নয়, তবে তাহাদের সাহায্য গ্রহণে আবশ্যক কি?...বিমলা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যখন ভারতশুদ্ধ লোক শশী (সাণ্ডেল) আর বিমলার পদপ্রান্তে ধনরাশি ঢেলে দেয় না, তখন ভারতের সর্বনাশ উপস্থিত। কারণ, শশীবাবু সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অবগত আছেন এবং বিমলা তৎপাঠে নিশ্চিত হয়েছেন যে, তিনি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেহ পবিত্র নই। এ রোগের ঔষধ কি?"[৫]

এর পর এ চিঠিতে ধর্মব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্যের তীব্রতা আক্রমণের মতো শোনালেও মনে রাখতে হবে যে, স্বামীজীর পত্রাবলীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই প্রান্তেরই ধর্মধ্বজীদের উদ্দেশে তাঁর সমান ধিক্কারবাণী। তথাকথিত লোকাচারকে যারা ধর্মের সঙ্গে একাত্ম করে চালাতে ইচ্ছুক, সেই ধর্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার ধারকবাহকদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তিনি যখন লেখেন—"...'দেহি দেহি' চুরিবদমাশি—এরা আবার ধর্মপ্রচারক! পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলে, 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না'—আর কাজ তো ভারি—'আলুতে বেগুনেতে

---

৩ তদেব : ৭ম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৭৪, ১৮৯৫, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা।

৪, ৫ তদেব, পৃঃ ৭৫ ; 'ভাববার কথা' রসরচনাগুচ্ছে 'কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য' স্মরণীয়।

যদি ঠেকাঠেকি হয়, তা হ'লে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে?' ১৪ বার হাতে মাটি না করিলে ১৪ পুরুষ নরকে যায়, কি ২৪ পুরুষ?'—এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন আজ দু'হাজার বৎসর ধরে। এদিকে ¼ of the people are starving (সিকি ভাগ লোক অনাহারে রয়েছে)।...''[৬]

এই বিমলা ও তাঁর গুরু শশী-সাণ্ডেল প্রসঙ্গেই স্বামীজীর সেই বেদনাহত হৃদয়ের তিক্ত কঠোর বাস্তবদর্শী মন্তব্য—"ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ!! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই—এখন ভাতের হাঁড়িতে...।"[৭]

বাংলা সাহিত্যে স্বামীজীর এ জাতীয় মন্তব্য অমর হয়েছে এদের মধ্যে ভারতীয় ভাবজীবনের দুর্বলতা সম্বন্ধে অসামান্য স্পষ্টোক্তির দক্ষতায়। ধর্মের স্বরূপ তিনি আপন গুরুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, আপন সাধনায় উপলব্ধি করেছেন, সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের নামে যে কপটতা চলে, বিশেষতঃ জাতিভেদের গোঁড়ামির মূলে ধর্মসম্বন্ধে যে ভ্রান্তধারণা তার বিরুদ্ধে এমন নির্মম কশাঘাতই প্রয়োজন। তবু, এই শশী সাণ্ডেলের দারিদ্র্যমোচনে সহায়তার জন্য এ চিঠিতেই অনুরোধ রয়েছে।

তাঁর মতো মুক্ত পুরুষের জীবন ও আচরণ আমাদের প্রথাবদ্ধ জীবনযাত্রায় এতো বড়ো বিস্ময় যে, সাধারণের সমালোচনা তাঁকে চিরকাল শুনতে হয়েছে এবং তাঁর বীরেশ্বরসত্তার বৈশিষ্ট্যে সে সব উপেক্ষাও করে এসেছেন। এ-জাতীয় সমালোচনা-প্রসঙ্গে সে যুগের হিন্দুয়ানীর উৎকট মনোভাব যে একদল শিক্ষিত বাঙালীকে পেয়ে বসেছিল, তাদের কথা মনে রেখে স্বামীজীর মন্তব্য—"...লোকে যা হয় বলুক গে। 'লোক না পোক'।...Orthodox (গোঁড়া) পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন কালে, বা আচারী হিন্দু কোন কালে? I do not pose as one. (আমি সেরকম বলে নিজেকে জাহির করি না।) বাঙালীরাই আমাকে মানুষ করলে, টাকাকড়ি দিয়ে পাঠালে, এখনও আমাকে এখানে পরিপোষণ করছে—অহ হ!!! তাদের মন জুগিয়ে কথা বলতে হবে—না? বাঙালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? ...বাঙালী! · আহার গেঁড়ি গুগলি, পান প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুরজল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলাপাতা এবং ছেলের মলমূত্র-মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্নী শাকচুন্নীর সঙ্গে, বেশ দিগম্বর কৌপীন ইত্যাদি, মুখে যত জোর! ওদের মতামতে কি আসে যায় রে ভাই? তোরা আপনার কাজ করে যা। মানুষের কি মুখ দেখিস, ভগবানের মুখ দেখ।"[৮]

যুগের বদলে আজ হয়তো পরিবেশ একটু ভিন্ন, কিন্তু যে তমোগুণী অলস বাক্‌সর্বস্বতার বিরুদ্ধে স্বামীজীর সংগ্রাম—তার প্রয়োজন আজও সমান রয়েছে। নিরর্থক অকরুণ সমালোচনায় বাঙালী মনের প্রবণতার কথা জেনেই স্বামীজীর এই ভর্ৎসনা, অথচ এই বাংলা ও বাঙালীর কল্যাণচিন্তা তাঁর হৃদয় ভরে রেখেছিল। বাঙালীর সৌন্দর্য, বাঙালীর হৃদয়, বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুবই উঁচু। অন্যদিকে বাঙালীর দুর্বলতা যে

৬ তদেব: পৃঃ ৭৫

৭ তদেব: পৃঃ ৫১-৫২

৮ তদেব: পৃঃ ১৬৮-১৬৯: ১৮৯৫, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা। ব্যঙ্গের প্রকাশ হিসাবে 'অহ হ' ধ্বনিটির প্রয়োগ মৌখিক ভাষার প্রভাবের দিক থেকে লক্ষণীয়।

কোথায় সে কথাও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে সমকালীন মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের সমালোচনাকে প্রলাপবাক্যের বেশী মর্যাদা দেন নি।

সেবাই যে যুগধর্ম, এ কথাটি তাঁর বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, কবিতায়, চিঠিপত্রে নানাভাবে বারংবার প্রকাশিত। স্বামী অখণ্ডানন্দ বহরমপুরে সমষ্টিরূপে ভগবানের সেই সেবাব্রত উদ্‌যাপন করছিলেন দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের অন্নের ব্যবস্থা করে। এ উপলক্ষে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখতে গিয়ে স্বামীজীর বক্তব্য প্রকাশের সস্মিত ভঙ্গীটি গুরুতর দার্শনিক প্রজ্ঞাকে সহজ রসবোধের স্পর্শে উজ্জ্বল করে তোলার নিদর্শন—"ফিলসফি, যোগ, তপ, ঠাকুরঘর, আলোচাল, কলামূলো—এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম, দেশগত ধর্ম ; পরোপকারই সার্বজনীন মহাব্রত—আবালবৃদ্ধবনিতা আচণ্ডাল, আপশু সকলেই এ ধর্ম বুঝিতে পারে। শুধু negative (নিষেধাত্মক) ধর্মে কি কাজ হয়? পাথরে ব্যভিচার করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না। বৃক্ষেরা চুরি ডাকাতি করে না। তাতে আসে যায় কি? তুমি চুরি কর না, মিথ্যা কথা কও না, ব্যভিচার কর না, চার ঘণ্টা গান কর, আট ঘণ্টা ঘণ্টা বাজাও - মধু, তা কার কি?' ঐ যে কাজ, অতি অল্প হলেও ওতে বহরমপুর একেবারে কেনা হয়ে গেল—এখন যা বলবে, লোকে তাই শুনবে। এখন 'রামকৃষ্ণ ভগবান' লোককে আর বোঝাতে হবে না। তা নইলে কি লেকচারের কর্ম—কথায় কি চিঁড়ে ভেজে?"[১]

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের মিলন সাধনের জন্য ভগিনী নিবেদিতার আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা আমরা জানি। এ দুই চিন্তাধারার মূলগত পার্থক্যের দিকটা মনে থাকলে বোঝা যায় এ মিলন তখন অসম্ভবই ছিল। কিন্তু ব্রাহ্ম (জোড়াসাঁকোর আদি ব্রাহ্মসমাজ) কর্তৃপক্ষ গোড়ায় আপত্তি জানালেন রামকৃষ্ণদেবকেই নিয়ে। 'ব্রহ্ম' ছাড়া ব্রাহ্মসমাজ গঠনের প্রস্তাব তাঁরা কোন দৃষ্টিতে নিতেন, সেকথা ভাবা যেতে পারে। সে যাই হোক, স্বামীজীর পাশ্চাত্যপরিক্রমায় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ খুবই কম উচ্চারিত—বিশ্বজনীন বেদান্ত প্রচারই সেদেশে স্বামীজীর মুখ্য প্রচেষ্টা আর তাঁর ভারতীয় পটভূমিকায় রচনা ও বক্তৃতাবলীতে ধর্ম ও সভ্যতার মানদণ্ড স্বাভাবিকভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ—যাঁর জীবনে ভারতীয় অধ্যাত্ম ঐতিহ্যের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। ব্যক্তিগত গুরুভক্তির কথা বাদ দিলেও শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের তাৎপর্য স্বামীজী যেভাবে অনুধাবন করেছিলেন তাতে বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণভাবধারা প্রচারের প্রয়োজন। সমাজসেবা দেশসেবা প্রভৃতি এই ভাবধারারই পরিপোষকমাত্র, প্রধান লক্ষ্য হতে পারে না।

সরলা ঘোষালকে লেখা পত্রটিতে ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দের মনোভাব-প্রসঙ্গে স্বামীজীর তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ সমগ্র পত্রটিকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংগ্রামী ভঙ্গীর অন্যতম সার্থক নিদর্শনে পরিণত করেছে। 'পত্রসাহিত্য' অবশ্যই অনেকক্ষেত্রে অচেতন সাহিত্য সৃষ্টি। সেই কারণেই এক হিসাবে সাহিত্যিকের অন্তরতম পরিচয়ের অভ্রান্ত সাক্ষ্য হিসাবে এবং তাঁর লেখকসত্তার নিজস্বরূপটি নির্ধারণে পত্রসাহিত্যের বিশেষ সার্থকতা। আবার স্বামীজীর রচনাবলীতে হাস্যরসের তীব্র আঘাতশক্তির সঙ্গে গভীর মরমী দৃষ্টির মিলনের দিক থেকেও আলোচ্য পত্রটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

"...যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোনও উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টিয়ানদের অনন্ত নরক-ভোগ

---

১ তদেব : পৃ: ৩৬৬-৬৭ : ১০ই জুলাই ১৮৯৭, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা।

করিতেও প্রস্তুত আছি জানিবেন। তবে মানুষ দেখতে দেখতে বৃদ্ধ হ'তে চলিলাম। এ সংসার বড়ই কঠিন স্থান। গ্রীক দার্শনিকের লণ্ঠন হাতে করিয়া অনেক দিন হইতেই বেড়াইতেছি। আমার গুরুঠাকুর সর্বদা একটি বাউলের গান গাহিতেন—সেইটি মনে পড়ল :

'মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তার যায় গো জানা,
সে দু এক জনা,
সে রসের মানুষ উজান পথে
করে আনাগোনা।'

তারপর যে-সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার একটুকু খুঁত আছে। বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড়-ছেঁড়, প্রাণ যায়-যায়, কণ্ঠে ঘড় ঘড় ইত্যাদি—আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ করে দিলে ?

এই যে প্রবলতরঙ্গশালিনী নদী, যার বেগে পাহাড় পর্বত যেন ভেসে যায়, একটি ঠাকুরে একেবারে হিমালয়ে ফিরিয়ে দিলে! বলি, ও-রকম দেশ-হিতৈষিতা'তে কি বড় কাজ হবে মনে করেন, বা ও-রকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হতে পারে? আপনারা জানেন, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারি না। তৃষ্ণার্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্নবিচার, এত নাক সিটকানো? কে জানে কার কি মতিগতি! আমার যেন মনে হয়, ও-সব গ্লাসকেসের মধ্যে ভাল; কাজের সময় যত ওরা পিছনে থাকে, ততই কল্যাণ।"[১০]

ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ এখানে কোনো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের প্রকাশ নয়। আদর্শের সংঘাতের ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যের সাধুতা নিয়েই এক্ষেত্রে প্রশ্ন। মানব-কল্যাণে যাঁরা অগ্রসর হতে চান, তাঁরা অনেক সময়ই পন্থা নিয়ে অনর্থক কলহের ফলে উদ্দেশ্যটিই ভুলে বসে থাকেন।

উদ্ধৃত পত্রাংশে 'গুরুঠাকুর' শব্দটির সচেতন প্রয়োগ, তথাকথিত 'গুরুবাদ'-বিরোধীদের আঘাতের সমুচিত উত্তর হিসাবেই ব্যবহৃত। অন্য মতের গুরুবাদকে অস্বীকার করে স্ব স্ব মত-প্রাধান্যের গুরুগিরি ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতির সব ক্ষেত্রেই আজ দেখা যায়। গুরুবাদের বিরোধীই এক-সময় 'গুরু' নামে আখ্যাত হয়ে থাকেন তথাকথিত ভক্তবৃন্দের দ্বারা।

বস্তুতঃ যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবসেবার আদর্শে সমাধিপ্রত্যাশী বিবেকানন্দের সেবাব্রতগ্রহণ, তাঁকে বাদ দিয়ে সঙ্ঘের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার প্রস্তাবটিই স্ববিরোধিতার চরম দৃষ্টান্ত। রামকৃষ্ণ-অনুপ্রাণিত বিবেকানন্দ অন্য সব মতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করলেও কারুর উপরে মত চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াসকে সর্বোতোভাবে পরিহার করেছেন। তাঁর নিজের আদর্শ ও কর্মপন্থার ক্ষেত্রেও সেকথাই প্রযোজ্য।

মানবসেবাব্রতে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণরূপ কেন্দ্রটি এত দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করে থাকার ফলে সেবাধর্মের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা কীভাবে প্রসারিত হয়েছে, সেকথা সুপ্রমাণিত। আর স্বামীজীর ভাষায় যাঁদের বুক-ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড়ছেঁড়, প্রাণ যায় যায় ইত্যাদি তাঁদের চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতাও ইতিহাসের সামগ্রী। কিন্তু এই আদর্শগত সংঘাতের ফলে জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বিবেকানন্দ-মানস-ধাতুর যে শব্দ-কণিকা ঝরে পড়েছে, তা চলিত বাংলার প্রাণশক্তি ও বাংলা

১০ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : অষ্টম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৫৬

সাহিত্যে হাস্যরসসৃষ্টির জীবন্ত প্রতীক।

আঘাতে প্রতিঘাতে চিন্তা ও সিদ্ধান্তের অসঙ্গতিগুলি তুলে ধরতে বিবেকানন্দের গদ্যভঙ্গিমার নিপুণ তীক্ষ্ণতা আমাদের সেই 'সাফ ইস্পাতে'র উপমাটি মনে পড়িয়ে দেয়, 'যা-এক-চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না,।'[11]

---

১১ 'বাঙ্গালা ভাষা' : বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩৫

মূলতঃ 'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লেখা পত্রের অংশ। পত্রটির তারিখ ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০। আমেরিকার "কালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লস্ এঞ্জিলস্ নামক স্থান হইতে" লেখা মূলপত্রটির এই অংশ 'উদ্বোধন'-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (১৫ই চৈত্র, ১৩০৬) সূচনাপ্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়। বিবেকানন্দ সাহিত্যের-'পত্রাবলী' অংশেই লেখাটির যথার্থ স্থান, তবে বক্তব্যের তাৎপর্যে পৃথক প্রবন্ধরূপেও গ্রহণীয়।

শুভ পঞ্চমীতে

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর, ভারতী

[গান : জৌনপুরী, একতাল]

শুভ পঞ্চমীতে—
মাগো ! তুমি কি আবার এলে ?
দিশাহারা এই অন্ধ সমাজে
দিতে পথের নিশানা ব'লে ॥

শুধুই কি মাগো, পলাশে শিমূলে,
মানুষের ব্যথা তুমি যাবে ভুলে ?
তোমার হংস হংসবাহিনি !
রবে পূজা মাঝে ডানা মেলে ॥

পরা-অপরা-বিদ্যাদায়িনী
তুমি মা সরস্বতী
সদা হৃদি তন্ত্রীতে তব বীণাধ্বনি
শুনিবারে দাও মতি।

তোমার পূজার কল-কোলাহল
শুভ সংযোগে হোক্ সুবিমল
আলোকিত করো হৃদয় মোদের
জ্ঞান-দীপখানি জ্বেলে ;
যদি আবার তুমি মা এলে ॥

স্বামীজী

শ্রীমতী বাসন্তী মণ্ডল

স্বা-মী-জী শুধুই তিনটি আখর
কত না মহিমা-মাখা
বিশ্ববাসীর অন্তরলোকে
ও নাম রয়েছে আঁকা। ১

কালের চক্রে দীর্ঘ বরষ
অতীত হয়েছে বটে
আজো জীবন্ত রহিয়াছ তুমি
সবার মানস-পটে। ২

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
কত বড় পরিচয়
শুদ্ধ বাণীর পুণ্য পরশে
বিশ্ব করেছ জয়। ৩

তোমারি মাঝারে শ্রীরামকৃষ্ণ
দেখালেন ঠাকুরালি
নরদেবতারে করিলে আরতি
প্রাণের প্রদীপ জ্বালি। ৪

তোমার বেলুড়-তীর্থে আজিকে
জগতের আনাগোনা
পুব পশ্চিম একসাথে মিলে
করে তব অর্চনা। ৫

নদী বহে

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

হয়তো কোন দূর অরণ্যাবৃত পর্বতের প্রচ্ছন্ন প্রস্রবণ হইতে ক্ষীণ ধারায় নির্গত হইয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া বাড়িয়া নদী সমুদ্রের অভিমুখে বহিয়া চলে। ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়া কখনো বা শিলা ভেদ করিয়া দূর বিস্তৃত সমতল ভূমির বুকের উপর দিয়া আবার উষর কঠিন মাটি চিরিয়া নদীর জলস্রোত প্রবাহিত হয়। সেই স্রোত কোথাও উত্তাল, কোথাও ক্ষীণ—কোথাও ঋজু, কোথাও বক্র—কোথাও অতি প্রশস্ত, কোথাও সংকীর্ণ। নদীর দুই তটে কত বিচিত্র দৃশ্যপট—কোথাও ঘন বৃক্ষসমারোহ, কোথাও দিগন্ত-প্রসারিত মাঠ—কোথাও শস্যক্ষেত্র-পরিবেষ্টিত গ্রামের পর গ্রাম আবার কোথাও অট্টালিকা-কারখানা বিকীর্ণ শহরের সারি। নদীকে আমরা মা বলি—কোনও কোনও নদী আমাদের নিকট পুরুষ—নদ। নদী বা নদের একটি প্রাণসত্তা, একটি ব্যক্তিত্ব আমরা কল্পনা করিয়া থাকি। এই ব্যক্তিত্বের কি চেতনা আছে, অনুভূতি আছে? ভারতবাসী আমাদের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই আছে—নহিলে আমরা গঙ্গাপূজা করি কেন, নর্মদামায়ীর, গঙ্গোত্রীমায়ীর মূর্তি গড়ি কেন, যমুনামায়ীর উদ্দেশে স্তোত্র লিখি কেন?

নদীকে প্রাণসত্তা দিয়া আমরা যদি তাহার হৃদয়ের অনুমান করি তাহা হইলে সেই হৃদয় নিশ্চিতই একটি বিপুল বৈচিত্র্যময় মহা-হৃদয়। মানুষের হৃদয়ে যেমন সুখ-দুঃখ উল্লাস-বেদনা আশা-নিরাশা অনুকম্পা-কঠোরতার আবর্তন চলে নদীর বিশাল হৃদয়ে সেই রূপই বিচিত্র আবেগ-রাশির আলোড়ন আমরা কল্পনা করিতে পারি। নদীর করুণা আমাদের শস্যক্ষেত্রকে সজীব রাখে, আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে। আমাদের সংসারের বহুতর প্রয়োজন মিটাইয়া চলে। নদীর ক্রোধ বন্যা হইয়া আমাদের বাড়ী ঘর ভাসাইয়া দেয়, আমাদের খাদ্যসম্ভারকে নষ্ট করিয়া আমাদিগকে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন করে। নদীর যদি স্নেহ না থাকিত তাহা হইলে অগণিত জলচর তাহার আশ্রয়ে জীবনধারণ করিত কেমন করিয়া? নদীর যদি সহিষ্ণুতা না থাকিত তাহা হইলে মানুষের উৎকট স্বার্থপর অত্যাচারগুলি সে সহ্য করিত কোন সামর্থ্যে? নদীর বুকের উপর প্রাণি-নিবহের যে সকল হিংস্রতা অনবরত ঘটিয়া চলে তাহারা নদীর হৃদয়কে সন্তপ্ত করে না কি? নদীর দাক্ষিণ্যে নদীতীরবাসী আমাদের গৃহ-সংসার যখন সুখ-সমৃদ্ধ হয় তখন সেই সুখ নদীরও হৃদয়কে উদ্বেল করে না কি?

নদী বহে। নাচিয়া, গাহিয়া, হাসিয়া, কাঁদিয়া, জাগিয়া, ঘুমাইয়া, উৎসাহে মুখর আবার ক্লান্তিতে বিবশ হইয়া অনবরত বহে। বহা ছাড়া তাহার উপায়ান্তর নাই। যতকাল না লক্ষ্যে পৌঁছিতেছে ততকাল তাহাকে বহিতেই হয়। লক্ষ্যে পৌঁছিলে, সাগরে গিয়া মিশিলে নদীর ছুটি। তটের সীমা আর নাই, অনুভূতির বৈচিত্র্য ফুরাইয়াছে। কর্তব্যের ভার নামিয়া গিয়াছে। হাসিবার আর প্রয়োজন নাই, কাঁদিবারও সম্ভাবনা চিরদিনের জন্য তিরোহিত। মুক্তি। সমুদ্রের সহিত এক হইয়া নদীত্বের মুক্তি। সসীম নদী এখন নিঃসীম সমুদ্র।

* * *

উপনিষদের ঋষি মানুষের জীবনকে নদীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। আমরা নদীর মত স্রোতের বহু ভঙ্গিমায় সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা

সফলতা-ব্যর্থতা উন্নতি-অবনতি উৎসাহ-ক্লান্তির নানা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া কখনও ঋজু, কখনও বক্রপথে—বহিয়া চলিয়াছি জন্ম হইতে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া। আমাদেরও লক্ষ্য আছে—লক্ষ্যে পৌছিলে ছুটি আছে। জীবন-নদীর লক্ষ্য শ্রীভগবান। শ্রীভগবানকে লাভ করিলে মানুষের মুক্তি। মানুষের সসীম ব্যক্তিত্ব শ্রীভগবানের স্পর্শে অসীমতা লাভ করে।

কিন্তু মুস্কিল হইল আমরা অসীমত্বকে ভয় পাই। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া সসীমের মধ্যে থাকিয়া সসীমকে আমরা এত ভালবাসিয়া ফেলি যে উহার অতিরিক্ত যে একটি পরম সার্থকতা আছে তাহা ভাবিতে চাই না। তাই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের জাগে না। নদী যদি সমুদ্রে পৌছিতে ভয় পাইত তাহা হইলে তাহাকে চিরদিন আঁকিয়া বাঁকিয়া শিলা ও মৃত্তিকার বেড়ার মধ্যে ঘুরপাক খাইতে হইত। অবশেষে হয়তো রুক্ষ মরুভূমি তাহাকে শুষিয়া লইত। যে শিশু সর্বদা পুতুল লইয়া খেলিতে চায়, খেলার জন্য খাইতে-শুইতে আপত্তি করে সে নির্বোধ শিশুর স্বাস্থ্য সবল হইতে পারে না। যে মানুষ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের আনন্দকেই চরম ও পরম বলিয়া মনে করে সেই মানুষকে উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন "মূঢ়"।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং-মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

হৃদয় যাহাদের অবিদ্যার বাসা, জ্ঞানদৃষ্টিশূন্য অথচ নিজদিগকে পণ্ডিত ও জ্ঞানী বলিয়া যাহারা গর্বিত সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের মতো সংসারের কুটিল পথে অনবরত ঘুরিয়া মরে। (কঠ উপনিষদ ১।২।৫)

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥

সংসার-সুখে প্রমত্ত ধন-সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন অবিবেকীর হৃদয়ে অতীন্দ্রিয় সত্য প্রতিভাত হয় না। সে মনে করে রূপ-রস-গন্ধময় এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়বেদ্য জগতের বাহিরে মহত্তর আর কিছু নাই। এইরূপ অজ্ঞানগ্রস্ত ব্যক্তিকে বার বার জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয়।

(কঠ উপনিষদ ১।২।৬)

ধন্য সেই মানুষ যাহার হৃদয়ে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া যে শ্রেয়ঃকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, যাহার জীবন-নদী নিঃসন্দিগ্ধ ব্যাকুল অভীপ্সায় পরমাত্মারূপ মহাসমুদ্রের সহিত মিলনের জন্য বহিয়া চলিয়াছে। সে জানিয়াছে সংসার অর্থে সং ই সার। সে ক্ষুদ্র হইতে মন তুলিয়া ভূমার প্রতি সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল চেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করিতে সর্বদা তৎপর। সে জানে সাগরে পড়িলে নদী কিছুই হারায় না। অপরিসীম লাভে লাভবান হয়, মরে না, ক্ষয়হীন জীবন লাভ করে। ভগবানকে লাভ করিলে মানুষ যাহা প্রতিনিয়ত খুঁজিতেছে তাহা অপরিমেয় ভাবে পায়—সত্যরূপে পায়।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

নদীসমূহ গিরি-কান্তার-অরণ্য ভেদ করিয়া চলে। অবশেষে যখন সাগরের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার নামও নাই, রূপও নাই। সেইরূপ আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি বিশ্বসংসারের নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া সীমাহীন সমুদ্রতুল্য পরাৎপর স্বয়ংজ্যোতিঃ পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্যলাভ করেন। (মুণ্ডক উপনিষদ ৩।২।৮)

বহিয়া চলা মানবজীবনে অপরিহার্য, কিন্তু পরম লক্ষ্য নয়। বুদ্ধিমান সেই যে বিবেকের সহিত, অনাসক্তির সহিত বহিয়া চলে। তটের সহিত তাহার মিতালি আছে, কিন্তু মোহ-বন্ধ নাই। জীবনকে প্রত্যাখান করিও না কিন্তু উহাকে অতিজীবনে সুপ্রতিষ্ঠ কর এবং যখন সময় আসিবে তখন জীবনকে অতিজীবনে বিলীন করিয়া জীবনের চরম সার্থকতা লাভ কর—ইহাই উপনিষদের বাণী। অতিজীবনে ভয়ের কোনও আশঙ্কা নাই, সংশয়ের নাম-গন্ধ নাই, শোক-দুঃখের দূরতম সম্ভাবনা নাই।

জীবনবন্ধু

স্বামী মধুসূদনানন্দ

হে মোর হৃদয়বন্ধু, প্রেমময় স্বরূপ আমার
জানিয়াছি তোমারেই জীবনের একমাত্র সার।
এ ভবসাগর মাঝে চলিয়াছে এ জীবনতরী
অকুল পাথারে নাথ, আছ তুমি জীবন-কাণ্ডারী।
তোমারেই পাইয়াছি এ ভবসাগরে আপনার
জানিয়াছি তোমারেই জীবনের একমাত্র সার।
গভীর মোহের মাঝে ছিলাম যে আঁখি দুটি মুদে
দেখিতে তো পাই নাই আছ তুমি জাগি মম হৃদে।
তব শুভ পরশনে জাগিয়াছে হৃদয় আমার
জানিয়াছি তোমারেই জীবনের একমাত্র সার।
আঁধার হৃদয় মাঝে প্রকাশিল তব স্নিগ্ধ জ্যোতি
তব শুভ পরশন পাইয়াছি, হে হৃদয়-পতি
মিলনের আহ্বানে পুলকিত হৃদয় আমার
জানিয়াছি তোমারেই জীবনের একমাত্র সার।

সংখ্যার সাহায্যে অদ্বৈতবাদ

শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায়

'আমি যে এক'—এই জ্ঞান আমার স্বাভাবিক। মানুষ যাহা কিছু অস্বীকার করুক না কেন সে কখনও নিজের সত্তাকে অস্বীকার করিতে পারে না। কারণ নিজের সত্তাকে অস্বীকার করিতে গেলেও নিজের থাকা চাই। সব সময়ই আমাদের মনে হয়—'আমি এক, বহু নহি। সেইজন্য সেই এককে ভিত্তি করিয়াই আমাদের দুই, তিন প্রভৃতি গুনিতে শিখান হয়। কিন্তু দুই, তিন প্রভৃতির মধ্যে একের নাশ হয় না—উহাদের মধ্যে এক দুই, তিনবার অনুগত থাকে। অর্থাৎ ১ + ১ = ২ এবং ১ + ১ + ১ = ৩ ইত্যাদি। অন্য সংখ্যার বেলায়ও ঐরূপ। দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যা একেরই বিস্তার, একেরই মহিমা। কিন্তু লিখিতে গেলে দুই, তিন প্রভৃতির মূর্তি বা চেহারা একের মূর্তি হইতে ভিন্ন রূপ।

এখন দুই, তিন প্রভৃতি যদি জানিতে পারে যে উহারা এক হইতে জাত, একই উহাদের পিতা, তবে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি সত্ত্বেও উহারা বুঝিতে পারিবে যে, এক পিতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া উভয়ের ভাই ভাই সম্বন্ধ। কিন্তু সেই দুই, তিন প্রভৃতি যখন একের সন্ধান না রাখে, তখন উভয়ে উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি দেখিয়া পরস্পরকে এক পিতার পুত্র বলিয়া জানিতে পারে না এবং পরস্পর কলহ, বিবাদ ও মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়। এক পিতাকে (অদ্বৈত ঈশ্বরকে) অস্বীকার করিয়া পরস্পরের মধ্যে যে ভাই ভাই সম্বন্ধ-স্থাপন উহা কৃত্রিম এবং অহংকারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বার্থের এক আঘাতেই উহা ভাঙ্গিয়া যায়।

দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যার বিভিন্ন মূর্তি দেখিয়া পাছে আমরা একক বিস্মৃত হই, সেইজন্য দশ এই সংখ্যায় (১০) একক স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেখান হইল দশ এই সংখ্যায় একই সত্য, বাকীটা শূন্য। যদি শূন্যের পূর্বে এক থাকে, তবেই শূন্যের দাম হয়—নতুবা উহার কোন দাম নাই। এইরূপ অদ্বৈত ভগবান্‌কে পূর্বে না রাখিলে জগতের কোন দামই থাকে না, উহা শূন্য হইয়া যায়।

সেই অদ্বৈত ভগবান্‌ই আমাদের মধ্যে আত্মা রূপে অবস্থিত। "অহমাত্মা গুডাকেশ সর্বভূতাশয়-স্থিতঃ" (গীতা ১০।২০) অর্থাৎ 'হে জিতনিদ্র অর্জুন! আমি সকলের হৃদিস্থিত আত্মা।' আত্মা ও অহংকার এক বস্তু নহে। আত্মা সকলের মধ্যে এক- যেমন বহু ঘটস্থিত আকাশ এক। সেই শুদ্ধ আত্মাই যখন নির্দিষ্ট দেহ, মন, বুদ্ধিতে অভিমানী হন, তখন অহংকারের উৎপত্তি হয়। এই অহংকার ভেদের বা বহুত্বের বীজ। অহংকার ত্যাগপূর্বক আত্মনিষ্ঠ বা ঈশ্বরনিষ্ঠ হওয়া একই কথা—উহাই জীবের সর্বদুঃখনিবৃত্তির ও পরমানন্দ-প্রাপ্তির কারণ।

জাতিগঠনে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা

ডক্টর প্রাণরঞ্জন সেনগুপ্ত

ভারতীয় মহান জীবনাদর্শ ত্যাগ, অনাসক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার কথা যুগে যুগে প্রচার করেছে। সেই আদর্শ জনজীবনে গৃহীত হয়ে জীবনকে মহিমামণ্ডিত করেছে। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি যা উপনিষদ এবং বেদ-বেদান্তকে আশ্রয় করে প্রসার লাভ করেছে তা আজ লুপ্ত হতে চলেছে। কিন্তু কালজয়ী চিন্তা এবং শিক্ষা কখনও লুপ্ত হয় না। তবে কি বেদ-উপনিষদাশ্রয়ী আদর্শ এবং শিক্ষা কালজয়ী নয়? অবশ্যই কালজয়ী। একথা ভারতীয় সমাজ-জীবনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। আমরা ইতিহাসের খুব বেশী পিছনে যাব না। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতভূমি এক সংকটের মুখে এসে দাঁড়াল—কারণ ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতাকে উপেক্ষা করে বিদেশী সভ্যতার অন্ধ, চপল অনুকরণ আনল জাতির জীবনে এক দুর্যোগ। ভেঙ্গে যেতে লাগল মহান ভারতীয় জীবনাদর্শ। ঠিক এই সংকটের দিনে দেখা দিলেন পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর নিষ্পাপ নির্মল ভগবৎ-প্রেমে বিভোর জীবন হাজার হাজার মানুষকে প্রভাবান্বিত করল। ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা ও দর্শনভিত্তিক বিশ্বজনীন মানবতা অন্ধকারে দিল আলোর সন্ধান।

মহান গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল সেন্টপলের মত একজন শিষ্যের। নরেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে খুঁজে পেলেন তিনি সেই ব্যক্তি-প্রতিভা। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঐশ্বরিক স্পর্শে নরেন্দ্রনাথ দত্তের রূপান্তর ঘটল—তিনি হলেন বিবেকানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষের সংকটের দিনে তাঁর বাণী, রচনা এবং প্রচারকর্ম জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করল, পতনোন্মুখ সমাজ-জীবনকে দিল আদর্শের সন্ধান, আলোকের সন্ধান। ভারতবর্ষ ফিরে পেল তার বেদ-উপনিষদাশ্রয়ী জীবনাদর্শ- আধ্যাত্মিক, সামাজিক, ও রাজনৈতিক আন্দোলনে এলো নতুন জোয়ার। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর আরও অনেক দেশে, বিশেষ করে আমেরিকা এবং ইউরোপে তাঁর বাণী ও রচনা দেখাল জীবনাদর্শের এক নতুন দিগন্ত। ভারতীয় ধর্ম ও জীবনাদর্শ দেশে দেশে বন্দিত হলো, জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পেল।

স্বামীজী যে ভারতের গৌরব, মূর্ত ভারতাত্মা, এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বামীজীর চরিত্র, জীবনী, আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে পুস্তক এবং রচনার অভাব নেই। তাঁর জীবনী লেখা বা তার বর্ণনা এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়, তিনি ভারতীয় জনগণকে যে নির্দেশ তাঁর রচনা ও বক্তৃতামালার মধ্যে দিয়ে গেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করাই এই রচনার উদ্দেশ্য। সাম্প্রতিক কালে দেশ এবং জাতি যখন আদর্শ সন্ধানে দিশেহারা তখন স্বামীজী-নির্দেশিত জীবনাদর্শ খুবই উপযোগী এবং জাতিগঠনে তার প্রয়োজনীয়তা সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

যুবসমাজের ভূমিকা

মহান দেশপ্রেমিক, দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ ভারতকে তার গভীর সুপ্তি হতে জাগিয়ে যে নতুন জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত করে-ছিলেন এবং তদানীন্তন মানবসমাজকে যে আদর্শের বাণী শুনিয়েছিলেন তা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, মানুষকে সহজ

সুন্দর পথে চলার ইঙ্গিত যোগাবে। স্বামীজী সম্পর্কে অনেক কথাই কথিত এবং লিখিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর জীবনী ও বাণী এতই মহৎ ও গভীর এবং জনজীবনে এতই প্রয়োজন, সর্বোপরি জাতিগঠনে এতই সহায়তা করে যে তাঁর সম্পর্কে নতুন কিছু লেখা কোনদিনই শেষ হবে না।

দেশ এবং জাতি আজ নতুন করে সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে; বিশেষ করে যুবক-সমাজ আজ কি করবে, কোন পথে চলবে, কি আদর্শে জীবনকে মহিমামণ্ডিত করবে তার সঠিক নির্দেশ না পেয়ে অত্যন্ত দিশেহারা। যুবসমাজের মধ্যে এক বিরাট হতাশা। অথচ দেশ ও জাতির জীবনে যুবশক্তিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎশক্তি। এই যুবশক্তিকে হতাশা থেকে মুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা অনেক সময় এরকম ধারণার বশবর্তী হই যে ভাল থাকা ভাল খাওয়া এবং স্বচ্ছলতাই মানুষকে হতাশামুক্ত করে। তা কিন্তু মোটেই নয়। মানসিক পরিপূর্ণতাই যুবসমাজকে হতাশামুক্ত করবে আর তার জন্য প্রয়োজন মহৎ আদর্শ। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে খাওয়া-পরা এবং বাসস্থানের ন্যূনতম ব্যবস্থা যদি না থাকে কোন আদর্শই জীবনকে মহত্তর পথে চালিত করতে পারে না। যুবকদের অন্তরে যদি আদর্শের বীজ বপন করা যায় তবে তা বিরাট মহীরূপে রূপান্তরিত হয়। যুবসমাজের মধ্যেই রয়েছে দুর্জয় সাহস, বিপুল শক্তি এবং চরম সার্থকতার ইঙ্গিত। নদীর গতি যেমন সরাসরি কাজে আসে না, কিন্তু বাঁধ বেঁধে সেই গতিশক্তি হতে প্রভূত শক্তি পাওয়া যায় এবং সেই শক্তিকে দেশ এবং জাতির কল্যাণে নিয়োগ করা যায়। ঠিক তেমনি গতিশীল যুবশক্তিকে আদর্শাভিমুখী করলে দেশ বিপুল শক্তির অধিকারী হয়, আর এই শক্তি দেশ এবং জাতির কল্যাণে বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া মানুষ চায় তার শক্তির পূর্ণ বিকাশ। এই পূর্ণ বিকাশের মধ্যেই জীবনের চরম সার্থকতা। আদর্শান্বিত জীবন ক্রমশঃ পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। সেই সঙ্গে দেশ ও জাতিকে এনে দেয় সার্থকতা। আজকের দিনে মহান আদর্শের প্রচার এবং প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সমধিক। এই আদর্শ জাতির জীবন থেকে যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হয় তখনই তা বিশেষভাবে কার্যকরী হয় এবং জাতিকে সফলতার দিকে এগিয়ে নেয়। ভারতের মাটিতে যে সব নেতার জন্ম এবং যাঁরা দেশ এবং জাতিকে অন্তরের সমস্ত প্রেম এবং ভক্তি দিয়ে উন্নত করার চেষ্টা করেছেন তাঁদের কথা ভুলবার নয়। স্বামী বিবেকানন্দ এমনি একজন মহাপুরুষ। তিনি তাঁর রচনার মধ্যে যে চিন্তাধারা দিয়ে গেছেন তা আজকের দিনে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। তাঁর এই কালজয়ী চিন্তা কখনও জীর্ণ-পুরাতন বলে জাতির জীবন থেকে বিদায় নেবে না। অধিকন্তু আজকের দিনে এর প্রচার এবং প্রসার বিশেষভাবে প্রয়োজন। যারা নবীন, যাদের মনে নতুন উদ্দীপনা, নতুন উৎসাহ তারা যদি আদর্শ-ভ্রষ্ট হয়ে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে, তবে জাতি এক ভয়াবহ সংকটের সামনে এসে দাঁড়াবে।

জাতীয়তা বোধ

পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্ত হয়ে ভারত আজ স্বাধীন। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের পর ছাব্বিশটি বছর কেটে গেল, তবু আমাদের ভেতর এখনও জাতীয়তাবোধ জাগেনি। বহুধা বিভক্ত এই বিশাল দেশের মধ্যে জাতি-চেতনা আনা কঠিন, স্বীকার করি। তবে স্বামীজী তারও পথ-নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যুবসমাজকেই আজ স্বামীজীর বাণী ও রচনা বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করতে হবে যদি জাতীয়তাবোধ

আনতে হয়। ৭৫ বছর আগে স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

'আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

'আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে'।[১]

ত্রিকালদর্শী স্বামীজীর দৃষ্টি অভ্রান্ত। সব বিবাদ-বিশৃঙ্খলা নিশ্চয়ই দূরে যাবে। যেখানে জাতির প্রশ্ন সেখানে আমরা হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রীষ্টান নই—আমরা ভারতীয় এ-বোধ নিশ্চয়ই আসবে। আমাদের প্রয়োজন শুধু স্বামীজীর নির্দেশিত পথে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হওয়া।

১ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৮।৩৯

অনন্যশরণ

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

মাস্তলে বসিল পাখী হয়ে অন্যমনা
কখন জাহাজখানা ছাড়িয়া মোহনা
ভেসে এল কূলহীন সমুদ্রের বুকে
হয়নি খেয়াল তার। সেথা মহাসুখে
নাচিতেছে লক্ষকোটি তরঙ্গের দল।
দিন অবসান, সূর্য নামে অস্তাচল।
সম্বিত ফিরিলে পাখী উড়িল গগনে
ডানা মেলে চলিল সে কূল অন্বেষণে।
কোথা কূল ? নাই নাই কোথাও আশ্রয়
উড়ে উড়ে ডানা দু'টি মিছে ক্লান্ত হয়।
শ্রান্ত হয়ে ফিরে আসে যেথা হতে তার
হয়েছিল সুরু এই সুদীর্ঘ যাত্রার।
আর নহে ? এইবার তাঁর কৃপা লাগি
অনাদি অনন্তকাল রহিবে সে জাগি।

এন্‌কেফালাইটিস্‌ ও জাপানী এন্‌কেফালাইটিস্‌

ডক্টর জলধি কুমার সরকার

১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের অন্যত্র বিভিন্ন সংবাদপত্র-পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলে মশকদংশনের দ্বারা "জাপানী এন্‌কেফালাইটিস্‌ (Japanese encephalitis)" নামক একটি নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে নানারূপ খবরের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। অসুখটি নতুন বলেই জনসাধারণ বেশী উদ্বিগ্ন। নতুনের প্রতি আমাদের আকর্ষণও যেমন অধিক, নতুন অসুখকে আমরা ভয় পাইও তেমনি বেশী। ১৯৭৩ সালে বসন্ত রোগের আক্রমণে পশ্চিমবঙ্গে এই রোগের তুলনায় পনের গুণেরও অধিক লোক প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু সে ব্যাপারে জনসাধারণ তত আতঙ্কিত হয় নাই, বা খবরের কাগজগুলিও ব্যাপারটিকে সেরূপ প্রাধান্য দেয় নাই, কারণ বসন্ত রোগের সঙ্গে আমরা বহুবৎসর 'ঘর' করছি এবং রোগটি আমাদের কাছে নতুন আগন্তুক নয়।

'এন্‌সেফালন' বা 'এন্‌কেফালন' (encephalon) মানে মস্তিষ্ক (brain) এবং 'আইটিস' (—itis) মানে প্রদাহ (inflammation), অর্থাৎ এন্‌কেফালাইটিস্‌ বলতে মস্তিষ্কের প্রদাহ বোঝায়। সকলেই জানেন যে মস্তিষ্ক আমাদের শারীরিক ও মানসিক সকল ক্রিয়াকলাপকে পরিচালনা করে। কাজে কাজেই মস্তিষ্কের অসুখ হলে শারীরিক সব কাজকর্মই ব্যাহত হয়। অতিপ্রয়োজনীয় শারীরিক যন্ত্রগুলির (যেমন হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস, লিভার) কার্য ব্যাহত হলে মৃত্যু ঘটে।

এন্‌কেফালাইটিস্‌ রোগ অনেক কারণে হয়। জীবাণু (bacteria) তাদের মধ্যে অন্যতম, যেমন আমরা কোন কোন টাইফয়েড রোগীতে পাই। এ্যালার্জি (allergy) হতেও এই রোগ হতে পারে। কিন্তু বেশীর ভাগ এন্‌কেফালাইটিস্‌-এর কারণ ভাইরাস্‌ (virus) বা জীবপরমাণু, এবং জাপানী এন্‌কেফালাইটিস্‌-এর কারণও এক রকমের ভাইরাস্‌। অন্যান্য ভাইরাস্‌জনিত এন্‌কেফালাইটিস্‌-এর মধ্যে পড়ে—পলিও-মায়েলাইটিস্‌ (poliomyelitis) যাতে জ্বরের পরে রোগীর কোন অঙ্গে পক্ষাঘাত হয়; জলাতঙ্ক রোগ (rabies); হাম; মামপ স (mumps) এবং পানবসন্তঘটিত এন্‌কেফালাইটিস্‌। অনেক ভাইরাস্‌ সাধারণতঃ গরু ঘোড়ার এন্‌কেফালাইটিস্‌ করে, কিন্তু সময়ে সময়ে মানুষের মধ্যেও ওই রোগের সৃষ্টি করে।

এই রোগের সূচনায় জ্বর, মাথাধরা ইত্যাদি হয়। সেই অবস্থায় অন্যপ্রকার সাধারণ জ্বর হতে এটিকে পৃথক করা দুরূহ। ক্রমে জ্বর বাড়তে থাকে এবং দুই তিনদিনের মধ্যে মানসিক বিকার দেখা দেয়, পরে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। শরীরাংশের কম্পনও হতে পারে। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ শতাংশ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর হার আরও বেশী। এই রোগের সুনিশ্চিত ঔষধ না থাকায় চিকিৎসককে অনেক সময় অসহায়ভাবে কেবলমাত্র রোগের লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হয়। যে সব রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে, তাদের মানসিক বৈকল্য ঠিক হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে।

ভাইরাস্‌ বহু প্রকারের আছে। তাদের মধ্যে একটি বৃহৎ সংখ্যা নানারূপ কীট-পতঙ্গাদিদ্বারা মানুষের দেহে সংক্রামিত হয় এবং এদেরকে

আর্বোভাইরাস্‌ (arbovirus or arthropod-borne virus) বলা হয়। বাঙ্গালায় এদেরকে কীটবাহিত ভাইরাস্‌ বলা যেতে পারে। পীত-রোগের (yellow fever), ডেঙ্গু জ্বরের এবং এন্‌কেফালাইটিসের বেশীর ভাগ ভাইরাস্‌গুলি এই শ্রেণীতে পড়ে, কারণ ওই সব ভাইরাস্‌ মশকদংশন দ্বারা মানুষের শরীরে ঢোকে। মশা ছাড়া নানারূপ জন্তুকীট—যেমন টিক (tick , মাইট (mite), স্যাণ্ডফ্লাই (sandfly) প্রভৃতিও কোন কোন কীটবাহিত ভাইরাস্‌ ছড়ায়। জাপানী এন্‌কেফালাইটিস্‌-এর ভাইরাস্‌ মশার দ্বারা বিস্তার লাভ করে। কীটবাহিত ভাইরাস্‌গুলির জীবন-কাহিনী অতি বিচিত্র। এই সব ভাইরাস্‌ দ্বারা প্রধানতঃ নানারকমের বন্য জন্তু যেমন ইঁদুর, ছুঁচো, বানর, নানারকমের পক্ষী, গৃহপালিত পশু যেমন গরু মহিষ শূকর—এরা আক্রান্ত হয়। এদের দেহে ভাইরাস্‌গুলির বংশবৃদ্ধি হয়, এবং তাদের রক্ত পান করে মশা প্রভৃতি কীটেরা ভাইরাস্‌ পায়। কয়েকদিনের মধ্যে ভাইরাস্‌গুলি কীটের শরীরে সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে—মুখের কাছে আসে দংশনের মাধ্যমে আবার অন্য জন্তুর মধ্যে ঢোকবার জন্য। মশা বা অন্য কীট→বন্যজন্তু বা পক্ষী→মশা বা অন্য কীট, এই বিবর্তন চলতে থাকে বনে জঙ্গলে, আমাদের অজান্তে। ঘটনাচক্রে মানুষ যদি এই বিবর্তনের মধ্যে পড়ে যায় তা হলেই ভাইরাস্‌ জর্জরিত মশক বা কীটের দংশনের দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয়। বন্যজন্তুগুলি বা পক্ষী বিশেষ অসুস্থ হয় না অনেক সময়, কিন্তু মানুষের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগের সূচনা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মানুষকে বাদ দিয়েই কীটবাহিত ভাইরাস্‌গুলি তাদের বংশধারা বজায় রাখতে পারে। মানুষের রোগসৃষ্টি যেন তাদের অনিচ্ছাকৃত, অনেক ক্ষেত্রে তাদের বংশরক্ষার দিক হতে ক্ষতিকরও। কারণ মানুষের দেহ হতে অনেক সময় উপযুক্ত কীট বা মশক ভাইরাস্‌ পেতে সক্ষম হয় না।

যাই হোক, আমরা জাপানী এন্‌কেফালাই-টিস্‌ সংক্ষেপে জে. ই (J E.) ভাইরাসে ফিরে আসি। প্রায় ৪০ বৎসর আগে জাপানে এন্‌কেফা-লাইটিস্‌ রোগের কারণ হিসাবে এই ভাইরাস্‌টি প্রথমে ধরা পড়ে এবং সেই হতেই ওর এইরকম নামকরণ হয়। এই ভাইরাস্‌ যদিও পরে চীন, কোরিয়া, রাশিয়া, মালয়াশিয়া প্রভৃতি দেশে এন্‌কেফালাইটিস রোগের মড়ক সৃষ্টি করেছে, কিন্তু নামটি তার 'জাপানী'ই রয়ে গেছে। অবশ্য এই ভাইরাস্‌ সম্বন্ধে বেশীর ভাগ গবেষণা জাপানেই হয়েছে। ওই দেশে একরকমের কিউলেক্স (culex) মশার কামড়ের দ্বারা এই রোগ হয়, এবং মশাগুলি প্রধানতঃ শূকরের রক্ত হতে এই ভাইরাস্‌ পায়। দেখা গিয়াছে, শূকর ছাড়া একরকমের কালো বক (black heron)-এর শরীরে ঢুকে বেশ কয়েক মাইল দূরেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ভারতবর্ষে এই ভাইরাস্‌ প্রথমে ধরা পড়ে ১৯৫৫-৫৬ সালে, যখন দক্ষিণ ভারতে তিনটি এন্‌-কেফালাইটিস্‌ রোগীর মস্তিষ্ক হতে এই ভাইরাস্‌ পাওয়া গিয়েছিল। তারপরে সেখানে কিউলেক্স মশা হতেও কয়েকবার ভাইরাস্‌ পাওয়া গেছে। কিন্তু গত ১৫ বছরের মধ্যে মড়ক হিসাবে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যতবার এন্‌কেফালাইটিস্‌ দেখা দিয়েছে, কোনবারই এই ভাইরাস্‌ পাওয়া যায়নি। মড়কের কারণ হিসাবে এই ভাইরাস্‌ ধরা পড়লো এই প্রথম—১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে আসান-সোলের কাছে কয়লাখনি এলাকায়। তারপরেই এই রোগ দেখা গেল—বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায়। মেদিনীপুরও একেবারে বাদ গেল না। লোকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল, কারণ অপ্রত্যাশিত এই বিপদের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। শুধু মৃত

মানুষের মস্তিষ্ক হতেই এই ভাইরাস্ পাওয়া গেল, তা নয়, তিন রকমের মশা হতেও একই ভাইরাস্ আবিষ্কৃত হল। কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনে রোগ নির্ণয় হওয়া মাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার খুব তৎপরতার সঙ্গে এগিয়ে গেলেন রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য; পুনা ও দিল্লি হতেও দুটি সংস্থা নানা তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এসে পড়ল।

এই নতুন অসুখটি যদিও এখন আয়ত্তাধীন, কিন্তু এটি সকলকেই ভাবিয়ে তুলেছে: এই রোগ কি আবার আগামী গরমের মরসুমে লেলিহান অগ্নিশিখার মত ছড়িয়ে পড়বে? অসুখটি নির্মূল করতে আমাদের অনেক তথ্যাদি সংগ্রহের প্রয়োজন। যে যে রকমের মশা হতে এর ভাইরাস্ পাওয়া গেছে, তা ছাড়া অন্য কি কি মশা এই রোগ বিস্তার করে, এবং সেই সব মশা কি ভাবে দেশে নির্মূল করা যায়? কি কি জন্তুর মধ্যে এই ভাইরাস্ বংশ-বৃদ্ধি করে? জাপানে এই ভাইরাসের প্রতিষেধক টীকা খুব ভাল ফল দিয়েছে; এখানেও কি ওই টীকা সেইরকম কার্যকরী হবে? ওই টীকার বীজ সব সময় বরফের মধ্যে রেখে প্রত্যেককে তিনবার ইনজেকসন দিতে হয়; সুদূর গ্রামে এইভাবে টীকার বীজ বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা, এবং লোকে কি তিনবার ইনজেকসন নিতে চাইবে? বহু বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে—ওই টীকার বীজ খরিদ করা অপেক্ষা এই দেশে উহা তৈরি করা উচিত হবে না? সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তর এই সব সমস্যার সমাধানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা,—নানা রোগজর্জরিত আমাদের দেশে এই নতুন অসুখটি কি একটি স্থায়ী আসন করে নিল?

মাতৃসঙ্গীত

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

[ভৈরবী—একতাল]

মা সারদারূপে শ্রীরামকৃষ্ণ অকাতরে জীবে করুণা বিলায়।
মা নাকি রে অবতারের জননী, অবতার তাঁর পায়ে লুটায়॥
নিজেই ঠাকুর শ্রীমাকে কহিলা, তব দেহে হবে মোর মাতৃলীলা
অন্তিমকালে নেব তারে কোলে, যে ল'বে শরণ তব রাঙ্গা পায়॥
কোলে নাও মাগো! কী বলিব আর
দূর কর মোর সব অহঙ্কার
হিয়াতে হেরিয়া শ্রীপদ তোমার
যেন গো এবার জীবন যায়॥

মানসপুত্র

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

বাহিরে ব্যক্ত সত্য পরমসত্যের ছায়ামাত্র। ব্যক্ত জীবনের পশ্চাতে থাকে যে ভাবজগতের সত্য-ব্যঞ্জনা, যার নাগাল আমাদের স্থূল দৃষ্টি পায় না, তার সাহায্য না নিয়ে যে-জীবনচর্চা তা সর্বাংশে পূর্ণ হবে কেমন করে ? এ-কারণেই কোন মহাজীবনের আলোচনা যখন আমরা করি তখন দৃশ্য স্থূলের ব্যাপারটুকুতে সীমিত থাকলে আমাদের চলে না। অথচ এর ওপরে যাবার ক্ষমতাও তো আমাদের নেই! অগত্যা শরণ নিতে হয় তাঁদেরই প্রজ্ঞালোকিত বাণীর, যাঁদের দৃষ্টি খেলে সত্যের গভীর লোকাতীত রাজ্যে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে তেমনি আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির শরণ নিতে হয়। তাঁরই বাণীর আলোকে আমরা তাঁর মানস-সন্তানকে পাই ব্রজের রাখাল-রূপে—শ্রীকৃষ্ণসখারূপে। তা যদি না পেতাম তবে, ব্যক্তজীবনের ঘটনাবলীতে তাঁর মহিমার অল্প-বিস্তর ইঙ্গিত পেলেও সেই পরম প্রকাশের রসঘন দিকটিই থাকত চির-অজ্ঞাত। ব্রহ্মজ্ঞ তো অনেক আছেন—যখন জানলুম তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সখা বলে, —নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি বলে, তখন সে-জানা যে-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি ক'রল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সমগ্রজীবন-প্রচেষ্টা যে-রূপ নিয়ে আমাদের সামনে প্রকটিত হল তার মূল্যায়ন ক'রব কী দিয়ে ?

এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-পালয়িতার বাল্যলীলায় বড়ই প্রীতি। স্বয়ং তিনি গুণাতীত বালক—বিশ্ব নিয়ে খেলছেন :

খেলিছ এ বিশ্ব ল'য়ে
বিরাট শিশু আনমনে।
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা,
নিরজনে প্রভু, নিরজনে॥[১]

সমরস অখণ্ড জ্যোতির একাংশ ঘনীভূত হয়ে যেদিন এক শিশুমূর্তি ধারণ করেছিল ভূভার হরণ করতে, সেদিন বোধ করি, চিরকালের খেলুড়েদের ডাক দিয়েছিলেন তিনি—'এসো, আমি যাচ্ছি পৃথিবীতে, তোমরাও এসো।' তাই কি গঙ্গার পবিত্র সলিলে প্রস্ফুটিত শতদলে পীতবসন বনমালীর হাত ধরে নেচে উঠল কিশোর!

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যভাব,—জগন্মাতার বালক তিনি। তাঁর সে-বাল্যভাবই যেন মূর্তি নিয়ে অভিন্ন অথচ ভিন্ন আধারে রাখালরাজরূপে গঙ্গার তীর উজ্জ্বল করে আবির্ভূত হল। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন স্বয়ং ভাবস্বরূপ ভাবসাগর, সুতরাং যে কোন ভাবই ইচ্ছামাত্র তাঁতে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হত। তথাপি অভিমানহীন বালক তিনি। এবারের লীলায় যে-কোন লোক তাঁকে দর্শন করেছেন, তিনিই তাঁর অপূর্ব বাল্যভাবের সপ্রেম বর্ণনা করেছেন এবং বিস্মিত হয়েছেন, কেমন করে বয়স্ক একটি লোকের মধ্যে এমন সহজ সরল বাল্যভাব থাকতে পারে।

অনন্তভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রত্যেক পার্ষদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মিশতেন—রাখালরাজের ক্ষেত্রে তা ছিল মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ—যেন নিজ বাল্যভাবের অমিয় মাধুরী দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে। আর তিনি ছিলেন স্বয়ং মা যশোদা।[২] দুইটি দিক : একদিকে মাতৃসাধনায় তিনি স্বয়ং মা ; অন্যদিকে তাঁর চাই সঙ্গী—যিনি হবেন তাঁরই মত[৩]—তাই রামকৃষ্ণের কৃষ্ণাংশের ব্রজ-লীলায় ব্রজের রাখালকে—বাল্যভাবের সচল বিগ্রহকে তাঁর

১ সঙ্গীত সংগ্রহ ৪র্থ সং পৃঃ ৩২৫ ২ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ৩৩ ৩ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ২৪

চাই-ই। এই আনন্দঘন অপরূপ লীলার কী সুন্দর ছবিই না কথামৃতকার অঙ্কিত করেছেন, তাঁর সাবলীল ভাষায় :—

'[পরমহংসদেব] ভাব-চক্ষে রাখালকে দর্শন করিতেছেন। রাখালকে দেখিতে দেখিতে বাৎসল্য-রসে আপ্লুত হইলেন, অঙ্গে পুলক হইতেছে। এই চক্ষে কি যশোদা গোপালকে দেখিতেন?··· দেখিতে দেখিতে আবার ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।'[4]

রাখালকে দেখিতে দেখিতে "ঠাকুর অদ্ভুত ভাবে ভাবিত হইলেন। বুঝি দেখিতে লাগিলেন সাক্ষাৎ নারায়ণ সম্মুখে রাখালরূপে বালকের দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন!···তিনি সেই বালক রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 'গোবিন্দ' নাম করিতে করিতে ভক্তাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে। শরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির!···"[5]

আর একদিন: "রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। রাখালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—আমি অনেকদিন এখানে এসেচি। তুই কবে এলি?"[6]

এ তো পূর্ব-সম্বন্ধের স্মরণ! কৃষ্ণ যে তিনি স্বয়ং—তাই ভাবমুখে আনন্দ-বিস্ফারিত হৃদয়ে ব্যক্ত করছেন স্বরূপ—'আমি অনেকদিন এখানে এসেচি। তুই কবে এলি?'

বালকভাবে রাখাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যে-ভাবে থাকতেন তার বর্ণনা দিয়েছেন লীলা-প্রসঙ্গকার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়: 'তখন তখন রাখালের ভাব এমন ছিল—ঠিক যেন তিন-চারি বছরের ছেলে! আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত, থাকিত, সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তন্যপান করিত।'[7]

'আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যে-ই তাহাকে ঐরূপ দেখিত, সে-ই অবাক্ হইয়া যাইত! আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর-ননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময় কাঁধেও উঠাইয়াছি!—তাহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না!···'[8]

রাখালরাজের বয়স তখন উনিশ। সবল ব্যায়ামপুষ্ট যুবা। তথাপি ভাবাবস্থায় তিন-চার বছরের শিশুর মতন আচরণ করছেন! সে-ব্যাকুলতা তাঁকে এককালে পরিবেশ বয়স অবস্থা সব বিস্মৃত করে দিত। এ সময়ের বর্ণনা 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ'-গ্রন্থে পাই: 'কখনও বিদ্যালয় হইতে, কখনও বা কলিকাতার বাসগৃহ হইতে ব্যাকুলচিত্ত রাখাল দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইতেন। তিনি যে বিবাহিত ও দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন যুবক, তিনি যে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশের সন্তান, শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তি মনে উদিত হইলে তাঁহার ঐ সমুদায় স্মৃতি বিলুপ্ত হইত এবং ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার দিব্য শিশু-সত্তায় মগ্ন হইতেন।··· শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অনন্ত স্নেহ-রূপিণী জননী, অনন্ত পীযূষধারায় তাঁহাকে সিক্ত করিতেছেন। মাতা ও পুত্র—এই সত্তাই যেন একমাত্র সত্য···।'[9]

[ক্রমশঃ]

---

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪।১।৩
৫ ঐ ১।৫।১
৬ ঐ ৩।৫।১
৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, রাজসং, ৫।৫৮
৮ ঐ ৫।৫৯
৯ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৬৩

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচার

স্বামী মুমুক্ষানন্দ

ভক্তদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করিতেন, সে কথা আমরা জানি। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগোষ্ঠী উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্যতম শিষ্যরূপে নিঃসংশয়ে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আবার তাঁহাদের সকলেরই সুনিশ্চিত প্রত্যয় এই যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণই নরেন্দ্রনাথের দেহাবলম্বনে কার্য করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং অনুভব করিতেন তিনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তচালিত যন্ত্র। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাঁহার প্রচারকের জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ 'মদীয় আচার্যদেব' নামে একটি বক্তৃতা ব্যতীত বিরল ক্ষেত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। যিনি তাঁহার জগৎ আলোড়নকারী ভাষণ ও বাণীসমূহের জন্য বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব নিজের বলিয়া দাবী করেন নাই; মুক্তকণ্ঠে যিনি বলিয়াছেন, "যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বাহির হইয়া থাকে যাহা দ্বারা জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই, তাহা 'তাঁহারই' (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের)", তিনি বাহ্যতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার প্রায় করিলেনই না—আপাতদৃষ্টিতে এ বড় আশ্চর্য ঘটনা! স্বামীজীর নিজের উক্তিতে ও রচনায় এ রহস্যের সমাধান নিহিত।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তি-বিচারের যুগ। মানুষ বিচারের মাপকাঠিতে সকল কিছুকে পরিমাপ করিয়া ত্যাজ্য গ্রাহ্য নির্ণয় করে। বেদ, বাইবেল, কোরান বা অমুক মহাপুরুষ এই কথা বলিয়াছেন—অতএব ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ কর—যুক্তিগর্বী মানুষকে আজ একথা বলা চলে না। যুক্তিবাদী মানুষ ব্যক্তিকে নয় তত্ত্বকে, সত্যকে একমাত্র প্রামাণ্যভূমি বলিয়া স্বীকার করে। স্বামী বিবেকানন্দ সংশয়শীল, তর্কপরায়ণ আধুনিক মানুষের এই স্বভাব জানিয়াই যুক্তিতর্কের সাহায্যে সর্বাপেক্ষা নবীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাপ্রণালীর পটভূমিকায় তাহার নিকট সার্বজনীন ধর্মের তত্ত্বগুলি উপস্থাপিত করিয়াছেন। সেই তত্ত্বের উদাহরণস্বরূপ তিনি মহাপুরুষদের বিশেষতঃ অবতার-প্রথিত মহামানবদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তবে এরূপ ক্ষেত্রেও তিনি 'ব্যক্তিবাদ' প্রচার করিতেছেন, পাছে এরূপ ধারণা শ্রোতাদের মধ্যে আসিয়া পড়ে সম্ভবতঃ এই আশংকায় তিনি সচরাচর শ্রীরামকৃষ্ণের নামোল্লেখও করেন নাই। "আমার এমন এক ব্যক্তির চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল যিনি এই তত্ত্বের মূর্ত প্রতীক ছিলেন"—এইরূপ গৌণভাবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নির্দেশমাত্র করিয়াছেন।

জগতের ধর্মেতিহাস আলোচনা করিয়া স্বামীজী দেখিয়াছিলেন—মহাপুরুষগণ জগতে যে মহৎ ভাব দিবার জন্য আসিয়া থাকেন উত্তরকালে তদীয় শিষ্য প্রশিষ্যগণ তাঁহার ভাবধারার উপর জোর না দিয়া মহাপুরুষদের জীবন ও ব্যক্তিত্ব প্রচারের উপর গুরুত্ব দিয়াছেন সমধিক। ফলে সেই সেই মহাপুরুষদের নামে দল খাড়া হইয়া যায় – কিন্তু আসল ভাবধারা ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিমলিন হইয়া পড়ে। যাহাতে বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া তাহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে স্বামীজী সে বিষয়ে প্রথম হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন—তদনুযায়ী নির্দেশও

দিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের কল্যাণের জন্য আসিয়াছিলেন; সুতরাং জগতের মঙ্গলসাধনের জন্য তাঁহার ভাব প্রচারই যেন শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগীদের লক্ষ্য হয়—স্বামীজীর ইহাই নির্দেশ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব ধারণা করা মানুষের পক্ষে দুরূহ—বিরলক্ষেত্র ছাড়া অসাধ্য। মানুষের বুদ্ধি চায় তত্ত্ব কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সে ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া চলে; ব্যক্তিকে সে যত সহজে বুঝে ও ধরে তত্ত্বকে সেভাবে বুঝিতে ও ধরিতে পারে না। তাই সাধারণের কল্যাণের জন্যই তত্ত্বের সাথে সাথে তত্ত্বের জীবন্ত-মূর্তি ব্যক্তিকেও প্রচারের যে বিশেষ আবশ্যকতা আছে তাহা বুঝিয়া স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের এমন জীবনী প্রচার করিতে চাহিয়াছেন যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের ঘটনাগুলি তৎপ্রচারিত ভাবসমূহের নিদর্শনস্বরূপ হইবে। স্বামীজী বলিয়াছেন, "রামকৃষ্ণের নাম প্রচার করবার জন্য জেদ করো না। আগে তাঁর ভাব প্রচার কর—যদিও আমি জানি জগৎ চিরকালই আগে মানুষটিকে মানে—তারপর তার ভাবটিকে লয়।" (বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৩)। অন্যত্র বলিয়াছেন, "সর্বদা মনে রেখো যে পরমহংসদেব জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন—নামের বা মানের জন্য নয়। তিনি যা শেখাতে এসেছিলেন তাই ছড়াও। তাঁর নামের দরকার নেই—তাঁর নাম আপনা হতে হবে।" ঐ (ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৮)

এক সময় এমন একখানি শ্রীরামকৃষ্ণচরিত স্বামীজীর হাতে পৌঁছিয়াছিল যাহাতে অলৌকিক ঘটনাবলীর বাহুল্য ছিল। স্বামীজী ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন, "যদি এরা শ্রীরামকৃষ্ণের একখানা যথার্থ জীবনচরিত লিখতে পারে—তিনি কি জন্য এসেছিলেন, কি শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে লিখতে পারে, তবে লিখুক। নতুবা এই সব আবোল-তাবোল লিখে তাঁর জীবনী ও উপদেশকে যেন বিকৃত না করা হয়।" (ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৩)।

যাহারা সংশয়শীল, যুক্তিতর্কপরায়ণ তাহাদের নিকট আগে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক তত্ত্বপ্রচার—পরে আদর্শচরিত ব্যক্তিকে উপস্থাপন—ইহা স্বামীজীর সাধারণ অনুসৃত নীতি হইলেও ব্যক্তির মাধ্যমে তত্ত্বপ্রচার যে আবশ্যক বিশেষতঃ সরল-স্বভাব জনসাধারণের মধ্যে, স্বামীজী তাহা স্বীকার করিতেন। ইহার প্রমাণ পাই ভক্তপ্রবর শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন কর্তৃক ছন্দোবদ্ধ 'শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার মন্তব্যে। গুরুভ্রাতাদের উদ্দেশে লিখিত একটি পত্রে তিনি পুঁথির ও পুঁথিকার 'শাঁকচুন্নীর (শ্রীঅক্ষয়কুমার সেনের স্বামীজী প্রদত্ত কৌতুক নাম) অজস্র অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। দেশের আপামর-সাধারণে প্রচারের জন্য যে ঐরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন তাহা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণজন্মমহোৎসবে পুঁথির অংশবিশেষ চুম্বক চুম্বক করিয়া যেন পড়িয়া সকলকে শোনান হয়। আর "শাঁকচুন্নী is the future apostle of Bengal"—"শাঁকচুন্নী বাঙলার জনসাধারণের ভাবী বার্তাবহ"—বলিয়া গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। তবে এখানেও দেখি স্বামীজী পুঁথির পরবর্তী খণ্ডে (প্রচার খণ্ডে) সংযোজনের জন্য কতকগুলি সংকেত-সূত্র দিয়া যাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে ভাবপ্রচার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সে ভাবের প্রতি এই জনপ্রিয় সহজবোধ্য পুঁথিখানিও পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক ইহাই ছিল স্বামীজীর অভিপ্রায়। সূত্রাকারে এইরূপ নির্দেশ স্বামীজী অন্যত্রও কোথাও কোথাও রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনবেদ বুঝিবার পক্ষে সূত্রাকারে গ্রথিত এই মন্তব্যগুলি অবশ্যপঠনীয়। [ক্রমশঃ]

সমালোচনা

স্বামিজীর পদপ্রান্তে: স্বামী অব্জজানন্দ প্রণীত, (স্বামী মাধবানন্দজী লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত) পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক-রামকৃষ্ণ মিশন, সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ, পৃষ্ঠা ৩৬৮ (রয়াল সাইজ); মূল্য—দশ টাকা।

'স্বামিজীর পদপ্রান্তে' আবার পড়িলাম স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের এই জীবনীগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ পড়িয়াছিলাম স্বামীজীর শতবর্ষ-পূর্তি উৎসবের ব্যস্ততার মধ্যে; এবার পড়িলাম ধীরে ধীরে প্রতিটি চরিত্রের মাধুর্য আস্বাদন করিয়া। একের পর এক জীবনগুলি প্রকাশিত হইয়াছে কোন গ্যালারিতে রাখা এক একখানি চিত্রের মতো। তবে এ চিত্রগুলি নীরব নয়—মুখর, জীবন্ত। শিষ্য বা সন্তানদের এই জীবনময়তায় বিস্তৃত হইয়াছে স্বামীজীর জীবনের নূতন দিগন্ত। স্বামীজীর পিতৃসুলভ স্নেহকোমল সুরের সহিত বাজিয়া উঠিয়াছে সন্ন্যাসী গুরুর বজ্রগম্ভীর কঠোর সুর। এ এক অপূর্ব ঐকতান!

প্রতিটি জীবন অতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সহিত আলোচিত হইয়াছে। লেখকের উপাদান সংগ্রহের পরিধিও পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃত—পুরাতন পত্র-পত্রিকা চিঠি প্রাচীন সাধুদের স্মৃতি যথাসম্ভব সার্থকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে "প্রতিটি জীবনী গ্রন্থকার কর্তৃক পুনঃসম্পাদিত এবং অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ হইয়াছে"—ফলে এই জীবনী-সংগ্রহখানি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থে পরিণত হইল।

আলোচ্য জীবনগুলির মধ্যে ছোট বড় বিচার সম্ভব নয়, প্রতিটি জীবনই দেখি স্বামীজীর সান্নিধ্যে ধীরে ধীরে সূর্যালোকে পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এবং পুষ্পাঞ্জলিরূপে প্রদত্ত হইয়াছে পরমেশ্বরের পদতলে। গুরুভ্রাতাদের জীবন একই কেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তিত হইতেছে, তাই কিছু কিছু ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই পুনরাবৃত্ত হইয়াছে, লেখকের ঘটনাবিন্যাসের গুণে ঐরূপ পুনরাবৃত্তি প্রতিবারই নূতন ভাবে দেখা দিয়াছে। ব্যাকুলতা বিবেক বৈরাগ্য বিশ্বাস মানবসেবা ও জীবনব্যাপী গুরুসেবার কত যে দৃষ্টান্ত সমগ্র গ্রন্থটিতে ছড়াইয়া আছে, যাহা বিবেকানন্দ-ভাবসাধনার নবাগত সাধক-দিগকে উৎসাহিত করিবে, উদ্দীপিত করিবে। গ্রন্থখানির পাতায় পাতায় আরও ছড়াইয়া আছে অসংখ্য সূক্তি-রত্ন যাহার মালা কণ্ঠে ধারণ করিলে ভক্তহৃদয় আলোকিত হইবে।

ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য **একটি প্রস্তাব:** বহুস্থানে উল্লিখিত 'জনৈক' আর নেপথ্যে না রাখিয়া নামগুলি প্রকাশ করিলে যথার্থ পটভূমিকায় বিষয়বস্তু আরও স্পষ্ট হয়। পরিশেষে বক্তব্য, প্রচ্ছদপটে চারিটি রেখাচিত্র বরানগর মঠ, আলম-বাজার মঠ, নীলাম্বর বাবুর বাগান, ও বেলুড় মঠ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। **—স্বামী নিরাময়ানন্দ**

ব্রতী: নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘের বার্ষিক মুখপত্র (বুলেটিন), ১৯৭৩, প্রকাশস্থান: সঙ্ঘ অফিস, ব্লক 'এ' ফ্ল্যাট নং ২, এণ্টালী গবর্নমেণ্ট হাউসিং এস্টেট, কলিকাতা-১৪। পৃষ্ঠা-৩৫

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘের বয়ঃক্রম ছয় বৎসর পূর্ণ হয়েছে। এ সমাজকল্যাণকর সংস্থার উদ্দেশ্য—কর্মের মাধ্যমে, সেবার মাধ্যমে, বিবেকা-নন্দ-নিবেদিতার অগ্নিগর্ভা বাণীর প্রচারের মাধ্যমে,

ক্রমবর্ধমান শক্তির সঞ্চয়, সঞ্চার ও সম্প্রসারণ নিকটে দূরে, শহরে গ্রামে। নিবেদিতার ভারত-সেবায় আত্মোৎসর্গের আদর্শ আলোকবর্তিকার কাজ করছে। খুবই আশা-ভরসার কথা। মুখপত্রটিতে তেরোটি সুলিখিত লেখা স্থান পেয়েছে। লেখাগুলি সঙ্ঘের আদর্শ প্রচার করছে। পাঠক-পাঠিকারা পড়ে উপকৃত হবেন।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের ১২১তম জন্মতিথি উৎসব

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ঃ ১লা পৌষ, ১৩৮০, ইংরাজী ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩, রবিবার, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবীর ১২১তম জন্ম-তিথি পূজা হোম কীর্তন পাঠ ও আলোচনা-সভার মাধ্যমে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতির পর শ্রীশ্রীমায়ের মঙ্গলারতি হয়। প্রত্যূষে বেদপাঠ ও ভজনের পর বিশেষ পূজা হয়। পূর্বাহ্নে নাট-মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ এবং 'তিন সংঘ', হাতিবাগান কর্তৃক কালীকীর্তন হয়। মধ্যাহ্ন হইতে প্রায় ২৫,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। রবিবার হওয়াতে সমগ্র দিন ভক্তসমাগম অব্যাহত ছিল। বৈকালে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের পৌরোহিত্যে মঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত আলোচনা-সভায় অধ্যাপক ডঃ প্রণব রঞ্জন ঘোষ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন, সাধনা ও বাণীর আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনার ভাবপ্রতিমারূপে সারদাদেবীর জীবনে ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতা ও শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘগঠনে তাঁহার অনুপ্রেরণা এবং অভ্রান্ত নির্দেশের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতৃভাবসাধনার পরিপূর্ণতা যে এই মহিমময়ী দেবীমানবীচরিত্রে দেখা দিয়াছিল তাহা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, জগতের শ্রেষ্ঠ মহামানবেরা লোকলোচনের অন্তরালে কীভাবে মানবকল্যাণব্রত উদ্‌যাপন করেন শ্রীরাম-কৃষ্ণ ও সারদাদেবীর জীবন তাহার অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

আমেরিকাস্থিত বার্কলে বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দ বহির্বিশ্বে বেদান্ত-প্রচারের পট-ভূমিকায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের সহজ সরল বৈশিষ্ট্যটি যে আধুনিক মানবের ধর্মজিজ্ঞাসার পক্ষে বিশেষ আগ্রহজনক সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের বাণী ও জীবনীর কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করেন। জনসংখ্যার বিচারে বেদান্ত-অনুগামীদের সংখ্যা অনেক না হইলেও, বেদান্তের আদর্শ যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ প্রধান চরিত্রনিচয়ের জীবন-ধারার মাধ্যমে নিশ্চিত প্রসার লাভ করিতেছে তাহা স্বভাবসুলভ সরস ভঙ্গিমায় তিনি শ্রোতাদের কাছে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করিয়া তোলেন।

সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃভাবের অনন্য বৈশিষ্ট্যটির প্রতি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার পুণ্য-জীবনকথা স্মরণ মননের দ্বারা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ হইতে উৎসাহিত করেন।

বিপুল লোকসমাগমে পরিপূর্ণ সভাস্থলের ভাবগম্ভীর পরিবেশ সূচনা-ও সমাপ্তি-সঙ্গীতে মাধুর্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার : শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি উৎসব সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গল আরতি ও ভজন এবং পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী-পারায়ণ হয়। নবনির্মিত বাটীর প্রশস্ত সভাগৃহে পূর্বাহ্ণে 'ইচ্ছাময়ী সম্প্রদায়' কর্তৃক কালীকীর্তন, স্বামী অমলানন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ ও আলোচনা, রহড়া বালকাশ্রমের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক ভজন ও লীলাগীতি এবং সন্ধ্যায় নরেন্দ্রপুর ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক লীলাগীতি ও ভজন হয়।

প্রভাতে মঙ্গলারতির সময় হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত অগণিত ভক্তের অবিচ্ছেদ আগমনে উৎসব জমিয়া উঠিয়াছিল। হাতে হাতে ফল মিষ্ট খিচুড়ী প্রসাদ সমগ্র দিন বিতরণ করা হয়। প্রায় ১০,০০০ এরও অধিক ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীমায়ের পদচিহ্ন ও তাঁহার ব্যবহৃত খাটখানি মন্দিরের দরজার সম্মুখে রাখাতে ভক্তদের শ্রীমাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য স্বল্প পরিসর বাটীতে এত অধিক সংখ্যক ভক্ত-সমাগমের মধ্যেও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় ভজন পূজা ধ্যান প্রার্থনার কোন অসুবিধা হয় নাই। জন্মতিথি রবিবার হওয়াতে বিপুল ভক্ত সমাগম হইয়াছিল।

বাগেরহাট : গত ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৩, বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শুভ জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত ভক্তবৃন্দ হাতে হাতে খিচুড়ী প্রসাদ ধারণ করেন। বৈকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত একটি মহিলা-আলোচনাসভায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন বাগেরহাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মিসেস্ আফসিয়সোদ্। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমতী মঞ্জু রায়। শ্রীশ্রীমায়ের পূতজীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন অধ্যাপিকা ছায়া রায়চৌধুরী, শ্রীমতী গীতারাণী সাহা, শ্রীমতী উর্মিলা রাণী পাল, মিসেস্ কামরুন্নাহার, কুমারী সুজাতা রায় চৌধুরী নমিতা হালদার, বিষ্ণুপ্রিয়া সাহা, ও ঝর্ণা বসু। এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী সেনও ভাষণ দেন। সভানেত্রী তাঁহার ভাষণ-শেষে মিশনের পক্ষ হইতে সভায় উপস্থিত বাগেরহাট মহিলা সমাজকল্যাণ সমিতির সম্পাদিকা মিসেস্ হাজেরা মতলেব মহোদয়ার হস্তে তাঁহাদের পরিচালনাধীন অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মোট ষাটটি পশমী গেঞ্জী প্রদান করেন।

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য : নভেম্বর ১৯৭৩-এর শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সেবাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে মোট ৩০,২১,৭০৯৬০ টাকা সেবাকার্যে ব্যয় হইয়াছে। বিতরিত দ্রব্যের মূল্য এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নহে। অক্টোবর ১৯৭৩, মাসে কৃত কার্য নিম্নরূপ :

ঢাকা কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১,০৬৭ এবং বিতরিত হয় গ্লাক্সো ৬৪০ পাউণ্ড, সি. এস এম. শিশুখাদ্য ৭৫০ পা, গুঁড়ো দুধ ৬০০ পা, বিস্কুট ৮২ কেজি, 'আস্ত্রা' ৩৭.৩৫ কেজি, ধুতি ১২০, শাড়ী ৩,৬০৩, লুঙ্গি ১৯২, কম্বল ১,৬৭৫, সোয়েটার ৩,৮৮১, গামছা ২২, মশারি ১৪, শার্ট ৬, জুতা ৪ জোড়া, পুরাণো বস্ত্রাদি ৩,৫৫৮, এবং সাবান ৩৫ খণ্ড।

বাগেরহাট কেন্দ্রে ৯,৪৮৮ রোগী চিকিৎসিত হন এবং বিতরিত হয় : বিস্কুট ৫৮.৫ কেজি, ধুতি ২৪, শাড়ী ৪৬৬, লুঙ্গি ১১, সোয়েটার ১২৪ এবং কম্বল ৩০৭টি।

বরিশাল কেন্দ্রে ৪৫১ জনকে ভেষজ সাহায্য দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা ত্রাণ কার্য : গত নভেম্বর মাসে মেদিনীপুরের ঘাটাল মহাকুমার ২ ও ৬ নং অঞ্চলের ১২,৬২৯ জন গ্রাহকের মধ্যে ১৯৩ কুই. চাউল বিতরিত হয়।

কার্যবিবরণী

পাটনা : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ১৯৭২-৭৩-এর কার্যবিবরণী হইতে জানিতে পারা গেল যে পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এই বৎসর আশ্রমে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব খুব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জুন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমটি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম শাখাকেন্দ্ররূপে গৃহীত হয়। সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে চারদিন-ব্যাপী উৎসব ও সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। ৯ই মার্চ ১৯৭৩, সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম, অন্যান্য দিনের সভায় সভাপতি, বক্তা ও প্রধান অতিথিদের নাম ও পরিচয় দেওয়া হইল: শ্রীএস. সি. মিশ্র, সুবর্ণ জয়ন্তী সমিতির সভাপতি; স্বামী রঙ্গনাথানন্দ; শ্রীকেদারনাথ পাণ্ডে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বিহার; শ্রী আর. ডি. ভাণ্ডারী, রাজ্যপাল, বিহার; শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত, উপাচার্য, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রীদেবেন্দ্র শর্মা, হিন্দী বিভাগের প্রধানাচার্য, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়; এবং সুবর্ণ জয়ন্তী কমিটির সভাপতি শ্রী এন. এল. আণ্টাওয়ালী। স্থানীয় সকল শ্রেণীর লোক ঐ উৎসবে দলে দলে যোগদান করিয়া আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে ধর্ম, শিক্ষা ও চিকিৎসার মাধ্যমে নর-নারায়ণ সেবাকার্য সুসমাপ্ত হইয়াছে।

শিক্ষা: ছাত্রাবাসে ১৪টি ছাত্রের মধ্যে ২ জন বিনা খরচে, ৫ জন অর্ধেক খরচে ছিল। ছাত্রদের বহুমূল্য বই কিনিয়া পড়ার অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ছাত্রাবাসের একটি পাঠ্যপুস্তকের পাঠাগার করা হইয়াছে।

স্বামী তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগার ও বিনাশুল্ক পাঠগৃহে বহু সংখ্যক নরনারী ও ছাত্রছাত্রী পুস্তক লইয়া বা পাঠ করিয়া উপকৃত হন। মোট পুস্তক সংখ্যা ১০,১৩২; পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২২; গৃহীত পুস্তকসংখ্যা ১০,০১৯। পাঠগৃহে গড় দৈনিক উপস্থিতির সংখ্যা ৭৮ জন। ইহা ছাড়া একটি শিশু বিভাগও আছে।

চিকিৎসা: 'ভুবনেশ্বর দাতব্য চিকিৎসালয়ে'র অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক বিভাগ দুইটিই অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। মোট চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা অ্যালোপ্যাথিক বিভাগে ৯৯,১৬৫, তন্মধ্যে নূতন রোগী ১২,০০৬ জন ও হোমিওপ্যাথিক বিভাগে ৫৬,৮৩০, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৫,৪৩৯ জন।

ধর্ম: প্রাত্যহিক পূজা আরাত্রিক ভজন ও প্রতি একাদশীতে রামনাম সংকীর্তন ভিন্ন আশ্রমের ভিতরে ও বাহিরে ২৮৪টি ধর্মালোচনা সভা হয় এবং প্রতি বারের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও শ্রীদুর্গা, শ্রীকালী ও শ্রীশিবরাত্রি পূজা যোগ্য সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের জন্মতিথি উৎসব পালিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরিত হয়। ধর্মগুরু ও অবতারপুরুষগণের জন্মদিনে তাঁহাদের পূজা ও আলোচনা প্রতি-বৎসরের ন্যায় এইবারেও সম্পন্ন হইয়াছে।

গৌহাটি (আসাম): শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৭২-৭৩-এর কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ভক্তগণের গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-পাঠচক্রের অনুরাগী শ্রোতৃবৃন্দের উৎসাহে ও অর্থদানে গৌহাটি শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি স্থাপিত হয়। ১৯৪০ সালে সমিতিটি বর্তমান জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। ৩৪ বৎসর যাবৎ এই সমিতি রামকৃষ্ণ মিশনের আহ্বানে নর-নারায়ণ সেবাকার্যে সাড়া দিয়া আসিয়াছে। ভক্তগণের ঐকান্তিক অভিলাষের

ফলে ১৯৬৮ খৃঃ ৩রা ডিসেম্বরে আশ্রমটি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম শাখাকেন্দ্ররূপে গৃহীত হয়। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে আশ্রমে একটি মন্দির নির্মিত হয়।

১৯৭২-৭৩-এর কর্মধারা পূর্ব পূর্ব বৎসরের অনুরূপ। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা ও আরাত্রিক এবং জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর যথাযোগ্য পূজা হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠান ব্যতীত শ্রীবুদ্ধ-শঙ্কর-যিশু-চৈতন্য প্রমুখ মহান্ অবতারদেরও আবির্ভাবতিথি যথাসাধ্য যোগ্য উপচারে পালিত হয়। প্রতি রবিবার ধর্মালোচনা ও একাদশীতে শ্রীরামনাম সংকীর্তন হইয়া থাকে।

শিক্ষা: একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। তিন বছর যাবৎ গড় ছাত্র ১০০ জন। ছোট একটি ছাত্রাবাসে ২০ জন ছাত্রের মধ্যে ৯ জন বিনা বেতনে ও ১ জন অর্ধবেতনে থাকে। ধর্ম দর্শন নীতি ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের একটি পাঠাগার আছে, স্থানীয় জনসাধারণ তাহাতে খুবই উপকৃত হন।

সেবা: সেবাকার্যে এই আশ্রমের ভক্ত ও কর্মিগণ প্রথমাবধি সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষেও রাজনৈতিক কারণে ও প্রাকৃতিক ঘূর্ণাবর্তে পীড়িত মানবসেবায় তাঁহারা সীমিত সাধ্য লইয়া সেবা করিয়াছেন।

বিবিধ

নূতন কেন্দ্র: গত ১৬ই নভেম্বর ১৯৭৩-এ সেকেন্দ্রাবাদের (হায়দরাবাদ) স্থানীয় ভক্তগণ পরিচালিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠটি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের (বেলুড়ের) অন্যতম শাখাকেন্দ্ররূপে গৃহীত হইয়াছে। মঠের ঠিকানা: মার্কেট স্ট্রীট, সেকেন্দ্রাবাদ-৩ (পিন নং ৫০০-০০৩), অন্ধ্র প্রদেশ।

কিষণপুর (উত্তরপ্রদেশ): কিষণপুরে বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের পাশে 'রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম' নামে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি নূতন শাখাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে গত ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৬৪-তম বার্ষিক সাধারণ-সভার অধিবেশন বৈদিক শান্তি-মন্ত্র পাঠ করিয়া শুরু হয়। বিগত বৎসরের অধিবেশনের বিবৃতি পাঠের পর স্বামী চিদাত্মানন্দ মিশনের গভর্নিং বডির ১৯৭২-৭৩ সালের প্রতিবেদন পাঠ করেন। আলোচ্য বৎসরের হিসাব প্রভৃতি উপস্থাপিত হইবার পর মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী ভূতেশানন্দ, শ্রীযুক্ত কে. পি. সেন ও সভাপতি মহারাজ ভাষণ দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্বামী ভূতেশানন্দ বলেন: রামকৃষ্ণ মিশন অন্যান্য সমাজ-সেবী প্রতিষ্ঠান হইতে কিছুটা স্বতন্ত্র। মিশনের সেবাকার্য ইত্যাদি নিছক জনসেবা নয়—আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের উপায় হিসাবেই সেবাকার্য, ইত্যাদি করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উদার শিক্ষায় পরমত-অসহিষ্ণুতার স্থান নাই। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মিশনের সেবাকার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। শিবজ্ঞানে জীবসেবাই স্বামীজীর শিক্ষা। তদুপরি চাই কর্মনিষ্ঠা। কাজের পরিমাণ বড় কথা নয়, কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাজ করা হইল, তাহাই দেখা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাজ করা, ত্যাগ-স্বীকারের জন্য মানসিক প্রস্তুতি ও ঠাকুর ও স্বামীজীর প্রতি আনুগত্য—এই তিনটি আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত কে. পি. সেন বলেন: বর্তমান

সমাজ, বিশেষতঃ রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত যুব-সমাজের অবস্থা দেখিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন—দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ঠাকুর স্বামীজীর শিক্ষার কোন উপযোগিতা আছে কিনা। আমার পরিচিত এক ব্যক্তির মতে—মিশনের সাধুদের পার্কে-ময়দানে সভা-সমিতি করিয়া ঠাকুর স্বামীজীর বাণী প্রচার করা দরকার—যেমন, রাজনৈতিক দলগুলি করিয়া থাকে, কারণ এইভাবে ঠাকুর স্বামীজীর ভাবপ্রচার করিয়াই স্বার্থ-প্রণোদিত ব্যক্তিরা মিশনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে যে অপপ্রচার করেন তাহার প্রতিবাদ করা সম্ভব। আমি কিন্তু উক্ত মতের সমর্থন করিনা; কারণ রাজনৈতিক দলগুলির ন্যায় মিশনের সাধুরাও ঐ ধারায় কাজ করিবেন ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। বরং আমরা—গৃহস্থ সভ্যেরা—যুব-সমাজের নিকট স্বামীজীর গঠনমূলক শিক্ষা ও যুগোপযোগী বাণী পুস্তকাদি, পাঠচক্র ইত্যাদির মাধ্যমে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি। ইহাতে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। এই প্রচেষ্টায় মিশনের প্রতিটি গৃহস্থ সভ্যের পরিপূর্ণ সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন।

সভাপতি পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বলেন:

স্বামী বিবেকানন্দের মূল্যায়ন করিতে গিয়া অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহাকে খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। ফলে তাঁহারা স্বামীজীর পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখিতে পান না। মুখ্যতঃ স্বামীজী ছিলেন ধর্ম-নেতা, তিনি নিছক সমাজ-সংস্কারক, প্রখ্যাত বক্তা, দার্শনিক বা দেশপ্রেমিক ছিলেন না। তিনি তাঁহার দূরদৃষ্টির সাহায্যে ধর্ম তথা আত্যন্তিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া—ভারত ও বহির্বিশ্বের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—ইহাই ছিল স্বামীজীর শিক্ষা। এখন সমাজ-তন্ত্রের কথা খুব শোনা যায়। কিন্তু স্বার্থত্যাগ ভিন্ন সমাজতন্ত্র কখনও আসিতে পারে না। একমাত্র ধর্মই এই স্বার্থত্যাগের যথার্থ প্রেরণা দিতে পারে।

'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—এই কথা সত্য। কিন্তু মানুষের জীবনে উচ্চ আদর্শের প্রয়োজন সর্বাধিক। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী এই জন্যই আমাদের সম্মুখে যুগোপযোগী আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যদি সরকার মিশনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি, হাসপাতাল ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত করেন তবে মিশন কি করিবে?—সেই সম্ভাবনা যদি সত্যও হয়—তবে মিশনের সাধুদের কর্মভার কমিলেও গৃহস্থ সভ্যদের উপর আরও বেশী দায়িত্বভার আসিবেই যেহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত মিশনের গৃহস্থ সভ্যদেরই তখন ঠাকুর স্বামীজীর শিক্ষায় নিজ নিজ জীবন গঠন করিয়া অপরকেও অনুপ্রেরণা যোগাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর নিকট প্রার্থনা—তাঁহারা আমাদের আশীর্বাদ করুন যাহাতে আদর্শের প্রতি আমাদের সকলের নিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়।

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে গিয়া বলেন: মিশনের গভর্নিং বডির প্রতিবেদনে আপনারা যে বিরাট কর্মযজ্ঞের কথা শুনেছেন তাতে আমরা সকলেই গর্বিত। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এই বিরাট কর্মকাণ্ডে আমাদের—অর্থাৎ মিশনের গৃহস্থ সভ্যদের অবদান কতটুকু? মিশনের সাধুরাই এই বিরাট কর্মযজ্ঞ নীরবে সম্পাদন করেছেন। আমার তাই অনুরোধ, যাতে আমরা শুধু তীর্থ-পথের সংবাদ সংগ্রহ করেই যেন আমাদের কর্তব্য সাঙ্গ না করি। তীর্থপরিক্রমার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। মিশনের কাজে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

[কার্যবিবরণী পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।]

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা চারিজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগের সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বার্ধক্য-জনিত ব্যাধিতে ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭৩, বৈকাল ৫ঘটিকায় বল্লিরকোটে ৯১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। শ্রীমৎস্বামী নির্মলানন্দ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া তিনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে হরিপাদ আশ্রমে যোগদান করেন ও দীক্ষাগুরুর নিকট হইতেই ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস লাভ করেন। ত্রিকুভেল্লা আশ্রমের অধ্যক্ষ হিসাবে দীর্ঘকাল সঙ্ঘ-সেবা ব্যতীত তিনি বার বৎসরেরও অধিককাল 'প্রবুদ্ধ কেরালমে'র সম্পাদক ছিলেন এবং 'নারদভক্তি-সূত্রে'র একটি টীকা ও মালয়লাম ভাষায় স্বামীজীর 'ভক্তিযোগে'র অনুবাদ করেন। তিনি স্বভাবতঃ কঠোরী ও কর্মোৎসাহী এবং কেরল প্রদেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা প্রচারকদের অন্যতম ছিলেন।

স্বামী সাম্যানন্দ বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৭৩, বেলা ১২-৪০ মিঃ-এ কনখল সেবাশ্রমে ৭৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের মহারাজের নিকট মন্ত্র-ও সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হবিগঞ্জ আশ্রমে যোগদান করেন এবং ঐ কেন্দ্রে দীর্ঘকাল সেবাকার্যে নিরত থাকেন। জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি কনখল সেবাশ্রমেই অতিবাহিত করেন। তাঁহার মধুর স্বভাবের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

স্বামী মহেশ্বরানন্দ ৮৩ বৎসর বয়সে আন্ত্রিক অবরোধ হেতু গত ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩, বৈকাল ৪-১৫ মিঃ-এ বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তিনি শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর কৃপালাভ করিয়াছিলেন এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ে যোগদান করিয়া ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি বাঁকুড়া ও রামহরি-পুর কেন্দ্রদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রায় সমগ্র কর্ম-জীবন বাঁকুড়া-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হিসাবে অতিবাহিত করেন। স্বল্প কিছুকালের জন্য বৃন্দাবন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষও হইয়াছিলেন। তিনি একজন পাশকরা চিকিৎসক ছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অসুখের সময় তাঁহার চিকিৎসা করার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। তাঁহার দেহান্তে আমরা একজন নিরভিমান, শান্ত, ধ্যানপরায়ণ ও সর্বজন-প্রিয় সন্ন্যাসীকে হারাইলাম।

স্বামী তাপসানন্দ ৭৪ বৎসর বয়সে সেবা-প্রতিষ্ঠানে ৩১ ডিসেম্বর, বৈকাল ৩-৫৫ মিঃ-এ বার্ধক্যজনিত নানা ব্যাধিতে দেহত্যাগ করেন। তিনি শ্রীশ্রীসারদাদেবীর কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সংঘের ঢাকা কেন্দ্রে যোগদান করেন ও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সোনারগাঁ, বালিয়াটি প্রভৃতি কেন্দ্রে কর্মজীবন অতিবাহিত করিয়া শেষ কয় বৎসর তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন। সরল ও মুক্ত-হৃদয় তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

দোমড়া, ত্রিলোকচন্দ্রপুর : শ্রীশ্রীমাতাঠাকুররাণীর ১২১তম জন্মতিথি পূজা ও উৎসব যথাযোগ্য সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি, পূর্বাহ্নে প্রভাত ফেরী, ও বিশেষ পূজা হোম, দুপুরে নরনারায়ণ সেবা, বিকাল ৩.৩০ মিঃ ধর্মসভা ও সন্ধ্যায় আরত্রিক পর ভজন-গান হয়। প্রায় ২,২৫০ জন বসিয়া প্রসাদ ধারণ করেন। উৎসব বিভিন্ন বাদ্য ও সঙ্গীতালাপে মুখরিত ছিল।

নিত্যানন্দপুর : (হুগলী জেলা) বিবেকানন্দ সংঘের ব্যবস্থাপনায় নিত্যানন্দপুর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীসারদামাতার জন্মোৎসব পালিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে সকাল ৮টায় শ্রীশ্রীসারদামাতার বিশেষ পূজা ও হোম এবং দুপুরে শ্রীশ্রীমায়ের কথাপাঠ ও ভক্তিসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। বেলা ২ ঘটিকায় এক আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা-সভায় সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন দক্ষিণেশ্বর সারদামঠের সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা।

সুরবিতান : গত ১৬ই ডিসেম্বর খিদিরপুরে ৮৩, মনসাতলা লেনে, শ্রীশ্রীসারদামাতার শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে "সুরবিতান" 'সারদা-প্রণাম'-শীর্ষক এক ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে বহু ভক্তের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীসারদামাতার জীবনীপাঠ, গীতাপাঠ ও নামগান হয়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু শ্রীশ্রীমায়ের অখণ্ড মাতৃত্বমহিমা বিষয়ে ভাষণ দেন।

পরলোকে অমূল্য কৃষ্ণ সেন

গভীর দুঃখের সংবাদ এই যে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অমূল্য কৃষ্ণ সেন ১৩ই নভেম্বর ১৯৭৩, ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দ সোসাইটিতে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর সান্নিধ্যে আসেন ও তদবধি স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের সঙ্গ করিতেন এবং তাঁহাদের ভজন শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। স্বামী সারদানন্দের উপদেশে তিনি নিয়মিত রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতেন। কর্মজীবনে তিনি পি. এম. জির ব্যক্তিগত করণিক ছিলেন।

পরলোকে বিধুভূষণ সরকার

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে শ্রীবিধুভূষণ সরকার ৭৪ বৎসর বয়সে বহুমূত্র ও অন্যান্য ব্যাধিতে গত ১৫ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, বৈকাল ৪.৩৫ মিনিটে দক্ষিণেশ্বরে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নাম করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ঢাকা জিলার খাগাইল গ্রাম নিবাসী শ্রীবিধুভূষণ পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

কর্মজীবনে ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জিলা স্কুল পরিদর্শক ছিলেন। পরে সহকারী এডুকেশন্ অফিসার হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করার পরে দীর্ঘ ১৩ বৎসর বিভিন্ন উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া সুনাম অর্জন করেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

[পুনর্মুদ্রণ]

পূর্বানুবৃত্তিঃ আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত)

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস থাকা প্রযুক্ত প্রাচীন শাস্ত্রীয় ব্যবহারের প্রতি মিথ্যা বলিয়া যাহারা উপহাস করিত, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন যে, "ইদানীমিব নান্যদাপি সার্ব্বভৌমঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তীতি ব্রূয়াৎ। ...ইদানীমিব চ কালান্তরেঽপি অব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ প্রতিজানীত। শারীরক সূত্রভাষ্য ১।৩।৩৩

(অর্থ)

(একালে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা কোন কালে ছিল না একথা যে বলিয়া থাকে) সে বলিতে পারে যে, কোন কালে ভারতে চক্রবর্ত্তী নরপতি ছিল না, কারণ এক্ষণে চক্রবর্ত্তী নরপতি এদেশে নাই। সে আরও বলিতে পারে যে, ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কোন দিন অব্যবস্থিত* ভাবে প্রচারিত হয় নাই, কারণ, এক্ষণে ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অব্যবস্থিত*রূপে প্রচার পরিলক্ষিত হয় না।

আচার্য্য শঙ্করের এই কয়টী কথার পর্য্যালোচনায় বেশ বুঝা যায় যে, যে সময়ে আচার্য্য শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে ভারতে একচ্ছত্রী নরপতি কেহই ছিলেন না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের একমাত্র উপায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সে সময়ে ভারতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। নূতন নূতন তার্কিকের বাগ্‌জালের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় দিন কয়েকের জন্য আধিপত্য লাভ করিতে গিয়া উদয়োন্মুখ জাতীয় সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

অধিকারীর অবস্থানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্মও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। ইহা লোকে সচরাচর সকলেই স্বীকার করেন। পথের কাঙ্গালকে ধরিয়া রাজসিংহাসনে বসাইলে সিংহাসন পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্মের যে অনেক ক্রটি ঘটিবে তাহা নিশ্চিত। একজন কুড়িটাকা বেতনের কেরাণীর স্কন্ধে হঠাৎ গভর্ণমেন্টের বড় সেক্রেটারীর কার্য্যভার চাপাইলে যে সে কার্য্য অচল হইবে, তাহা কে না স্বীকার করিবে? বাহিরের জগতে অধিকারিভেদে কার্য্যের বৈলক্ষণ্য যেমন অপরিহার্য্য, সেই প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতিফলের একমাত্র উর্ব্বরক্ষেত্র ধর্ম্মজগতেও অধিকার-ভেদে ধর্ম্মকর্ম্মের বৈলক্ষণ্যও অপরিহার্য্য। দরিদ্রের দুঃখ মোচন করা যে একটী সর্ব্বসম্মত ধর্ম্মকার্য্য তাহা কে না বলে? কিন্তু এই দরিদ্রের দুঃখমোচনরূপ মহাধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আন্তরিক ইচ্ছা থাকিতে বল দেখি কয়টা লোক ঐ ধর্ম্মকার্য্য করিতে সক্ষম হয়? ধন বা বল না থাকিলে দরিদ্রের দুঃখ দূর করা যায় না। ধন বা বল যে সকলেরই থাকিবে, তাহা সম্ভবপর নহে। (ক্রমশঃ)

---

* ব্যবস্থিত—বর্তমান সম্পাদক

সংকীর্ত্তন।

কলিকাতা আনন্দ ধাম।
("প্লেগ") বন্ধু হয়ে এসেছে হে ছড়াছড়ি হরিনাম॥
কাঁপিয়ে ভুবন গগনভেদী রোল,
হুহুঙ্কারে উথ্‌লে উঠে হরি হরি বোল,
মত্ত হয়ে নৃত্য সদা গর্জ্জে শত খোল,—
ঝঙ্কারে করতালি ঝঞ্ঝা সম অবিরাম॥
মরণ তো হবে, এড়ায় কে কবে,
চার যুগে কে মরে এমন নামের উৎসবে ?
হরিবোল বোল হরিবোল হরি হরি—ধুলোট হয় ভবে,
ওরে ভয় কি তবে গভীর রবে—
নাম গেয়ে আয় পুরাই কাম॥
যে নামে হয়রে মৃত্যুঞ্জয়,
তত্ত্ব জেনে মত্ত হয়ে গায়রে মৃত্যুঞ্জয়,
যে অভয় নামে নাইবে - যমের ভয়,—
নামের সনে হৃদ্‌মাঝারে নাচে নব ঘন শ্যাম॥
"প্লেগ" থাক্‌বি যদি থাক্,
শমনদমন নামে শমন হয়েছে অবাক্,
হরিনাম প্রাণ ভরে শোন এই কথাটী রাখ,—
নাম শুনে প্রাণ ত্যজ্‌বে যে জন কিন্‌বে হরি গুনধাম॥

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

আমরা নিম্নে স্বামী অভেদানন্দের প্রেরিত আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের বিজ্ঞাপনের ভাবানুবাদ দিলাম। ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, আমেরিকায় বেদান্ত কি ভাবে প্রচারিত হইতেছে।

বেদান্ত-দর্শন,—ভারতাগত স্বামী বা আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক আমেরিকায় আনীত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্তের শব্দার্থ—সমুদয় জ্ঞানের পর্য্যাপ্তি।

বেদান্তের উদ্দেশ্য কোন নবসম্প্রদায় গঠন বা এক ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরে আনয়ন নহে; জগতের সকল ধর্ম্ম যে সকল আধ্যাত্মিকসত্যের উপর স্থাপিত, তাহাই যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা; বিভিন্ন দেশের ধর্ম্মাচার্য্যগণ যে সকল সত্য শিখাইয়াছেন ও নিজ জীবনের দ্বারা দেখাইয়াছেন, তাহার প্রচার ও ঐ সত্যসমূহ দ্বারা মানুষের যাহাতে সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচনে সাহায্য করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা।

বেদান্ত খ্রীষ্টপ্রচারিত সত্য সমূহই শিক্ষা দিতেছেন, ও অনন্তকালের অন্ধকার ঘুচাইয়া আলোক আনয়নে ও যীশুর উপদেশ সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশে নিযুক্ত। ইহা কো

ব্যক্তিবিশেষের প্রচারিত নহে। কোন বিশেষ গ্রন্থের উপরও উহা নির্ভর করে না, উহা জগতের সকল শাস্ত্রকেই আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করে। অপর ধর্ম্মে সহানুভূতি ও ভ্রাতৃভাবেরও উপরে যাইয়া উহা সকল জীবাত্মা ও প্রকৃতির মধ্যেও পরমাত্মার সত্তা দর্শন করায়। উহা খ্রীষ্টের 'আমি ও আমার পিতা এক'—এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য জীবনে উপলব্ধি করিতে শিখায়। আধুনিক বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত সমূহের সহিত উহা একমত। সাধারণ-লোক-ব্যাপ্ত কুসংস্কারের অশুভ ফল দেখাইয়া উহা মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পথ প্রদর্শন করে।

—*—

অভেদানন্দ স্বামী বিগত মার্চ্চ মাসে আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন,—

'কার্য কিরূপে করা উচিত,' 'বেদান্তের ঈশ্বর-ধারণা', 'প্রার্থনার আবশ্যকতা,' 'প্রাণায়াম ও ধ্যান,' 'ক্রমোন্নতিবাদ ও পুনর্জ্জন্মবাদ,' 'পূর্ণতা কি ?' 'আত্মসংযম ও একাগ্রতা,' 'ভগবৎপ্রেম,' 'আধুনিক চিন্তার উপর বেদান্তের প্রভাব'।

—*—

আমাদের পাঠকগণ আমেরিকার বিখ্যাত পণ্ডিত লিউইস, জি, জেনস, (Lewes. G. Janes.) এর নাম বিলক্ষণ অবগত আছেন। আমরা সপ্তম সংখ্যায় মাইণ্ড পত্রিকায় ইঁহারই লিখিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন নামক প্রবন্ধের ভাবানুবাদ দিয়াছিলাম। ইঁহাদের ন্যায় উদার ও হৃদয় পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারাই পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্য আলোকের প্রভা ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতেছে। গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকার কেম্ব্রিজ সহরে যে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, সেই বক্তৃতা কয়েকটির নাম হইতেই আমরা ইঁহার উদার ভাবের আভাস পাইতেছি। এই বক্তৃতাটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় নিয়মিতরূপে মুদ্রিত হইতেছে।

(১) জ্ঞানের স্বরূপ ও বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি।
(২) আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত ঈশ্বর ধারণা।
(৩) বিজ্ঞান ও মনুষ্য-জীবন-রহস্য।
(৪) নীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও প্রমাণ।
(৫) বিজ্ঞান স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণে কিরূপে সহায়তা করে ?
(৬) বিজ্ঞান, দর্শন ও প্রাকৃতিক নিয়ম।

—*—

স্বামী অভয়ানন্দ ঢাকানিবাসিগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সম্প্রতি তথায় গমন করিয়াছেন। অনেকে ষ্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ গমন করেন। ৭ই এপ্রেল নর্থব্রুক হলে রামকৃষ্ণমিশন শাখা সভা হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়—অসংখ্য গণ্য মান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এত লোকের একত্র সমাবেশ ঢাকার কোন সভাতে এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। গত ১০ই এপ্রেল জগন্নাথ কলেজগৃহে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

—*—

গত ১লা এপ্রেল স্বামী বিরজানন্দ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন সভায় 'ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ভগবদ্‌গীতা

শাঙ্করভাষ্যের

বঙ্গানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

অন্বয়।

অত্র (কুরুক্ষেত্রে) যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধেঃ (মন্দবুদ্ধেঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য (দুর্য্যোধনস্য) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (হিতং বিধাতুমিচ্ছবঃ) যে এতে সমাগতাঃ (তান্) যোৎস্যমানান্ (যুদ্ধার্থমভ্যুদ্যতান্) অহং অবেক্ষে (পশ্যামি)। ২৩।

অনুবাদ।

রণক্ষেত্রে অল্পবুদ্ধি দুর্যোধনের প্রিয় করিবার জন্য সমাগত ও যুদ্ধ করিতে উদ্যত এই সকল (যোদ্ধাগণকে) আমি বিলোকন করিব। ২৩।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪।
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫।

অন্বয়।

(হে) ভারত! গুড়াকেশেন (জিতনিদ্রেণ অর্জ্জুনেন) এবং (উক্তপ্রকারং) উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং (ভূপালানাম্ অগ্রতঃ) রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা হে পার্থ! এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য ইতি উবাচ। ২৪—২৫।

অনুবাদ।

হে ভরতকুলোদ্ভব (ধৃতরাষ্ট্র!) জিতনিদ্র (অর্জ্জুন) এই প্রকার বলিলে, পরে উভয় সেনার মধ্যস্থলে, ভীষ্ম দ্রোণ ও অন্যান্য নরপতিগণের সম্মুখে (সেই) উত্তম রথ স্থাপন করিয়া হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে কহিলেন যে, হে পার্থ যুদ্ধার্থে সম্মিলিত কুরুগণকে বিলোকন কর। ২৪—২৫।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি। ২৬।

অন্বয়।

তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ (মধ্যে) স্থিতান্ পিতৄন্ পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীন্ শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চ পার্থঃ অপশ্যৎ (আলোকয়ৎ)। ২৬।

অনুবাদ।

অনন্তর সেই উভয় সেনার মধ্যে অর্জ্জুন দেখিলেন, যে তাঁহার পিতৃতুল্য ব্যক্তিগণ পিতামহ আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও সুহৃদগণ অবস্থিত রহিয়াছেন। ২৬।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয় সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ২৭।

অন্বয়।

তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ অবস্থিতান্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ স কৌন্তেয়ঃ বিষীদন্ (উপতাপং কুর্ব্বন্) ইদম্ অব্রবীৎ। ২৭।

অনুবাদ।

সেই সকল বন্ধুগণকে (রণক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ) অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত করুণাবশে অনুতাপ করিতে করিতে অর্জ্জুন ইহা বলিলেন। ২৭।

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥ ২৮।

অন্বয়।

(হে) কৃষ্ণ! যুযুৎসুং (যোদ্ধুমিচ্ছুং) সমুপস্থিতম্ ইমং স্বজনং দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি (অবসন্নানি ভবন্তি) মুখং চ পরিশুষ্যতি (শোষং প্রাপ্নোতি)। ২৮।

অনুবাদ।

অর্জ্জুন কহিলেন। হে কৃষ্ণ! যুদ্ধের ইচ্ছায় উপস্থিত এই সকল আত্মীয়জনকে বিলোকন করিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। ২৮।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্‌চৈব পরিদহ্যতে॥ ২৯।

অন্বয়।

মে শরীরে বেপথুঃ (কম্পঃ) রোমহর্ষশ্চ (রোমাঞ্চঃ) জায়তে (ভবতি) হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে (স্খলতি) ত্বক্ চ পরিদহ্যতে (স্বয়মেব দাহমাপদ্যতে)। ২৯।

অনুবাদ।

আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইয়া পড়িতেছে এবং ত্বক্ দাহ প্রাপ্ত হইতেছে। ২৯।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥ ৩০।

অন্বয়।

হে কেশব! (অহং) অবস্থাতুং ন শক্নোমি. মে মনঃ ভ্রমতীব, বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি। ৩০।

অনুবাদ।

হে কেশব! আমি অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার মন স্থির হইতেছে না, আমি বিপরীত নিমিত্ত সকল দেখিতেছি। ৩০।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১।

অন্বয়।

আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা (বিনাশ্য) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলং) ন অনুপশ্যামি। (হে) কৃষ্ণ বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে (ন প্রার্থয়ে) ন চ রাজ্যং ন চ সুখানি (কাঙ্ক্ষে)। ৩১।

অনুবাদ।

যুদ্ধে স্বজন সকলকে বিনাশ করিয়া আমি কোন মঙ্গল দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ! আমি বিজয়, রাজ্য, কিম্বা সুখের অভিলাষ করি না। ৩১।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥ ৩২-৩৩।

অন্বয়।

হে গোবিন্দ! নঃ (অস্মাকং) রাজ্যেন কিং ভোগৈঃ কিং জীবিতেন বা কিং (ন কিমপি ফলং স্যাৎ) যেষামর্থে নঃ (অস্মাকং) রাজ্যং কাঙ্ক্ষিতং (অভিলষিতং) ভোগাঃ (কাঙ্ক্ষিতাঃ) ধনানি (কাঙ্ক্ষিতানি) তে ইমে যুদ্ধে প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা (ত্যক্তুম্ ইত্যর্থঃ) সমুপস্থিতাঃ। ৩২—৩৩।

অনুবাদ।

হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্য, ভোগ বা জীবনে কি প্রয়োজন? যাহাদের জন্য আমরা রাজ্য ভোগ ও ধনের অভিলাষ করিয়া থাকি তাহারাই (এই রণক্ষেত্রে) ধন ও প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উপস্থিত হইয়াছে। ৩২ ৩৩।

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা॥
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে॥ ৩৪—৩৫।

অন্বয়।

আচার্য্যাঃ (গুরবঃ) পিতরঃ (পিতৃবন্মান্যাঃ) পুত্রাঃ (পুত্রবৎস্নেহপাত্রাণি) পিতমহাঃ (ভীষ্মাদয়ঃ) মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ তথা (অন্যে) সম্বন্ধিনঃ (অত্র উপস্থিতাঃ) হে মধুসূদন ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ (কৃতে) এতান্ ঘ্নতোঽপি (প্রহর্তুমুদ্যতানপি) হন্তুং (মারয়িতুং) ন ইচ্ছামি। নু (ভোঃ) মহীকৃতে (পৃথিবীমাত্রস্য হেতোঃ) কিং (হন্মি অপিতু নৈব ইত্যর্থঃ)। ৩৪—৩৫।

অনুবাদ।

হে মধুসূদন! এই সক আচার্য্য পিতৃসদৃশ পূজ্য পুত্র পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, ও অন্যান্য সম্বন্ধীগণ আমাদিগকে মারিতে উদ্যত হইলেও ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভ করিবার নিমিত্তও আমি ইহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না, কেবল পৃথিবীরাজ্য লাভ করিবার জন্য আমি ইহাদিগকে বিনাশ করিব ইহা কি প্রকারে সম্ভব?। ৩৪—৩৫।

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ॥ ৩৬।

অন্বয়।

(হে) জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রান্ বিনাশ্য) নঃ (অস্মাকং) কা প্রীতিঃ স্যাৎ? (নৈব কাপি প্রীতিঃ স্যাৎ) এতান্ আততায়িনো হত্বা (স্থিতান্) অস্মান্ পাপমেব আশ্রয়েৎ (সমাশ্রয়েৎ)। ৩৬।

অনুবাদ।

হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বিনাশ করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে? (অধিকন্তু) এই সকল (আচার্য্য দ্রোণ প্রভৃতি) আততায়িগণকে বিনাশ করিলে আমরা পাপী হইব। ৩৬।

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ৩৭।

অন্বয়।

তস্মাৎ (প্রাগুক্তাদ্ধেতোঃ) বয়ং সবান্ধবান ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ (যোগ্যাঃ) হে মাধব! স্বজনং হত্বা কথং হি সুখিনঃ স্যাম। ৩৭।

অনুবাদ।

এই কারণে সবান্ধব দুর্যোধন প্রভৃতিকে বিনাশ করিতে আমরা সমর্থ নহি। হে মাধব! স্বজন বিনাশ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব?। ৩৭।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৮।

অন্বয়।

যদ্যপি এতে (ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ) লোভোপহতচেতসঃ (লোভলুপ্তবুদ্ধয়ঃ) কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে পাতকঞ্চ ন পশ্যন্তি। ৩৮।

অনুবাদ।

যদি চ এই সকল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র লোভবশে নষ্টবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষয় নিবন্ধন দোষ ও মিত্রহিংসার পাতক বুঝিতে সমর্থ হইতেছে না। ৩৮।

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥ ৩৯।

অন্বয়।

হে জনার্দ্দন কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপান্নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্? । ৩৯।

অনুবাদ।

হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়ে যে দোষ হয়, তাহা যখন আমরা বিশেষরূপে বুঝিতেছি, তখন আমরা এই পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার যোগ্য জ্ঞান কেন না লাভ করিব? ৩৯।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৪০।

অন্বয়।

কুলক্ষয়ে (সতি) সনাতনাঃ (চিরন্তনাঃ) কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি ধর্ম্মে নষ্টে (সতি) অধর্ম্মঃ কৃৎস্নং (সমগ্রং) কুলম্ অভিভবতি। ৪০।

অনুবাদ।

কুলের ক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্মসমূহ নাশ প্রাপ্ত হয় এবং কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম সকল কুলকে অভিভূত করিয়া থাকে। ৪০।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১।

অন্বয়।

হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিকুলোদ্ভব) স্ত্রীষু দুষ্টাসু সতীষু) বর্ণসঙ্করঃ জায়তে। ৪১।

অনুবাদ।

হে কৃষ্ণ! কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারাদি দোষে লিপ্ত হয় এবং হে বৃষ্ণিকুলোদ্ভব! কুলস্ত্রীসকল (ব্যভিচারাদি দোষে) দূষিত হইলে বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। ৪১।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২।

অন্বয়।

সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং কুলস্য চ নরকায়ৈব (ভবতি) হি (যস্মাৎ) এষাং পিতরঃ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পতন্তি। ৪২।

অনুবাদ।

সঙ্কর, কুলক্ষয়কারীগণের ও সেই কুলের, নরকপতনের কারণ হয়। কারণ এই সকল কুলক্ষয়কারীগণের পিতৃপুরুষগণ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ লাভে বঞ্চিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪২।

দিব্য বাণী

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে॥
যস্যাবতাররূপাণি সমর্চন্তি দিবৌকসঃ
অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৯।৭৯-৮০

চরম রূপটি পায়না দেখিতে
সুরলোকবাসী তাই,
অবতার-রূপ অর্চনা করে
ভকতিভরে সবাই।
'অস্তি'-মাত্ররূপে উপলব্ধ যিনি
নামরূপ নাই যাঁর
অদ্বিতীয় যিনি পরমপুরুষ
(নিজরূপ সবাকার)
স্থূলেতে প্রণাম সূক্ষ্মে প্রণাম
কারণে প্রণাম তাঁয়
তাঁহারে প্রণাম তাঁহারে প্রণাম
প্রণাম তাঁহারি পায়।

কথাপ্রসঙ্গে

'ত্যাগীশ্বর' শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের বহু বৈশিষ্ট্য আছে। অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠা ও সর্বাবস্থায় ঈশ্বর-নির্ভরতা, অলৌকিক ত্যাগ ও অভূতপূর্ব তপস্যা, শিশুসুলভ সরলতা ও নিরঙ্কুশ অভিমানশূন্যতা, শিল্পিদুর্লভ সৌন্দর্যবোধ ও অনবদ্য রঙ্গরসিকতা, উচ্চতম ভাব ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, অনন্ত প্রেম ও অপার করুণা, ইত্যাদি বহু দিক্ দিয়াই তাঁহার চরিত্র গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে আলোচিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে যত দিক্ দিয়া যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল, সন্দেহ নাই। তবে এখানে আমরা শ্রীমা সারদাদেবীর কথা দিয়াই আমাদের বক্তব্য শুরু করিতেছি। 'মা, এবার কি ঠাকুর একটা নতুন জিনিস দিয়ে যাবার জন্যেই এসেছিলেন যে সর্বধর্ম-সমন্বয় করে গেলেন ?'—জনৈক সাধুর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন :

'দেখ, বাবা, তিনি যে সমন্বয়-ভাব প্রচার করবার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন তা কিন্তু আমার মনে হয়নি। তিনি সর্বদা ভগবদ্-ভাবেই বিভোর থাকতেন। খ্রীষ্টানরা, মুসলমানরা, বৈষ্ণবরা যে যে ভাবে তাঁকে ভজনা ক'রে বস্তুলাভ করে, তিনি সেই সেইভাবে সাধনা ক'রে নানা লীলা আস্বাদ করতেন ও দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত, কোনও হুঁশ থাকত না। তবে কি জান, বাবা, এই যুগে তাঁর ত্যাগই হল বিশেষত্ব। ও-রকম স্বাভাবিক ত্যাগ কি আর কখনও কেউ দেখেছে ? সর্বধর্মসমন্বয় ভাবটি যা বললে, ওটিও ঠিক। অন্যান্যবারে একটা ভাবকেই বড় করায় অন্য সব ভাব চাপা পড়েছিল।'

অপর একজন সাধুকেও মা বলেছিলেন 'তাঁর ত্যাগই ছিল ঐশ্বর্য।'

'এই যুগে তাঁর ত্যাগই হল বিশেষত্ব', 'তাঁর ত্যাগই ছিল ঐশ্বর্য'—ইহাই হইতেছে মোক্ষম কথা। তাঁহার জীবনে ত্যাগের বড় বড় ঘটনাগুলি অতি প্রসিদ্ধ। এখানে দুই-তিনটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করিব। 'ছোটর দাবী' অনেক সময়ে বড়োর দাবী অপেক্ষাও অধিক মনে হয়। 'রেখা টেনে ছোটর গতি'—পল্লীকবির উক্তি। ছোট ঘটনা অনেক সময়ে হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের একটি ঘটনা শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন :

"আহা, একদিন খেয়ে নবতের ঘরে গেছেন। বেটুয়ায় মসলা ছিল না। দুটি যোয়ান মৌরি খেতে দিলুম, আর দুটি কাগজে মুড়ে হাতে দিলুম, বললুম, 'নিয়ে যাও।' তিনি নবতের ঘর থেকে ঘরে যাচ্ছেন। কিন্তু ঘরে না গিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকের নবতের কাছের গঙ্গার ধারের পোস্তায় চলে গেছেন—পথ দেখতে পাননি, হুঁশও নেই। বলছেন, 'মা, ডুবি ? মা, ডুবি ?' আমি এদিকে ছটফট করছি—ভরতি গঙ্গা। বউ মানুষ, বেরুই না, কোথাও কাউকে দেখিও না। কাকে পাঠাই ? শেষে মা কালীর একটি বামুন এদিকে এল। তাকে দিয়ে হৃদয়কে ডাকালুম। হৃদয় খেতে বসেছিল, তাড়াতাড়ি এঁটো হাতেই দৌড়ে একেবারে ধরে তুলে নিয়ে এল। 'আর একটু হলেই গঙ্গায় পড়ে যেতেন!...হাতে দুটি যোয়ান দিয়েছিলুম কিনা। সাধুর সঞ্চয় করতে নেই, তাই পথ দেখতে পাননি। তাঁর যে ষোল

আনা ত্যাগ।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ-শিষ্য, ঈশ্বরকোটি স্বামী প্রেমানন্দ একটি পত্রে লিখিতেছেন :

"কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি জিবছোলা দরকার হয়। রামদাদা শুনিয়া পরদিন রূপার একটি জিবছোলা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। ঠাকুর দেখিয়া কহিলেন, 'ছিঃ! ওকি করেছ? ও নে যাও। এখানকার জন্য এক পয়সার পিতলের একটা জিবছোলা আনিবে।' আর তাহাই হইল।"

রথ-পুনর্যাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক প্রাতে ভক্ত বলরাম বসুর গৃহে আগমন করিয়াছেন। অনেক পুরুষ-ভক্ত ও ভক্তিমতী স্ত্রীলোকের সমাগম হইয়াছে। কিন্তু 'গোপালের মা', যাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিসত্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমার সব হয়েছে', কামারহাটির সেই ব্রাহ্মণী অনুপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে বলরামবাবু তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। প্রায় সন্ধ্যাকালে 'গোপালের মা' আসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তগণ সঙ্গে আনন্দে দুই দিন দুই রাত 'বলরাম-মন্দিরে' অতিবাহিত করিয়া তৃতীয় দিন সকালে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া দুই-একজন বালক-ভক্ত, 'গোপালের মা' ও ভক্তিমতী 'গোলাপ মা'র সহিত নৌকায় উঠিলেন। গোপালের মা'র অভাব আছে জানিয়া বলরামবাবুর পরিবারবর্গের অনেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিস তাঁহাকে দিয়াছিলেন, সেই পুঁটুলিটি নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হইল। নৌকা ছাড়িল। এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখিতেছেন :

"যাইতে যাইতে পুঁটুলিটি দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসায় জানিলেন—উহা গোপালের মার; ভক্তপরিবারেরা তাঁহাকে যে সকল দ্রব্যাদি দিয়াছেন, তাহারই পুঁটুলি। শুনিয়াই ঠাকুরের মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। গোপালের মাকে কিছুই না বলিয়া অপর স্ত্রী-ভক্ত গোলাপ-মাতাকে লক্ষ্য করিয়া ত্যাগের বিষয়ে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, যে ত্যাগী সেই ভগবানকে পায়। যে লোকের বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে দেয়ে শুধু হাতে চলে আসে, সে ভগবানের গায়ে ঠেস্ দিয়ে বসে।' ইত্যাদি। সেদিন যাইতে যাইতে ঠাকুর গোপালের মার সহিত একটিও কথা কহিলেন না, আর বারবার ঐ পুঁটুলিটির দিকে দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুরের ঐ ভাব দেখিয়া গোপালের মার মনে হইতে লাগিল, পুঁটুলিটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দি।"

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'গোপালের মা' সারা জীবন ত্যাগ-তপস্যা, জপ-তপ সহায়ে শ্রীভগবানকে গোপালভাবে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধা ছিলেন। তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকেও নিষ্কৃতি দেন নাই।

'খণ্ডন-ভব-বন্ধন,' 'জগবন্দন' ইত্যাদি ত্রিশটিরও অধিক বিশেষণ দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরাত্রিক-ভজন রচনা করিয়াছিলেন। শত শত মঠ-মন্দিরে, ভক্তগৃহে উহা প্রতি সন্ধ্যায় গীত হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি বিশেষণই সার্থক। 'করুণা-ঘন', 'নিষ্কারণ-ভকত-শরণ', 'প্রাণার্পণ-জগত-তারণ' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যথিত তাপিত আর্ত মানবের আশা-ভরসার প্রতীক। 'চির-উন্মদ-প্রেম-পাথার'—বিশেষণটি প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের নরলীলার 'মহাভাবে'র পরিচায়ক। 'নিগুর্ণ', 'চিদ্‌ঘনকায়', ইত্যাদি বিশেষণ দার্শনিক তত্ত্বের সূচক। কিন্তু সাধকের সর্বাগ্রে প্রয়োজন 'ত্যাগীশ্বর' শ্রীরামকৃষ্ণকে। এইজন্যই মনে হয় স্বামীজী ঐ 'ত্যাগীশ্বর'-শব্দটির ব্যাখ্যা দিয়াছেন অব্যবহিত পূর্বের 'বঞ্চন-কাম-কাঞ্চন' ও 'অতি-নিন্দিত-ইন্দ্রিয়রাগ' এই দুইটি

বিশেষণের সাহায্যে। ভজনটি প্রার্থনাত্মক—প্রার্থনার ভাব সর্বত্র ওতপ্রোত। তথাপি বাক্য-বিচারে প্রার্থনাবাক্য একটিই : 'ত্যাগীশ্বর হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ'।

ত্যাগ ব্যতীত যে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ বা কর্ম—কোনও পথেই ঈশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায় না ইহা দেখাইতে 'এবার প্রভুর আগমন পর্ণকুটিরে'—সমগ্র জীবনে অভূতপূর্বভাবে স্বয়ং আচরণ করিয়া ত্যাগের মহিমা অপরের নিকট প্রচার।

শুভ ফাল্গুনী দ্বিতীয়ায় তাঁহার আবির্ভাব। সেই পুণ্য তিথি সমাগতপ্রায়। তাহারই স্মরণে স্বামীজীর শিখানো প্রার্থনা প্রভুকে জানাই বারম্বার—

'ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ'।

যুগাবতার

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

প্রেমের ঠাকুর এলো ভয় কোথা আর
ধরণী প্লাবিত হলো দিব্য চেতনার
মহাস্রোতে। সত্যযুগ হলো যে সূচিত !
হৃদয় তন্ত্রীতে নব আশার সঙ্গীত
উঠিল ধ্বনিত হয়ে। জীর্ণ পুরাতন
দিগন্তে বিলীন হলো, এল শুভক্ষণ।

বিপুল সংশয় আর আত্মকেন্দ্রিকতা
কুটিল বিচারবুদ্ধি অসহ মূঢ়তা
সহজ স্বচ্ছন্দ গতি অবরুদ্ধ করি
চৈতন্য রাখিয়াছিল অজ্ঞানে আবরি।

সহস্র বর্ষের এই সঞ্চিত আঁধার
তব পুণ্য আবির্ভাবে, হে যুগাবতার,
একটি নিমেষে মাত্র কানায় কানায়
পূর্ণ করে দিল বিশ্ব আলোর আভায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণে

শ্রীমতী আশা রায়

"ব্যাস বাল্মীকি যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারে নাই, আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কী আর বলিতে পারি?"—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর অপরাহ্ণ-বেলায় কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা সম্বরণের কয়মাস পূর্বে তাঁর চরণে নতজানু হয়ে করজোড়ে ঊর্ধ্বমুখে তাঁর রোগশীর্ণ মুখপানে চেয়ে একথা বলেছিলেন পরম ভক্ত গিরিশচন্দ্র, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যিনি বীর-ভক্ত বলে পরিচিত। সেই যুগাবতারের শুভ জন্মতিথি স্মরণে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে ভাবি, অতি সাধারণ ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা তাঁর মহিমা কতটুকু ব্যক্ত করতে পারি! যিনি সাধারণ মানুষ হয়ে এসেছিলেন মাটীর পৃথিবীতে আমাদেরই পথ-নির্দেশ দিতে, তাঁর শিক্ষা, আদর্শ, প্রেরণা জাতিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ও আরও সুদীর্ঘকাল নিয়ে যাবে।

যেদিক থেকেই তাঁকে দেখি তাঁর অপরিসীম মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে যাই। ভাষা যায় মূক হয়ে, লেখনী ক্ষান্ত হয়ে আসে তাঁর অত্যাশ্চর্য লীলা-কাহিনী বলতে বা লিখতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদেশী শাসনে জাতির যখন সঙ্কট কাল, যখন চলেছে একদিকে একেশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজার তীব্র মুখর সমালোচনা, অন্যদিকে রক্ষণশীল সনাতনপন্থীগণের বিধিনিষেধের দ্বন্দ্বে বিভ্রান্ত জাতির বিদেশী ধর্ম আশ্রয়ের প্রবণতা ও বিদেশীদের ভোগসর্বস্ব আচার-ব্যবহারের অন্ধ অনুকরণে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের লিপ্সা, সেই ঘোর দুর্দিনে জাতিকে উদ্ধার করতে এলেন তিনি। এলেন দরিদ্র শিক্ষাহীন সাধারণ মূর্তিপূজকের বেশে কিন্তু সেই পুণ্যপুরুষের সান্নিধ্যলাভের আশায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে শহরবাসী একত্রিত হতে লাগলো দলে দলে। তিনি নিজেই বলেছিলেন, ফুল ফুটলে মৌমাছি আপনিই এসে জড় হয়। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণির মন্দিরোদ্যানে সেদিন সে ফুল সহস্রদলে বিকশিত হয়ে আকৃষ্ট করেছিল একদিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসিবৃন্দকে অপরদিকে জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী, নির্ধন, আর্ত ও জিজ্ঞাসুকে। এ আকর্ষণে কোন অলৌকিক শক্তির প্রদর্শন ছিল না, ছিল না কোনও পাণ্ডিত্য। অশিক্ষিত হয়ে শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ করে গেলেন—পাণ্ডিত্য ও মেধার দ্বারা পরম জ্ঞান লাভ হয় না।

সেদিনের সেই তমিস্রা ভেদ করতে এসে ভাঙেননি তিনি কিছুই। তিনি গড়তে এসেছিলেন, গড়েই গেছেন। সকল ধর্ম অনুশীলন করে একই সত্যে পৌঁছে বললেন—ধর্ম এক, নাম ভিন্ন হলেও যে যে-পথ দিয়েই যাও সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছবে—'যত মত তত পথ' এবং গৃহী-সন্ন্যাসী, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার সকলেই অধিকারী। ধর্মের বাণী সহজ সরল করে বুঝিয়ে সব দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিলেন সবার—এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ঐ দরিদ্র অশিক্ষিত মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের কাছে জ্ঞান-ভক্তি লাভের আশায় আসতে লাগলেন সগুণ-সাকারবাদিগণ, সগুণ-নিরাকারবাদিগণ, নির্গুণ-নিরাকারবাদিগণ পণ্ডিতাগ্রগণ্যগণ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সর্বোপরি যুক্তিবাদী যুবসম্প্রদায়। ঐ করুণা ও প্রেমের আধার, পবিত্রতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য ও ধর্মের মূর্ত প্রতীকের কাছে সবাই বিস্মিত মুগ্ধ হতবাক্ হয়ে গেলেন। ঐ অনাড়ম্বর স্মিত-বদন

সদা-সন্তুষ্ট সহজ সাধারণ মানুষটির এক একটি মহাবাক্যের অনুধ্যান বা শিক্ষা মানুষের সারা জীবনের পাথেয় ও আদর্শ হতে পারে এমনি তার গভীর তাৎপর্য।

আজ আমরা জাতির চরিত্রে যা কিছু উদারতা ও উন্নতি দেখি, সেখানেই রয়েছে তাঁর অবদান। স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে দেখতে পাই তার স্ত্রীগুরু গ্রহণ, মাতাঠাকুরাণীকে সাক্ষাৎ জগন্মাতা জ্ঞানে পূজা; 'যত্র জীব তত্র শিব'-মন্ত্রে সেবাধর্মের প্রচলন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ একাধারে এমন সমন্বয় বুঝি জগতে আর কখনও কোথাও দেখা যায়নি, তাই স্বামীজীমহারাজ আমাদেরই জন্য তাঁর প্রণাম-মন্ত্র রেখে গেছেন:

"স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্ব-ধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

তুমি যে দয়াল

শ্রীক্ষেত্রপতি ঘোষ

তুমি যে দয়াল, শ্রীরামকৃষ্ণ!
সুসময়ে ভুলে যাই;
চারিদিকে আছ বিরাজিত তুমি
তবু খুঁজে নাহি পাই।

তুমি পল্লবে কুসুমে কাননে
তটিনীর কলতানে,
তুমি ঝরণায়, গিরি-কন্দরে,
বিরাজিছ সব ঠাঁই।

ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল,
দাও ফল তরুশিরে;
তনয়ের লাগি সুধা বুকে দিয়ে
পাঠায়েছ জননীরে।

মায়ার ছলনে ভুলে যাই পাছে
তাইতো আঘাতে টানি লহ কাছে,
না বুঝে আমরা বলি, নিরদয়,
সুখ মোরা সদা চাই।

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচার

স্বামী মুমুক্ষানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধর্মের সংস্থাপক। ধর্মের সার্বজনীন সনাতন তত্ত্বগুলি বহুশাস্ত্রবিদ্ বিদ্বান বিদুষীদের বুদ্ধিজাত কলাকৌশল মাত্র নয়। অধ্যাত্মতত্ত্বের উদ্ভবরহস্যই এই যে চিত্ত শুদ্ধ-পবিত্র, বাসনালেশশূন্য হইলেই উহা অতি গভীরভাবে অনুভূত হয়। এইরূপ অনুভূতি ও অনুভূতিজাত সত্য বা তত্ত্বসমষ্টিই সকল ধর্মের বিশেষতঃ বৈদিক ধর্মের উৎস—শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি শাস্ত্রবিস্তার ধার দিয়াও যান নাই। সাধনার দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণের দ্বারা যে সত্য তিনি অনুভব করিলেন শাস্ত্রবেত্তাগণ পরে মিলাইয়া দেখিলেন, সে সমস্ত অনুভূতি শাস্ত্র-সংগত। এইভাবে শাস্ত্রের প্রামাণ্য শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে প্রতিপন্ন হইয়াছে। "হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ"-প্রবন্ধে তাই স্বামীজী লিখিয়াছেন, "শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূত হন, তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্মের পুনরুদ্ধার পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্রচার হইবে, এইজন্য বেদমূর্তি ভগবান এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।" (বাণী ও রচনা ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫)

সকল যুগে সকল সাধনার সারবত্তা প্রমাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ—মানবজাতি বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সাধককুল কয়েক সহস্র বর্ষে যতপ্রকার প্রধান প্রধান সাধনা করিয়াছেন—এক জীবনে তাহা করিয়া একই লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন। "বেদবেদান্ত, আর আর সব অবতার যা কিছু করে গেছেন তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে গেছেন।" (ঐ, ৭ম খণ্ড পৃঃ ২০৭)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, সাধনা না করিলে শাস্ত্রের মর্ম বুঝা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনার ও অনুভূতির আলোকে বেদ-উপনিষদাদির প্রকৃত তাৎপর্য কি এবং শাস্ত্রনামে প্রচলিত গ্রন্থসমষ্টির কোন্‌টি গৌণ কোন্‌টি মুখ্য অথবা কোন্ কথাটি গৌণ, কোন্ কথাটি মুখ্য তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায়। "শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে" সংযোজনের জন্য তাই তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছেন—"তাঁর জীবন না বুঝলে বেদবেদান্ত অবতার প্রভৃতি বুঝা যায় না।" অপর একটি চিঠিতে তাঁহার মন্তব্য আরও বিশদভাবে পরিস্ফুট : "রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে আইসেন নাই—প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন বটে, অর্থাৎ He was the embodiment of all past religious thoughts of India. His life alone made me understand what the Shastras really meant, and the whole plan and scope of the old Shastras." (ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১১২) অর্থাৎ তিনি ভারতের সমগ্র অতীত অধ্যাত্মচিন্তারাশির মূর্তবিগ্রহস্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য, তাহারা কি প্রণালীতে—কি উদ্দেশ্যে রচিত, তাহা আমি কেবল তাঁহার জীবন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি।

স্বামীজী-কথিত একটি দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে। উপনিষদ্ ভারতীয় অধিকাংশ ধর্মের উৎস। কিন্তু উপনিষদ্ অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত কোন্ দার্শনিক মতবাদের সমর্থক এই লইয়া বাদবিতণ্ডার অন্ত নাই। আমরা দেখি ক্রমপরম্পরায় শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে দ্বৈত, বিশিষ্টা-

দ্বৈত ও অদ্বৈতমতের সাধনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি অহরহঃ এই তিন প্রকার অনুভূতির রাজ্যে বিচরণ করিতেন এবং তিন প্রকার অনুভূতিই যে সাধকের জীবনের ধাপে ধাপে ক্রমশঃ ক্রমশঃ আসিয়া থাকে ইহা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বর্ণনা করিতেন। তাঁহার এই সাধনা ও অনুভূতি স্বামীজীকে নিঃসংশয়ে বুঝাইয়াছিল যে উপনিষদের বক্তব্য এই তিনটির কোন একটি বিশেষ মতবাদের পোষকতা করা নয়—পরন্তু ইহা দেখান যে সোপানপরম্পরায় তিনটিই সত্য—চরম সত্য অদ্বৈতে। "উপনিষদ্-সমূহের মধ্যে যে অপূর্ব সমন্বয় রহিয়াছে, অনেক সময় প্রাচীন বড় বড় ঋষিগণ পর্যন্ত তাহা ধরিতে পারেন নাই।… উপনিষদের মন্ত্রগুলির মধ্যে গূঢ়রূপে যে সমন্বয়ভাব রহিয়াছে, এখন তাহার ব্যাখ্যা ও প্রচার আবশ্যক। … ঈশ্বর-কৃপায় আমার এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল, যাঁহার সমগ্র জীবনই উপনিষদের এই মহাসমন্বয়ের ব্যাখ্যা-স্বরূপ—যাঁহার জীবন উপদেশ অপেক্ষা সহস্রগুণে উপনিষদ্মন্ত্রের জীবন্ত ভাষ্য-স্বরূপ।…বৈদান্তিক সম্প্রদায়গুলি যে পরস্পর বিরোধী নহে, পরস্পর-সাপেক্ষ, একটি যেন অন্যটির পরিণতি-স্বরূপ, একটি যেন অন্যটির সোপান-স্বরূপ এবং সর্বশেষ চরম লক্ষ্য অদ্বৈতে, 'তত্ত্বমসি'তে পর্যবসিত ইহা দেখানোই আমার জীবন-ব্রত।" (ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২০)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ' অনুভূতির তাৎপর্য আমাদের জাতীয় জীবনে কি প্রয়োজন সাধন করে তাহাও আমরা স্বামীজীর উক্তিতে পাই: "তিনি বিবাদভঞ্জন"—"হিন্দু-মুসলমান-ভেদ, ক্রিশ্চান-হিন্দু-ভেদ"—তাঁহার আগমনে তিরোহিত হইবে। নানা মত, পথ, ধর্মের বিদ্যমানতা ও স্বাতন্ত্র্যসত্ত্বেও কিভাবে ঐ সকলের সমন্বয়ে ধর্মকেন্দ্রিক নবীন ভারত গড়িয়া উঠিবে সে সমাধান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের মধ্যেই রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভারতের সংহতি ও 'নেশন'-সংগঠন লইয়া কখনও চিন্তা করিতেন না সত্য। কিন্তু তাঁহার 'সব ধর্মই সত্য' এবং 'যত মত তত পথ' এই অনুভূতিজাত সত্যকে অবলম্বন করাই যে আধ্যাত্মিকতাকেন্দ্রিক 'নেশন'-গঠনের উপায়—স্বামী বিবেকানন্দ তাহা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজী গভীরভাবে বিশ্বাস করিতেন ও বলিতেন, "রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে আপাতবিচ্ছিন্ন ভারতখণ্ড আবার এক হইবে।" (প্রমথনাথ বসু: স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১৪৮)।

কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছেন, "এই কারণে আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্মের উন্নতির জন্য কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া আমি এই মহান আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিকে যেমন নানা মত ও পথের সমন্বয় করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি জ্ঞান ও ভক্তির, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পরাকাষ্ঠা নিজ জীবনে প্রকটিত করিয়া উভয়ের সহ-অনুসরণ যে সম্ভব ও বহু-বাঞ্ছনীয় তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। মান্দ্রাজ-বাসীদের সমক্ষে স্বামীজী বলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ একাধারে শঙ্করের উজ্জ্বল মেধা ও চৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইয়া আবির্ভূত। একটি স্তোত্রে স্বামীজী লিখিয়াছেন: যে জানকী-বল্লভ শ্রীরামচন্দ্রের প্রেম আচণ্ডালে অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত (আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়োযস্য প্রেম-প্রবাহঃ) এবং যে প্রথিতপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গীতারূপ মধুর সিংহনাদ করিয়াছিলেন (গীতং শান্তং মধুর-মপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ) তিনিই অধুনা শ্রীরাম-কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত। (সোঽয়ং জাতঃ প্রথিত-পুরুষঃ রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা ও অনুভূতি যে পরস্পর বিবদমান ধর্মসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া বিশ্বসভ্যতার ও ভারত-কল্যাণের আকর হইবে, 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ'-প্রবন্ধে স্বামীজী তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন : 'এই নবযুগধর্ম সমগ্র জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান···হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণা কর।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সরল উক্তি ও আখ্যায়িকাগুলি বাহ্যতঃ যতই সহজবোধ্য হউক না কেন ঐগুলির মধ্যে যে জটিলতম দার্শনিক সমস্যারও সুন্দর সমাধান রহিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দ তাহা না দেখাইয়া দিলে আমরা ধারণা করিতে পারিতাম না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে লিখিত আছে স্বাধীন ইচ্ছা ও অদৃষ্টবাদ অথবা পুরুষকার ও ভগবদিচ্ছা লইয়া যে বাদানুবাদ পণ্ডিতগণের মধ্যে আবহমানকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে অথচ কোন একটা মীমাংসা হইতেছে না এবং এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের 'হাতী-নারায়ণ মাহুত-নারায়ণ' গল্পটি যে ঐ বিবাদের অপূর্ব সমাধান স্বামী বিবেকানন্দ তিন দিন ব্যাপী সুদীর্ঘ আলোচনায় তাহা এক সময় জনৈক বন্ধুকে বুঝাইয়াছিলেন। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা ১-২)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবমুখে একদা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "জীবে দয়া, জীবে দয়া?···দয়া করবার তুই কে? না না জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!" উপস্থিত সকলে এই কথার একরূপ অর্থ করিলেও স্বামী বিবেকানন্দ এই কথার মধ্যে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য 'জীব ব্রহ্ম' তত্ত্বকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিবার, 'বনের বেদান্তকে ঘরে আনিবার' সুস্পষ্ট পথ, অদ্ভুত আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন যে কর্মে পরিণত বেদান্তের জীবন্ত উদাহরণ স্বামীজী না দেখাইলে মানুষ তাহা বুঝিতে পারিত না।

'নারায়ণ বুদ্ধিতে জীবসেবা'কে স্বামী বিবেকানন্দ যখন সাধনার অঙ্গরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে প্রবর্তিত করিলেন, তখন অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের কেহ কেহ সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন—স্বামীজীর এই কার্যপ্রণালী শ্রীরামকৃষ্ণশিক্ষার সহিত সুসমঞ্জস কিনা। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলে তবে তাঁহাদের সে সংশয়ের নিরসন হইয়াছিল। উত্তরকালে এই গুরুভ্রাতাদেরই প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে নরেনকে না বুঝিলে ঠাকুরকে বুঝা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র যে কিরূপ অতলস্পর্শ সমুদ্র তাহা স্বামীজীর কথায় ধরা পড়ে। তিনি বলেন, 'সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হতে পারে।' (বাণী ও রচনা ৯।৬৩)।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারের আরেকটি দিকের উপর স্বামীজী গুরুত্ব আরোপ করিতেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি তাঁহাকে 'বেদমূর্তি ভগবান' বলিয়া অকপটে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সাধারণে তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানুক বা নাই মানুক, তাঁহার চরিত্র-মহত্ত্ব উপলব্ধি করুক—ইহাই তিনি চাহিতেন। সেইভাবেই যেন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করা হয়—ইহাই স্বামীজীর নির্দেশ। 'ভগবান যদিও সর্বত্র আছেন বটে কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের মত এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই; সুতরাং তাঁকেই কেন্দ্র করে আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে; অথচ প্রত্যেকের তাঁকে নিজের ভাবে গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে—কেউ আচার্য বলুক, কেউ পরিত্রাতা, কেউ ঈশ্বর, কেউ

আদর্শ পুরুষ, কেউ বা মহাপুরুষ—যার যা খুশী।' (পত্রাবলী, ৩রা মার্চ, ১৮৯৪)। শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করা প্রসঙ্গে তিনি শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারী-দাস দেশাইকে লিখিয়াছিলেন (২৯শে জানুয়ারী ১৮৯৪), 'শুধু মানুষের মধ্য দিয়াই ভগবানকে মানা সম্ভব। · যদি খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ কিংবা বুদ্ধকে পূজা করিলে কোন ক্ষতি না হয় তবে যে পুরুষপ্রবর জীবনে চিন্তায় বা কর্মে লেশমাত্র অপবিত্র কিছু করেন নাই, যাঁহার অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত তীক্ষ্ণবুদ্ধি অন্য সকল একদেশদর্শী ধর্মগুরু অপেক্ষা ঊর্ধ্বতর স্তরে বিদ্যমান—তাঁহাকে পূজা করিলে কী ক্ষতি হইতে পারে? · কিন্তু এ মতও আমরা জোর করিয়া কাহারও উপর চাপাই না; আমার গুরুভাইদের মধ্যে কেহই এমন কথা বলে নাই যে, তাঁহার গুরুকেই সকলের পূজা করিতে হইবে—ইহা কখনই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যদি কেহ ঐরূপ পূজা করে তাহাকে বাধা দিবার অধিকারও আমাদের নাই।' এদিকে গুরু-ভ্রাতাদের তিনি লিখিতেছেন 'Do not insist upon everybody's believing in our Guru' (সকলকে জোর করিয়া আমাদের গুরুর উপর বিশ্বাস করিতে বলিও না)। (পত্রাবলী, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৪)।

* * *

পাছে শিব গড়িতে বসিয়া বাঁদর গড়িয়া বসেন এই আশংকায় স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লিখিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, লিখিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে শ্রীরাম-কৃষ্ণচরিত্রের মূল সূত্রগুলি বিধৃত রহিয়াছে। সেই সূত্রগুলি অবলম্বন করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী রচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিবেন—তাঁহার দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণকে দেখিলে যে দেখা হয় তাহাও সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। তৎসত্ত্বেও একথা ঠিক যে, মানুষের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণকে বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে দেখাই শ্রেষ্ঠ দেখা—সে দেখার ফল আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে 'হেউ' 'ঢেউ'।

শুভ জন্মদিনে

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর, ভারতী

এসেছে সে শুভ দিন
হৃদয়তন্ত্রে তাই রহি' রহি'
বাজিছে মধুর বীণ!
ধন্য করেছো ধরণীতে আসি'
আকাশ বাতাস স্থল জলরাশি,
কোন্ ভাষা দিয়ে সে কথা প্রকাশি?
আমি অতি জ্ঞানহীন।
এ যুগেতে ছিল তব প্রয়োজন,
সকল ধর্মে ঘটাতে মিলন;
'নূতন তীর্থে' আজি নতশিরে
দিনু এ-প্রণতি দীন।

'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি'

শ্রীমানস কুমার সান্যাল

আজকাল অনেকেই 'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি'র পার্থক্য সঠিক বুঝেন না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, " 'আমি' 'আমার' এটি অজ্ঞান। 'আমি কর্তা', আর আমার এই সব 'স্ত্রী-পুত্র', 'বিষয়', 'মান-সম্ভ্রম' এ ভাব অজ্ঞান না হ'লে হয় না।" আমি কর্তা, আমি গুরু, আমি অমুকের পুত্র ইত্যাদিরূপে অভিব্যক্ত অভিমানে যে অহঙ্কার পরিস্ফুট হয়, সেই বিশেষাকার অহঙ্কারকেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব 'কাঁচা আমি' বলিয়াছেন। আর অকর্তা, অভোক্তা যে আমি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, এ সকলের পার যে আমি সেই আমিকে, তিনি 'পাকা আমি' বলিয়াছেন। এই 'পাকা আমি'ই 'আত্মা' শব্দের লক্ষ্যার্থ। এই 'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি'র পার্থক্যজ্ঞান না থাকায় আধুনিক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও অহংকারের মর্যাদাকে আত্মমর্যাদা মনে করেন এবং সেই অহংকারের মর্যাদাকে রক্ষা করিতে গিয়া অনেকে নীতি-বিরুদ্ধ কার্য করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"নিজেরে করিতে গৌরবদান, নিজেরে কেবলি করি অপমান", অর্থাৎ আমরা আমাদের অহংকার বা 'কাঁচা আমি'কে গৌরব দিতে গিয়া আমাদের আত্মার বা 'পাকা আমি'র অবমাননা করি। এই আত্মা ও অহংকারের পার্থক্য আমরা যতই বুঝিতে পারিব, ততই আমাদের মঙ্গল সাধিত হইবে। কারণ অহংকারের প্রাধান্যেই আমরা কর্তা, ভোক্তা বলিয়া সাংসারিক সুখদুঃখে নিমগ্ন ও বদ্ধ হই এবং যত অশান্তি ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি করি।

পূর্বে যে 'পাকা আমি'র কথা বলা হইল, ইহারই নামান্তর কূটস্থ চৈতন্য। কূট-শব্দের অর্থ কামারের নেহাই। কামার নেহাই-এর উপর কত বিভিন্ন প্রকারের লৌহ-নির্মিত বস্তু ফেলিয়া পিটিতেছে কিন্তু নেহাই নির্বিকার রহিয়াছে। সেইরূপ যে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি এবং উহাদের পরিবর্তন বা অভাব প্রকাশ পাইতেছে, যিনি সর্বদা একরূপ, যাঁহার সন্নিধি-বশতঃ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয়, যিনি সকল পরিবর্তনের নির্বিকার সাক্ষী তিনিই কূটস্থ চৈতন্য বা 'পাকা আমি'। আর যে 'কাঁচা আমি'র কথা বলা হইয়াছে, ইহার অন্য নাম আভাসচৈতন্য, অর্থাৎ যে চৈতন্য অনাদি অবিবেকবশতঃ দেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতিকে অথবা উহাদের বিকার সকলকে আপনার বলিয়া মানিয়া লন এবং তজ্জন্য সুখদুঃখ ভোগ করেন, তিনিই আভাস চৈতন্য বা 'কাঁচা আমি'। এই 'কাঁচা আমি' কখনও আপনার কূটস্থ স্বরূপটি বিচার করিয়া দেখে না—ইহাই উহার অনাদি অবিদ্যা। পঞ্চদশীকার বলেন, "যদি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কোন অজ্ঞানীকে কূটস্থ চৈতন্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তবে সেই অজ্ঞ ব্যক্তি বলে, 'কূটস্থ চৈতন্য আমার নিকট প্রতিভাত হয় না এবং কূটস্থ চৈতন্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই।' (চিত্রদীপ, ২৭)। যে চৈতন্যদ্বারা কূটস্থ-চৈতন্য-বিষয়ক অজ্ঞানের বা কূটস্থ চৈতন্যের অভাবের অনুভব হয়, উহাই কূটস্থ চৈতন্য, অজ্ঞব্যক্তি উহা বুঝিতে পারে না।" জীবের পুণ্যপাপ এবং তৎফলরূপ সুখদুঃখ ভোগ,

লোকান্তরে গমন ও ইহলোকে আগমন—এই সমস্ত কার্যই 'কাঁচা আমি' করিয়া থাকে, 'পাকা আমি' করে না, ভ্রমবশতঃ 'পাকা আমি' করিতেছে বলিয়া প্রতীতি হয়। এই ভ্রমজন্য প্রতীতিও 'কাঁচা আমি'রই হয়। 'পাকা আমি'র হয় না, কারণ 'পাকা আমি' অকর্তা, অভোক্তা, অসঙ্গ, নির্বিকার ও শান্ত অবস্থাতেই থাকে। আরও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পুণ্যপাপ, সুখদুঃখ, লোকান্তরে গমনাগমনাদি, কেবল বুদ্ধিতেই সম্ভব, আভাস চৈতন্যেও সম্ভব হয় না, বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ আভাস চৈতন্যে ঐ ফলভোগাদি ক্রিয়া হইতেছে বলিয়া মনে হয়। জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য আকাশস্থ সূর্যের আভাস। জল কম্পিত হইলে বা স্থির হইলে জলস্থ সূর্যকে কম্পিত বা স্থির দেখায়, কিন্তু জলের কম্পন জলস্থ সূর্যে আরোপিত হয় মাত্র। এইরূপ বুদ্ধির কম্পন আভাস চৈতন্যে আরোপিত হয় মাত্র। অবিবেকবশতঃ আভাস চৈতন্য বুদ্ধির ধর্ম সুখদুঃখাদি আপনাতে আরোপ করিয়া সুখী দুঃখী হইয়া পড়েন, যেমন জল লালবর্ণ হইলে প্রতিবিম্ব লাল দেখায়।

কূটস্থচৈতন্যই অজ্ঞানবশতঃ আভাসচৈতন্য জীবরূপে প্রতিভাত হন এবং নিজেকে সংসারী মনে করেন। আভাস চৈতন্যের স্বরূপ হইতেছে কূটস্থ চৈতন্য, আভাসত্ব মিথ্যা এবং কূটস্থে উহার পর্যবসান। কাজেই বিচার দ্বারা জীবের আভাস অংশের নিরাস করা হয়। পঞ্চদশীকার বলেন—

ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাদধিষ্ঠানপ্রধানতা।
যদা তদা চিদাত্মাহমসঙ্গোঽস্মীতি বুধ্যতে॥

(তৃপ্তিদীপ, ৮)

অর্থাৎ, ভ্রমাংশের (জীবের আভাসাংশের) তিরস্কার করিতে পারিলে (মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারিলে) যখন অধিষ্ঠান অংশের (কূটস্থের) প্রধানতা হয় তখন জীব বুঝিতে পারে—'আমি চৈতন্যস্বরূপ ও অসঙ্গ'।

শ্রুতিতে আছে,

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

(শ্বেতা. উপ ৪।৬ ও মুণ্ডক উপ ৩।১।১)

তাৎপর্য এই যে একটি দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি একরূপ পক্ষী আছে—তন্মধ্যে একটি কর্মফল-ভোক্তা অপরটি স্বচ্ছ, ভোগরহিত এবং অসঙ্গ—উহা পূর্বোক্ত ভোক্তৃরূপ পক্ষীটিকে প্রকাশিত করে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটিকে জীব এবং দ্বিতীয়টিকে পরমাত্মা বলিয়া বুঝা যায়। এই হেতু তাহাদের অভেদ কিরূপে সিদ্ধ হয়? ইহার সমাধান এই যে, এস্থলে দুইটি পক্ষী শব্দে জীব ও পরমাত্মা বুঝা উচিত নয়। (বিচারসাগর)। এই শ্লোকে 'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি'র পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ বুদ্ধিতে চৈতন্যের যে আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্ব এবং কূটস্থ চৈতন্য। কূটস্থ প্রকাশমান থাকেন এবং আভাস ভোক্তা হন। আভাস মিথ্যা, সুতরাং জীবব্রহ্মের অভেদ সম্ভব হয়। "অহং ব্রহ্মাস্মি", "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যে এই 'পাকা আমি'র (কূটস্থচৈতন্যের) সহিত ব্রহ্মের যে স্বাভাবিক একত্ব রহিয়াছে, উহাই দেখান হয়। 'কাঁচা আমি'র সহিত ব্রহ্মের একতার কথা বলা হয় না।

'কাঁচা আমি' (অহঙ্কার) ও 'পাকা আমি'কে (চিদাত্মাকে) অবিবেকবশতঃ এক করিয়া ফেলিলে 'উহা আমার হউক, ইহা আমার হউক' এই প্রকার ইচ্ছার উদয় হয়, উহাই হৃদিস্থিত কামনা সকল—উহাই হৃদয়গ্রন্থি বা চিদ্জড়গ্রন্থি। বিবেকদ্বারা এই গ্রন্থি ভেদ হইলে জীব আপনাকে সর্ববিকারের নির্বিকার সাক্ষিরূপে অনুভব করেন। উক্ত বিবেক হইল: জবাপুষ্পের

সান্নিধ্যে স্ফটিক লাল মত দেখাইলেও উহা প্রকৃত পক্ষে লাল হইয়া যায় না। এইরূপ স্ফটিকবৎ শুদ্ধ আত্মাকে দেহ, মন, প্রাণ প্রভৃতির সম্পর্কে উহাদের ধর্মে রঞ্জিত মনে হইলেও, আত্মা ঐ ধর্মসকল দ্বারা রঞ্জিত হন না—সর্ব্বদা অসঙ্গ, অভোক্তা, অকর্তা ও শুদ্ধই থাকেন। শুদ্ধ চিত্তে এই বিবেক-জ্ঞান প্রতিভাত হয়। এইরূপে প্রথমে কূটস্থ চৈতন্যের অনুভব করিয়া উহাকেই জগদ্‌ভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্মরূপে অনুভব করাই ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞান হইলে আর 'ইহা কূটস্থচৈতন্য' 'ইহা আভাস চৈতন্য' এই ভেদ থাকে না। জ্ঞানী দেখেন, 'আমি শুদ্ধ চৈতন্য। মায়াবশতঃ আমি বুদ্ধি বা অবিদ্যার সাক্ষী কূটস্থ চৈতন্যরূপে এবং বুদ্ধি বা অবিদ্যাতে অভিমানী আভাস চৈতন্যরূপে প্রতিভাত হই। পরমার্থতঃ আমাতে কোন প্রকার ভেদ নাই।' কিন্তু ঐ প্রকার জ্ঞান হইলেও প্রারব্ধবশতঃ বুদ্ধিতে আভাস ও জগতের মিথ্যা প্রতীতি চলিতে থাকে। বুদ্ধিতে এই প্রকার অনুবৃত্তির নাম বাধিতানুবৃত্তি—যেমন প্রতিবিম্বের বাধ করিয়া নিজ বিম্বরূপ মুখাদির সহিত অভেদ হয়, তাহা হইলেও যতদিন জল দর্পণাদি এবং বিম্বের সন্নিধিরূপ 'নিমিত্ত' থাকে ততদিন বাধিত (মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত) প্রতিবিম্বের অনুবৃত্তি বা প্রতীতি হয়। সেইরূপ 'কাঁচা আমিটি' বুদ্ধি বা অজ্ঞানাংশরূপ উপাধি-সহিত আপনার বাধ ঘটাইয়া (মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া), মহাবাক্যস্থ অহম্ প্রভৃতি জীব-বাচক পদের লক্ষ্যার্থ যে অধিষ্ঠান কূটস্থরূপ নিজরূপ (অর্থাৎ 'পাকা আমি') তাহার অভিমান করিয়া ('তাহাই আমি' এই ভাবিয়া), সেই 'পাকা আমি'র সহিত ব্রহ্মের অভেদ হয়, তাহা হইলেও যতদিন প্রারব্ধরূপ নিমিত্ত থাকে, ততদিন সেই বাধিত দেহাদি জগতের সহিত 'কাঁচা আমি'র অনুবৃত্তি বা প্রতীতি থাকে। যখন প্রারব্ধের অবসান হয়, তখন সেই প্রতীতিরও অভাব হয়। তাহাই তাহার বিদেহ মোক্ষ। পূজ্যপাদ শ্রীসুরেশ্বরাচার্যও বলিয়াছেন—

"নিবৃত্তসর্পঃ সর্পোত্থং যথা কম্পং ন মুঞ্চতি।
বিধ্বস্তাখিলমোহোঽপি মোহকার্যং তথাত্মবিৎ॥

(নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ৪।৬০)

অর্থাৎ, সম্যক্ বোধের দ্বারা সর্পবিভ্রম যাঁহার বাধিত হইয়াছে, তাঁহার যেরূপ ভয়কম্পনাদি কিছু-কাল অনুবর্তিত হয়, সেইরূপ বিদ্বানের সমস্ত মোহ বিদ্যার দ্বারা বাধিত হইলেও প্রারব্ধ ফলভোগ পর্যন্ত তাঁহার মোহকার্যের অনুবর্তন হয়। যেমন সংসারে যে সকল লোক দেবত্ব-প্রাপ্তির কামনা করে, তাহারা পর্বত-শৃঙ্গ হইতে পতন, অগ্নিতে প্রবেশ, প্রয়াগ-সঙ্গমে জলপ্রবেশ প্রভৃতির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ 'পাকা আমি'-রূপে (সাক্ষিচৈতন্যরূপে) অবস্থান করিবার জন্য অর্থাৎ পরব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা নিজের 'কাঁচা আমি'র সম্পূর্ণ বিনাশ প্রার্থনা করেন। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিয়াছেন: "কেশব বললে, মহাশয় 'আমি' ত্যাগ করিলে যে আর কিছুই থাকে না। আমি বল্লুম, কেশব তোমাকে আমি সব 'আমি' ত্যাগ করতে বলছি না, তুমি 'কাঁচা আমি'…ত্যাগ ক'রে 'পাকা আমি' হ'য়ে থাকো।" (কথামৃত ১।৬।২)

অবতরণ-রহস্য ঃ যোগমায়া

শ্রীযতীন্দ্র কুমার ঘোষ

যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটেছে তখনই ঈশ্বর অবতাররূপে ধরামাঝে নেমে এসেছেন। তিনি এসেছেন বেদ উদ্ধার করতে। তিনি এসেছেন ভক্ত প্রহ্লাদকে তার অত্যাচারী পিতার কবল থেকে রক্ষা করতে। তিনি এসেছেন দেব-ও ঋষি-বিদ্বেষী অত্যাচারী রাবণকে বিনাশ করতে। তিনি এসেছেন কংস, জরাসন্ধ, দুর্যোধনাদির অত্যাচার থেকে নিপীড়িত সকলকে উদ্ধার করতে। অতএব জন্মরহিত হলেও, অব্যয় অপরিণামী হলেও, বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টিকর্তা হলেও, তিনি যুগপ্রয়োজনে নেমে এসেছেন বহুবার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শ্রীমুখের বাণী দিয়ে অবতারবাদের সত্যতা স্থাপন করে গেছেন। গীতার যুগ শেষ হবার পরও তিনি নেমে এসেছেন ভগবান বুদ্ধরূপে, ভগবান ঈশারূপে, মহান ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরৎ মহম্মদরূপে এবং তারপরে ভগবান শ্রীচৈতন্য-রূপে প্রেমভক্তি বিলাতে। একশ আটত্রিশ বছর আগেও ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণরূপে যুগপ্রয়োজনে।

অবতার কখন এবং কার ঘরে আবির্ভূত হবেন তার ব্যবস্থা করা, লীলাস্থলের আয়োজন করা, লীলার পার্ষদ সংগ্রহ করা, লীলার যাবতীয় ব্যাপারই 'যোগমায়া'র পরিচালনায় হয়ে থাকে। অবতারপুরুষ 'যোগমায়া'র সাহায্যেই তাঁর লীলা প্রকট করেন। লীলার দায়িত্ব সবটাই 'যোগমায়া'র।

এখন অবতার-পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে 'যোগমায়া' কি কি ব্যবস্থা করলেন তা দেখা যাক। ঈশ্বরের অবতার বলে আজও যাঁরা পূজিত হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ও শাক্যসিংহ ব্যতীত আর প্রায় সকলেই দরিদ্রের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু কেবল দুঃখ দারিদ্র্যের পরিবেশ হলেই হবে না। প্রেম, পবিত্রতা, দয়াদাক্ষিণ্য, নিঃস্বার্থতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের একত্র সমাবেশ যে দরিদ্রের কুটীরে নেই সেখানে ওঁরা জন্মগ্রহণ করেন না। এই সংবাদটি 'যোগ-মায়া'র অবিদিত নয়। তিনি অবতারপুরুষ গদাধরের আবির্ভাব সম্পর্কেও ঐ ধারাটি বজায় রেখেছেন। তাঁর অলক্ষ্য ব্যবস্থানুযায়ী হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও মাতা চন্দ্রমণির দরিদ্র কুটীরখানি আলোকিত করে পরমপুরুষ গদাধর জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পিতা ত্যাগ-তিতিক্ষা, ক্ষমা-সন্তোষ, সত্যনিষ্ঠা-সদাচার প্রভৃতি প্রচুর সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। গৃহদেবতা শ্রীরামচন্দ্রে তাঁর অশেষ ভক্তি। প্রত্যহ সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য-কর্ম সম্পাদন ও স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করে গৃহদেবতার পূজা না করে তিনি জল গ্রহণ করতেন না। জননী চন্দ্রমণিরও প্রচুর সদ্‌গুণ ছিল। সরলতা, স্নেহভালবাসা, দেবদ্বিজে ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের মধুর সমাবেশ তাঁতে ঘটেছিল। সেজন্য তিনি সকলের প্রিয়পাত্রী হয়েছিলেন।

যেমন কংসের অত্যাচারে উৎপীড়িত পিতা-মাতার ক্রোড় উজ্জ্বল করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন সেইরূপ অত্যাচারিত পিতা ক্ষুদিরাম ও মাতা চন্দ্রমণির পর্ণ-কুটীরখানি আলোকিত করে পরমপুরুষ গদাধরের জন্ম হল। সেদিন ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন বুধবার শেষ রাত্রি, তিথি শুক্লা দ্বিতীয়া। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে

'যোগমায়া'কে বড়ই শ্রম করতে হয়েছিল নবজাত শিশুকে কংসের কবল থেকে গোকুলে সরিয়ে দিতে। এবারে 'যোগমায়া' গদাধরের জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতামাতাকে "দেরে" গ্রামের অত্যাচারী জমিদারের কবল থেকে সরিয়ে এনে ছিলেন কামারপুকুরে।

এক্ষণে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সম্পর্কে 'যোগমায়া'র ব্যবস্থাদির পরিচয় নেওয়া যাক: ঠাকুরের তখন ১৭।১৮ বৎসর বয়স। তাঁর বড় ভাই বিশিষ্ট স্মার্ত পণ্ডিত রামকুমার কলকাতায় ঝামাপুকুরে চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করেন এবং সেখানকার গৃহস্থ বাড়ীতে যজন ও যাজন করেন। কিন্তু তিনি সময়ে কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। কাজেই তাঁর যজন-যাজনে সাহায্য করবার জন্য ঠাকুরকে ডেকে পাঠালেন। কামারপুকুরের স্নেহের আশ্রয় মেজ ভাই ও স্নেহময়ী জননীকে ছেড়ে ঠাকুরকে ঝামাপুকুরে পিতৃতুল্য অগ্রজের নিকট আসতে হ'ল। 'যোগমায়া' তাঁকে এগিয়ে নিয়ে এসে রাখলেন তাঁর অদূর ভবিষ্যতের মুখ্য-লীলাস্থলে সহজে পৌঁছে দেবার জন্য।

ইতিপূর্বের ঘটনা: কলিকাতা জানবাজারের কীর্তিমতী মহীয়সী রাণী রাসমণি ৺কাশীধামে গিয়ে কাশী-বিশ্বেশ্বর ও মাতা অন্নপূর্ণার দর্শন ও তাঁদের উদ্দেশে পূজাভোগ দেবার প্রবল বাসনা পূর্ণ করতে জামাতা মথুরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গায় নৌকা ভাসিয়েছেন। 'যোগমায়া' দেখলেন ঠাকুরের মুখ্য লীলাস্থল রচনার কার্যে ভক্তিমতী রাণী রাসমণিকে নিয়োজিত করার পক্ষে এই ত সুবর্ণ সুযোগ। অতএব আর বিলম্ব নয়। গঙ্গাবক্ষে রাণী সামান্য কিছু দূর গিয়েছেন, এমন সময় তিনি প্রত্যাদেশ পেলেন 'যোগমায়া'র কাছ থেকে,— 'কাশী যাবার প্রয়োজন নেই। এইখানে এই গঙ্গাতীরেই স্থান সংগ্রহ করে তদুপরি দেবী কালিকার মন্দির নির্মাণ কর এবং সেখানে দেবী-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর নিত্যপূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর। দেবী সেই বিগ্রহে আবির্ভূতা হয়ে তোমার আয়োজিত নিত্যপূজা ও ভোগ স্বয়ং গ্রহণ করবেন।' শুনে রাণীর কাশী যাওয়া আর হল না। গৃহে ফিরে এসে প্রত্যাদেশ মত গঙ্গার পূর্বতীরে দক্ষিণেশ্বরে বিরাট স্থান খরিদ করে রাণী সুবৃহৎ ও সুরম্য কালীমন্দির, নাটমন্দির, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, গঙ্গার তীর-সংলগ্ন দ্বাদশ শিবমন্দির, দেবীমন্দির-পার্শ্বে রাধাকৃষ্ণ মন্দির, পুষ্করিণী, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণ করালেন। বিগ্রহগুলির নির্মাণ কার্যও শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক ভাবে সমাধা হয়ে গেল। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল মন্দির ও দেবীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং অন্নভোগ দেবার ব্যাপারে। প্রধান অসুবিধা দেখা দিল রাণীর জাতি নিয়ে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ শূদ্রজাতীয়া রাণীর মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিলেন না। এদিকে প্রতিষ্ঠার জন্য দিন স্থির হয়ে রয়েছে (১২৬২ সাল, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, স্নানযাত্রার দিন)। লীলাস্থল প্রস্তুত। ঠাকুর তখন ২০ বৎসরের যুবক, ঝামাপুকুরে অগ্রজের কাছে এগিয়ে এসে বাস করছেন। অলক্ষ্যে 'যোগমায়া' অগ্রজ রামকুমার সমেত ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরের ঐ মন্দিরে পৌঁছে দিতে অনুকূল ঘটনা-পরম্পরা সৃষ্টি করতে থাকলেন। আগেই বলেছি, রামকুমার ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ ও স্মৃতি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আদ্যাশক্তির উপাসনায় বিশেষ শ্রদ্ধাবান হওয়ায় উপযুক্ত গুরুর নিকট দেবীমন্ত্রও গ্রহণ করেছিলেন। মন্দির ও দেবী প্রতিষ্ঠার বিধানের জন্য রামকুমারের চতুষ্পাঠীতেও আহ্বান গিয়েছিল রাণীর কাছ থেকে। 'যোগমায়া'র অদৃশ্য শক্তি-প্রভাবেই দেবীভক্ত পণ্ডিত রামকুমার স্মৃতির বিধানকে উদারভাবে ও যথোচিত সম্মান দেখিয়ে ব্যবস্থা দিলেন যে রাণীকে তাঁর মন্দির ও বিগ্রহাদি সমেত পূজা ভোগ সেবাদির জন্য নির্দিষ্ট

সমস্ত সম্পত্তি কোন সদাচার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের নামে উৎসর্গ করে দিতে হবে, তবেই তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা, মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা অন্নভোগাদি পূজার অনুষ্ঠান শাস্ত্রসম্মত হবে। রামকুমারের এই ব্যবস্থানুযায়ী রাণী তাঁর গুরুদেবের নামে ঐ সমস্ত উৎসর্গ করে দিতে সঙ্কল্প করলেন বটে, কিন্তু মন্দিরে দেবীর সেবাপূজাদি কোন শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী শ্রদ্ধাবান ব্রাহ্মণের দ্বারা করাবেন, ঠিক করলেন। অতএব রামকুমারকেই তিনি এই কার্যের ভার নেবার জন্য অনুরোধ করলেন। অশূদ্রযাজী সদাচারী রামকুমার 'যোগমায়া'র প্রভাবেই শূদ্রজাতীয়া রাণী রাসমণির নির্মিত মন্দিরে মাতা ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠা, নিত্যপূজা, অন্নভোগ নিবেদন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সব কাজের ভারই নিয়ে নিলেন। তিনি মাতা ভবতারিণীর পূজক পদে বৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর গদাধরও দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে পৌঁছে গেলেন তাঁর ভবিষ্যৎ লীলাস্থলীতে।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে এসে ঠাকুর প্রথমে দেবীর বেশকারী এবং পরে ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজকের পদ গ্রহণ করেন। অগ্রজ রামকুমারের শিক্ষায় ও যত্নে ঠাকুর বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। কিন্তু শাক্তী দীক্ষা না নিলে দেবীপূজা প্রশস্ত নয় শুনে প্রবীণ শক্তি-সাধক শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে তিনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। রামকুমার তাঁকে শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজায় নিযুক্ত করতে লাগলেন এবং মথুরবাবুও সানন্দে ঠাকুরকে দেবীর পূজক পদে বরণ করে নিলেন।

১২৬২ সালের মধ্যভাগ থেকে ১২৭৩ সাল পর্যন্ত ঠাকুরের সাধনকাল। প্রথমে ঠাকুরের তীব্র ব্যাকুলতায় দেবীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়। রাগাত্মিকা ভক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে, দেবী পূজা আরম্ভের বছর তিনেকের মধ্যেই ঠাকুরের বাহ্যপূজা ত্যাগ হয়ে গেল। তাঁর সাধন-লীলা শুরু হল। প্রথমেই 'যোগমায়া'র অংশসম্ভূতা ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নির্দেশে চৌষট্টিখানি তন্ত্রের নির্দিষ্ট সমস্ত সাধনগুলি ঠাকুর অনুষ্ঠান করেন। পরে রামাইৎ সাধু জটাধারীর কাছে রাম-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বাৎসল্যভাবে সাধন করেন। বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত শান্ত দাস্য সখ্য ও মধুর ভাব সাধনেও তিনি সিদ্ধ হন। তারপর অদ্বৈত-বেদান্তাচার্য শ্রীমৎ তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে এক দিনেই নির্বিকল্প সমাধিতে অধিষ্ঠিত হয়ে অদ্বৈতব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করেন। এরপর সুফি গোবিন্দ রায়ের কাছে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে এই ধর্মমতে সাধন করেন এবং অচিরে সিদ্ধ হন। সাধকভাবের শেষ পর্যায়ে মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী সারদাদেবীর দেহাবলম্বনে ৺ষোড়শী পূজার অনুষ্ঠান ও ভগবান ঈশা প্রবর্তিত পথে সাধন ও সিদ্ধিলাভ করেন। এছাড়া জৈন ও শিখ ধর্মেও তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হয়েছিল।

এখানে এটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে আপাত-বিরোধী অতগুলি ধর্মমতের প্রত্যেকটিতে সাধনের জন্য অতগুলি উপযুক্ত সমর্থ গুরুর একের পর আর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঠাকুরের কাছে বিনা আহ্বানে অপ্রত্যাশিতভাবে আগমন 'যোগমায়া'র অদৃশ্য ব্যবস্থাপনাতেই সংঘটিত হয়েছিল। সাধক ভাবের পর ঠাকুরের যে গুরুভাবের ও দিব্যভাবের উদয় হয়েছিল তাও ঐ 'যোগমায়া'র ব্যবস্থা-পনাতেই। অবতারদের আদি-মধ্য-ও অন্ত লীলা সবই 'যোগমায়া'র সাহায্যে হয়ে থাকে।

ঈশোপনিষদ্ অনুধ্যান

স্বামী নিরাময়ানন্দ

ঈশোপনিষদের প্রথম বাক্যটি এমনই এক মহান্ ভাবে পরিপূর্ণ যাহা একনিষ্ঠ সাধকের মন ব্রহ্মময় করিয়া তোলে। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' চিন্তা করিতে করিতে সাধক-মন অনুভব করে: বিশ্বজীবন এক ছন্দে স্পন্দিত; জীব-জগৎ-ঈশ্বর, সংসার-সমাজ—এমন কি ইহজন্ম-পরজন্ম—সব এক সূত্রে গ্রথিত—একসত্তায় সত্তাবান্! কোন ফাঁক নাই, কোন ফাঁকি নাই! সর্বত্র ঈশ্বর অনুভব করিয়া—মায়ার অন্তরালে চিরভাস্বর সত্যদর্শন করিয়া তবে সাধকের সাধনা শেষ! সরল সংক্ষিপ্ত বলিষ্ঠ এই উপনিষদ্‌খানি তাই যুগে যুগে বহু সাধক ও মনীষীকে নানাভাবে আকর্ষণ করিয়াছে।

দশোপনিষদের প্রথমেই পঠিত হইয়া থাকে বলিয়াই যে এখানি প্রাচীনতম, তাহা বলা যায় না। শুক্লযজুর্বেদের সংহিতাভাগের শেষে এটিকে পাওয়া যায়। সংহিতায় মন্ত্র সংগৃহীত আছে, মন্ত্রগুলি কর্মকাণ্ডের ব্যাপার; অথচ এখানে উপনিষদের সুর ধ্বনিত হইতেছে, জ্ঞানের প্রেরণা স্পষ্ট। সন্ধিস্থলে আছে বলিয়াই বোধ হয় ইহার প্রথম স্থান, ভাবটা এই: এইবার কর্মের শেষ, জ্ঞানের আরম্ভ।

কর্ম, না কর্ম-ত্যাগ—এই দুই চিন্তার বিরোধ বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থানে লক্ষিত হয়—তাহার একটা সামঞ্জস্য-চেষ্টা এখানে স্পষ্ট। কর্মের উৎস—প্রবৃত্তি, জ্ঞানের আরম্ভে নিবৃত্তি। কর্ম-ও জ্ঞান-সাধনার বিরোধ অতি প্রাচীন। দুইটি পক্ষের দুইটি বিপরীত চিন্তাধারার সামঞ্জস্য-চেষ্টা যখন এখানে রহিয়াছে, তখন অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে—ইহা খুব প্রাচীন নয়। সামঞ্জস্য নিশ্চয়ই বিরোধের পরবর্তী।

একটি আখ্যায়িকার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় শুক্লযজুর্বেদ পরে, অতএব তদন্তর্গত ঈশোপনিষদও পরে। গল্পটি সংক্ষেপে এই: যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার গুরুর অনিচ্ছাকৃত কোন অন্যায় কাজের প্রায়শ্চিত্ত একাই করিয়া গুরুকে পাপমুক্ত করিতে চান। ক্রুদ্ধ গুরু অহঙ্কারী শিষ্যকে পরিত্যাগ করেন। গুরুপরিত্যক্ত হইয়া শিষ্যও তাঁহার শিক্ষা পরিত্যাগ করিলেন—বমন করিয়া ফেলিয়া দিলেন। অন্য শিষ্যেরা তিতির পাখির রূপ ধরিয়া তাহা খাইয়া ফেলিলেন। শ্রুতিহীন যাজ্ঞবল্ক্য সূর্যের উপাসনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নূতন শ্রুতি লাভ করিলেন—তাহার নাম হইল 'বাজসনেয়ী সংহিতা' অর্থাৎ জ্যোতির্ময় মন্ত্ররাশি। এইটিই শুক্লযজুর্বেদ, অন্যটি কৃষ্ণযজুর্বেদ। এইভাবে বোঝা যায়—কৃষ্ণযজুর্বেদ প্রাচীন—শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত দুটি উপনিষদ্ আমাদের সুপরিচিত, একটি এখানে আলোচ্য ছোট্ট ঈশোপনিষদ্, অন্যটি বৃহৎ জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।

কর্মকাণ্ডের শেষে জ্ঞানকাণ্ডের আরম্ভ। উভয়ের সন্ধিক্ষণে জ্ঞান-অজ্ঞানের, আলো-আঁধারের গোধূলিলগ্নে এই ঈশোপনিষদ্ আকারে সংক্ষিপ্ত, ভাবে গভীর ও বিশাল। মানবমন পৌনঃপুনিক কর্মকাণ্ড অতিক্রম করিয়া অপুনরাবৃত্তির জন্য জ্ঞানকাণ্ড ধরিতে চাহিতেছে। এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব-ব্যাকুলিত মনকে বলা হইয়াছে: হয় সর্বত্র ঈশ্বরভাব অনুভব করিয়া শোকমোহের অতীত হও, না হয় সারাজীবন অনলসভাবে কর্ম কর। ইহার মধ্যে ছোট বড় নাই, যোগ্যতা অনুযায়ী রুচি অনুযায়ী একটি পথ অবলম্বন কর এবং দৃঢ়ভাবে সাহসের সঙ্গে সেই পথ চলিতে থাকো।

ঈশোপনিষদের নানা ব্যাখ্যা আছে; কতকগুলি অভিনব। একটা নতুন কিছু বলিবার ইচ্ছা বা চেষ্টা। শ্রুতির ব্যাপারে এই প্রকার ব্যাখ্যা আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। অনেকের ধারণা: ভাষ্য, টীকার কি প্রয়োজন? মূল উপনিষদ্‌ই যথেষ্ট। তাহাই যদি হইত তাহা হইলে হয়তো ভালই হইত। কিন্তু শ্রুতির উপনিষদংশের অপর নাম রহস্যবিদ্যা। বিশেষতঃ আত্মতত্ত্ব-প্রকাশে বহুস্থানে হেঁয়ালির ভাষা আছে—কখনও ইতিবাচক কখনও নেতিবাচক। এই সব শ্রুতি-উপদেশ এক একজন এক এক রূপ বুঝিয়া থাকেন। প্রজাপতিও দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন: 'হায় আমি কি বললাম—আর ওরা কি বুঝল!' সেক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ নির্ধারণের উপায়? উপায়—আচার্যগণ লিখিত ও প্রচারিত ভাষ্য-টীকা—ইহাকেই বলা হয় সম্প্রদায়গত বিদ্যা। সম্প্রদায় এখানে সংকীর্ণ সম্প্রদায়িকতা অর্থে নয়, গুরুপরম্পরা অর্থে।

উপনিষদের পূর্বাপর সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া শংকরের তাৎপর্য প্রকাশ এবং ব্যাকরণ-সম্মত অর্থ—আচার্যভাষ্যে এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের টীকা বার্তিকে সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। দুই একজন নিজের ভাব বা ঝোঁক অনুযায়ী কিছু লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন—তাহাতে ব্যক্তিগত প্রতিভার ছাপও থাকিতে পারে। কিন্তু নাই কালজয়ী সত্যের শক্তি। অতএব সাধারণভাবে বলা যায়, উপনিষদের মর্মার্থ-নির্ধারণে যেখানে যা পাওয়া যায় সব পড়িয়া চিত্ত বিভ্রান্ত করা অপেক্ষা যাঁহাকে বা যাঁহাদের অভ্রান্ত আচার্য বলিয়া মনে হয় তাঁহাদের গ্রন্থাদির মধ্যেই পড়াশুনা সীমাবদ্ধ রাখা ভাল। বেদান্ত সিদ্ধান্তের দর্শন, ইহার অপর নাম 'উত্তর মীমাংসা'—সারা জীবন শুধু বিচার বিতর্ক করিবার জন্য নয়। তাই শোনা যায় ব্রহ্মবিৎ পিতা পুত্রকে 'তৎ ত্বম্ অসি' মহাবাক্য উপদেশ দিয়া—পুত্র তথা শিষ্যের বুঝিতে অসুবিধা দেখিয়া সস্নেহে বারংবার বলিতেছেন, 'শ্রদ্ধৎস সৌম্য'—হে সৌম্যদর্শন বালক, আমার কথায় বিশ্বাস কর—'তুমিই সেই আত্মা, বা সেই ব্রহ্ম তুমিই।'

এখন আসা যাক ঈশোপনিষদের মর্ম-কোষে। এই উপনিষদের বৈশিষ্ট্য সরলতা, সাহসিকতা ও প্রকাশের সৌন্দর্য। জীবনের সমস্যা মৃত্যুর রহস্য কিছুই এড়াইবার চেষ্টা এখানে নাই। সহজ সরলভাবে জীবনের সম্মুখীন হইবার সাহস এখানে অতি স্পষ্ট! ভোগ-ত্যাগ, শোক-মোহ, এক-বহু, সাম্য-অসাম্য, ঘৃণা-প্রেম, বন্ধন-মুক্তি—সব কিছু তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

কিন্তু সব কিছুর প্রথমে বলা হইয়াছে, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'—ঈশ্বরভাবে সব কিছু 'আচ্ছাদিত' কর—পরিব্যাপ্ত কর—অনুস্যূত কর,—কারণ সব কিছুর অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে ঈশ্বরের উপর; ঈশ্বর আছেন তাই সব কিছু আছে বোধ হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই আছেন—সব কিছু তাঁহারই উপর অধ্যস্ত, তিনিই অধিষ্ঠান—যথা সমুদ্রের উপর তরঙ্গ! 'সমুদ্র আছে' বলিলেই কি সব বলা হইল না? তরঙ্গ তো সমুদ্রেরই উপর উঠিতেছে, ভাসিতেছে, ডুবিতেছে—এই তো এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়! 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' ইহারই প্রতিধ্বনি—'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম', উভয়ত্র ব্রহ্মেরই সত্তা বা অস্তিত্ব, 'সর্বম্' তাহার উপর তরঙ্গের মতো। 'নাই' নয়—তবে তাহার নিজস্ব পৃথক্ সত্তা কিছু নাই। এই অর্থেই বুঝিতে হইবে অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্ত-সংবলিত আচার্য শংকরের আর একটি প্রগল্‌ভ উক্তি "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা"।

'জগৎ মিথ্যা' শুনিয়া অনেকেই চমকাইয়া উঠেন—'কি ব্যাপার, এমন সুন্দর আমাদের জগৎখানা—মিথ্যা? চোখের সামনে দেখিতেছি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা— নদী পর্বত সমুদ্র—শ্যামল

বনরাজি—সুশ্যামল সমতল—সব মিথ্যা—একেবারে 'ন স্যাৎ'! এ কি দর্শন—না 'অন্ধের প্রলাপ!' দুঃখের বিষয় যাঁহারা একপ হাহুতাশ করেন তাঁহারা একবারও 'মিথ্যা' কথাটি যে পারিভাসিক এবং কি অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা তলাইয়া দেখিবার সময়ই পান না। এমন সাধের জগৎ মিথ্যা হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা এত বিচলিত হন যে তাঁহারা এই দর্শনের চতুঃসীমার বাহিরে পলাইয়া যান—যতদূর পারেন, যতশীঘ্র পারেন! কিন্তু হায়, শেষ পর্যন্ত পারেন না কারণ, সবই যে ঈশ্বরে অনুস্যূত—তুলা যেরূপ বস্ত্রে অনুস্যূত। তুলাই সত্য, বস্ত্র 'মিথ্যা', কারণ, বস্ত্র পদার্থটির নামরূপের উপাদান হিসাবে তুলা ভিন্ন আর কোনও বস্তুই নাই। বস্ত্র তো তুলা হইতে প্রস্তুত সূত্রের টানা পোড়েন, আবার ঐ বস্ত্র হইতে কত প্রকার জামা কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, তাহাদের কত নাম, কত রূপ, কত প্রকার ব্যবহার। সত্যের বিচারে অবশ্যই বলিতে হইবে—তুলাই সত্য, আর সব 'মিথ্যা'। 'মিথ্যা' মানে 'নাই' তাহা নহে—তবে তাহার নিজস্ব সত্তা নাই। চলমান জগতের সব কিছু এক অচল ঈশ্বরের সত্তায় সত্তাবান্। অনন্তকোটি চলচঞ্চল অনিত্যবস্তুর প্রকৃত সত্তা সেই অনন্ত অচল নিত্যবস্তু ঈশ্, বা ব্রহ্ম! সেই 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'।

তারপর? ঈশ্বরসত্তা দ্বারা সব কিছু বাসিত করিলাম—আচ্ছাদিত করিলাম—তারপর? 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্'। এই একটি পঙ্‌ক্তির মধ্যেই ব্যক্তিগত জীবন-যাপনের শ্রেষ্ঠ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সমাজ-জীবনের শ্রেষ্ঠ নীতি প্রকাশিত হইয়াছে—আরও বলা যায় অধুনা হন বলিয়া প্রচারিত সাম্যবাদের প্রাচীনতম ভিত্তিভূমি এইখানেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিভিন্ন মনীষী তাঁহাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। তাহার বিস্তারিত আলোচনা বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

মাতৃসঙ্গীত

স্বামী সারদেশানন্দ

[ভৈরবী—একতাল]

জয় জয় জয়
জয় জয় জয় সারদামাতা ॥

নিষ্কাম কর্ম সেবাধর্ম চিত্তলয় একাগ্রতা
স্বরূপসন্ধান প্রেমভক্তিমার্গ উপাসিতা ॥

সাকারা নিরাকারা সগুণা নির্গুণা গুণাতীতা
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রদাত্রী জগন্মাতা ॥

মানসপুত্র

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই সময়েরই অপর কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে কেবল দিব্য ও মানবলীলার অপার অন্তর বোঝাবার জন্য। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়: 'যুবা রাখাল বিবাহের পর হইতেই পড়াশুনা করিবার জন্য সিমলায় আসিয়া বাস করিতে লাগিল। ··· মনোমোহনদার বাড়ীতে আহার ও শয়ন করিবার বন্দোবস্ত করিল।·· আমাদের পড়িবার ঘরেতেই সে পড়িবার বন্দোবস্ত করিল। আমাদের বাড়ীতেই সে সর্বদা চলা-বলা করিত। সে যেন আমাদের বাড়ীর ছেলে হইয়া গেল। ··· ছেলেবেলা হইতেই তাহার কুস্তি লড়িবার বড় ইচ্ছা ছিল।···যাঁহাকে সাধারণে 'অম্বু গুহ' বলিত তাঁহার আখড়ায় বৈকাল বেলা কুস্তি লড়িতে যাইত। নরেন্দ্রনাথও তখন অম্বু গুহের আখড়ায় কুস্তি লড়িতে যাইত। এইজন্য দুইজনে মেশামেশিও খুব হইয়াছিল।···'[১০]

'সন্ধ্যার সময় যুবা রাখাল আসিয়া এক ঠোঙ্গা কচুরি, সিঙ্গাড়া আলুছেঁচকী ও দু'একটী মিষ্টান্ন খাইত। ··· আমি এক গ্লাস জল ও পান আনিয়া দিতাম, তাহার পর পড়িতে বসিতাম। ...রাখাল প্রথমে খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া পড়িত, তাহার পর ওজর তুলিত, "শুয়ে পড়্‌লে পড়া ভাল হয়।" সে একটী তাকিয়া লইয়া তাহার ওপর মাথা রাখিয়া বই পড়িতে থাকিত। খানিকক্ষণ পরে দেখি যে, বইটা তাহার বুকের উপর রহিয়াছে, আর সে দিব্বি নাক ডাকাইতেছে। ···পরে সে প্রতাপ মজুমদারের কাছে কিছুদিন হোমিওপ্যাথি শিখিয়াছিল, তাহাও ভাল লাগিল না, অল্পদিন পরে ছাড়িয়া দিল।'[১১]

'রাখালকে সকলে নিস্তেজ অল্পবুদ্ধি বিবেচনা করিয়া হীন মনে করিত এবং তাহাকে কোন কার্যের উপযুক্ত বলিয়া বোধ করিত না; কিন্তু একমাত্র পরমহংস মশায়ই তাহার ভিতর যে অদ্ভুত শক্তি বীজভাবে নিহিত ছিল, তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন।'[১২]

একই বয়সে ভিন্নকালে ভিন্ন পরিবেশে এই অপূর্ব দেব-ও মানব-লীলা চলছিল। অবতার-লীলাকে পুষ্ট করতে যাঁদের আবির্ভাব তাঁদের জীবনের এই দ্বিবিধ ভাব সাধারণের বোধগম্য হয় না। তাই ভুল বোঝার যথেষ্ট কারণ ঘটে। অথচ ঠাকুর বলছেন, 'কীর্ত্তন শুনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলাম ব্রজমণ্ডলের ভিতর রয়েছে'।[১৩] সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা আর ভাবমুখে দেখার মধ্যে যে অন্তর তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে। রাখালরাজ সম্বন্ধে এই সাধারণ ধারণার কথা ঠাকুর জানতেন, বলেছিলেন, 'বর্ণচোরা আম'—আর সে-কারণেই কি বলেছিলেন: 'রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, সে একটা রাজ্য চালাতে পারে'?[১৪] তথাপি বাল্য-ভাবের মূর্তপ্রতীক রাখালরাজের স্বভাবকোমল শঙ্কামিশ্রিত সলজ্জ ব্যবহার ও স্বল্পভাষণপ্রিয়তার ফলে অনেকেই তাঁর শক্তির পরিমাপ করে উঠতে পারেননি। স্বরূপ-নির্ণয় তো দূরের কথা। কিন্তু ভুল করেননি স্বামী বিবেকানন্দ—

১০, ১১ অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান পৃঃ ৪, ৫, ৬

১২ পৃঃ ২৬

১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।১১।২

১৪ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ১১৮

শ্রীরামকৃষ্ণদৃষ্টিতে সে-বোধ ছিল অভ্রান্ত। 'রাজা' নাম তাঁরই দেওয়া। প্রথমাবধি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের পুরো দায়িত্ব 'রাজা'কেই দিয়েছেন। তিনি পত্রে লিখেছিলেন, 'রাখাল ঠাকুরের ভালবাসার জিনিস – একথা ভুলো না।'

নবনীত অপেক্ষা কোমল রাখালরাজকে সুকঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল। যে-অধ্যাত্ম-সম্পদ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহচর্যে কেবল তাঁরই প্রসাদে লাভ করেছিলেন—সে-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য তাঁর তপস্যাও কঠোর ছিল। এখানেও দেখি বাহ্যতঃ তাঁকে একান্ত নিরীহ যেন সংসারের কোন তাপ, সুকোমল শরীরে কোনও কঠোরতাই তিনি সইতে পারবেন না—তাই একান্ত দীনভাবে শান্তমনে সর্বদা জপ করে চলেছেন কিন্তু বস্তুতঃ তাঁর মানসিক সংগ্রাম ছিল সর্বাপেক্ষা তীব্র। অতুল সম্পদের অধিকারী পিতা আনন্দমোহন ঘোষ তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বরাহনগর মঠে আসছেন—আত্মীয়-স্বজনের সকরুণ আহ্বান, অতুল সম্পদের আকর্ষণ স্বভাবকোমল তাঁর মনে যে সংক্ষোভের সৃষ্টি ক'রত তা বলাই বাহুল্য। অপর দিকে এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিয়োগ-ব্যথা ও স্বাভাবিক ঈশ্বরপ্রেম তাঁর চিত্তকে ব্যাকুল করে সর্বদা ঈশ্বরমুখীন করে রেখেছিল। সে-সময়কার তীব্র ব্যাকুলতা ও বিষয়-বৈরাগ্য শ্রীজগন্নাথ-স্তোত্রের অতুলনীয় ভাষায় ব্যক্ত করা চলে :

"ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥[১৫]

নাহি চাহি রাজ্য আমি কনক-মাণিক্য-বিভব,
নাহি চাহি রম্যা সকল-জন-কাম্যা বরবধূ।
লীলা যাহার করেন গীত প্রমথপতি শিব
যাচি সেই জগন্নাথ কৃষ্ণের দরশন শুধু ॥

ভগবান তথাগতের গৃহত্যাগের সঙ্গে কতই না মিল। অপার বৈরাগ্যের সুমহৎ কঠোরতা নিয়ে রাখালরাজ সংসারের আকর্ষণে অবিচলিত ছিলেন। সে-তপস্যার বহ্নিতেই রাখালরাজের নবরূপায়ণ হল স্বামী ব্রহ্মানন্দে। 'আপূর্যমাণ-মচলপ্রতিষ্ঠম্'—সমুদ্রের মত সকল সংবেগ ধারণ করে তিনি ধীর স্থির গম্ভীর অন্তর্মুখ। এই অচলপ্রতিষ্ঠা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গুণ। মঠ-মিশনের নানা বাধা-বিঘ্ন-সঙ্কটের মধ্যেও তিনি পরমনিশ্চিন্ত বালক—সদা মাতৃমুখাপেক্ষী। সহস্র কর্মের আবর্তমধ্যে নিত্যস্থৈর্যের এই মূর্তিই তো আদর্শ কর্মযোগীর মূর্তি! মঠময় আপন আনন্দে বিচরণ করছেন—এমন সুমধুর কোমল বালকের মত সে-মুখকমল যে, যে দেখত সেই-ই অবাক হয়ে যেত—অথচ নবগঠিত সঙ্ঘের কর্ণধার তিনি; আর পরস্পরবিরোধী বহু ভাবসংঘাতে সে-সময়টা ছিল সঙ্ঘের পক্ষে পরীক্ষার—কিন্তু সে-'রাজবুদ্ধি'র অনায়াস প্রভাবের সম্মুখে সকলে মাথা নত করেছিল।

মানব-চরিত্র বুঝবার সূক্ষ্মদৃষ্টির পাঠটুকু নিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে, আর সে-কৌতুক-রস-প্রিয়তা—'রসে বশে থাকবার' শিক্ষা, 'অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে' কাজ করার দীক্ষা, —সর্বোপরি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুপম বাল্য-মিশ্রিত গাম্ভীর্য, যা যে-কোনও বিরোধিতা অনায়াসে বিগলিত করে সপ্রেম আনন্দস্পন্দনে আকর্ষণ ক'রে আপনার করে নিত। 'বাল্যগাম্ভীর্যভাব মিশ্রিত করিবে'[১৬]—পত্রে লিখেছিলেন স্বামীজী। এই সেই 'বাল্য-মিশ্রিত গাম্ভীর্য'—যা আপনার ক'রত

---

১৫ স্তবকুসুমাঞ্জলি পৃঃ ২৭১

১৬ বাণী ও রচনা ৭ম খণ্ড (১ম সংস্করণ) পৃঃ ১৯৯

কিন্তু কেউ সীমালঙ্ঘন করতে সাহসী হত না।

মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঠাকুর, 'মা, আমার তো সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে একটি শুদ্ধ-ভক্ত ছেলে আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও'।[১৭] আবার, 'মা, একজনকে সঙ্গী করে দাও—আমার মত'।[১৮] সন্তান ভিন্ন মা হয় কি? তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-মাতৃভাবে সন্তান ব্রহ্মানন্দের প্রয়োজন আর সে-সন্তান হবে তাঁরই মত। সত্তা সংক্রমিত হয় বলেই সন্তান। আমরা দেখব শ্রীরামকৃষ্ণ-সত্তা তাঁতে—শরীরে মানসিকতায় সত্যনিষ্ঠায়, কৌতুকে ভাব-সম্পদে শ্রীরামকৃষ্ণের অংশ ব্রহ্মানন্দ—'আত্মার আত্মীয়, ত্যাগী মানসপুত্র'। এই ঐক্যই কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্যে বিশদ করার চেষ্টা করা যাচ্ছে:

"'একি রোদ্দুরে সে তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে—এসেছো শরীর সারাতে, রদ্দুরে বেরুলে কেন? কোথায় থাও? কাল থেকে মঠ হতেই প্রসাদ পাবে। কি খেতে ভালবাস। আর মা, আমরা সাধু সন্ন্যাসী ফকীর—কি বা এখানে পাওয়া যায়!' এমনি আরও কত কথা! আমি ত একেবারে অবাক—একি সাধু! পরম গৃহী, পরম মায়াজীবীও যে তাঁর ছেলেমেয়ের জন্য এমন উতলা হন না! কে আমি? — সমাজের কোন্ স্তরে আমার স্থান—কত—কত নিম্নে—ঘৃণা আর অবজ্ঞা ছাড়া জগতের কাছে যার প্রাপ্য আর কিছুই নেই—না বন্ধু, না পিতা, না আত্মীয়,—এত বড় সংসারটা—এ যেন একটা পরের বাড়ী। ··· চোখের জল রাখিতে পারিলাম না—সারা জীবনের আক্ষেপ যেন অশ্রুধারার সঙ্গে সঙ্গে গলিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল! মনে হইল, এই ত জুড়াবার স্থান, এই ত এমন একজন দরদী আছেন—যাঁর কাছে আমি পতিতা নই, অস্পৃশ্যা নই, ঘৃণিতা নই।"[১৯]—লিখেছেন শ্রীতারাসুন্দরী দাসী।

'শ্রীগোকুল'* লিখেছেন মহারাজের বহুমুখী ভাবের সুন্দর চিত্র এঁকে: 'যিনি প্রভুর ন্যায় কর্তব্যপালনে শিষ্যকে কঠোর আজ্ঞা দিতেছেন, তিনি আবার কেমন করিয়া তাহারি সহিত বালকের ন্যায় সামান্য কারণে ফষ্টি নষ্টি করিয়া আনন্দ করিতেছেন, তাহা বুঝা কঠিন। যিনি গম্ভীরভাবে 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা' উপলব্ধি করিয়া পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর উপর বীতরাগ হইয়াছেন তিনি কেমন করিয়া শাক, কচু, মূলা, বেগুন প্রভৃতি তরকারির কথা কহিয়া তাহাদের উপকারিতা বুঝাইতেছেন তাহা ধারণা করা সহজ নহে। ··· কষ্টে দুঃখে ভক্তদের জন্য জননীর মত তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, ... স্বাস্থ্যভঙ্গে বা রোগে তিনি সুবিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসককেও পরাজিত করিয়া ভক্তদের আহার-বিহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ··· ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বেশী বলিতেন না—অল্প দু-একটি কথা যাহা বলিতেন, তাহা ব্যক্তিগতভাবেই বলিতেন এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তাহা যথেষ্ট হইত। ··· মিষ্ট সুরে বালকের ব্যাকুলতায় ভগবানের স্তব আমি আর কোথাও শুনি নাই।··· নাটক-রচনার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার দুই-একটি সারগর্ভ উপদেশ লাভ করিয়া আমি ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম মহারাজ এ বিষয়ও কেমন করিয়া আয়ত্ত করিলেন! ··· কোন সময়ে বিবাহের ঘটককে তাহার নিজ কর্মের অনুকূল কথাবার্তা মহারাজকে শিখাইয়া দিতে শুনিয়া আমি হাস্য

---

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।১১।২

১৮ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ২৩

১৯ উদ্বোধন ২৪ বর্ষ, পৃঃ ২৮৪-৫

* অধ্যাপক গোকুলদাস

সংবরণ করিতে পারি নাই। হাস্তরসের সৃজন করিতে তাঁহার মত আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ··· অতি বিচক্ষণ দক্ষ মালীর মত বৃক্ষাদির রোপণ ও তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে মহারাজের কি অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তিরই পরিচয় পাইয়াছি! জীবজন্তু প্রভৃতিরও বিষয়ে ঐরূপ।

'···তাঁহার ন্যায় সুদর্শন মনোহর বাটীর নক্সা প্রস্তুত করাইতে আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিব না···। এইরূপ সাংসারিক এবং পারমার্থিক প্রত্যেক ব্যাপারে মহারাজের বিরাট শক্তি লোকহিতৈষণায় শতধা বিভক্ত হইয়া প্রতিদিন অবিরাম ছুটিত··· তাহাতে ছিল কেবল ··· ভগবদ্ভক্তি, ভালবাসা এবং অহৈতুকী কৃপা।'[২০]

'···কেহ মামলা-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে তাঁহার উপদেশ লইতে আসিয়াছে, তিনি তাহাকে একজন বিজ্ঞ আইনজ্ঞের ন্যায় পরামর্শ দান করিতেছেন···। আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জগতের এরূপ সর্বজ্ঞানসম্পন্ন গুরুভাব তদীয় আচার্য্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত অন্য কোন মানবে আমরা দেখিতে পাই না।'[২১]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যা চাইতেন এবং স্বীয় অননুকরণীয় জীবনে যা করে দেখিয়েছেন তারই প্রকাশ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র ব্রহ্মানন্দজীর জীবনেও দেখতে পাই। মননে ও ব্যবহারে, অনুক্ষণ বিচার করে সামান্য একটি চলন-বলন শুনেই মানুষের সম্বন্ধে যে অভ্রান্ত ধারণা করার ক্ষমতা এবং কারো ভাব না ভেঙ্গে তারই ভাবানুকূল সাধন দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কতই না মিল! একটি উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে:

"শ্রীশ্রীমহারাজ · শিষ্যবর্গকে তাহাদের নিজ নিজ ভাবানুযায়ী—যাহার প্রবল কর্মানুরাগ তাহাকে লোকহিতকর নিষ্কাম কর্মে, যাহার শাস্ত্রানুরাগ তাহাকে শাস্ত্রপাঠে, যাহার ধ্যানজপ বা পূজার্চনায় তাহাকে তাহাতেই উৎসাহ দান করিতেন।"[২২]

লৌকিক জগতে বাপের মত বেটা সর্বক্ষেত্রে হয় না সত্য, কিন্তু এক্ষেত্রে মানস সন্তান উত্তরাধিকার নিয়েই মানস-সন্তানত্ব যে কত সার্থকভাবে সত্য হয়েছে তা বোঝা যাবে যাঁরা পিতা ও পুত্র উভয়কেই দেখেছেন, সঙ্গ করেছেন তাঁদেরই উক্তির আলোকে:

"অতুলচন্দ্র*···বলিলেন 'পরমহংসের কথা—রাখাল তাঁর ছেলে। ছেলে যত বড়ই মূর্খ ও আনাড়ী হোক, বাপের কিছু কিছু গুণ তাতে বর্তায়, রাখালে তাঁর অনেক গুণ বর্তেছে। তোমরা পরমহংসের দেখা পাওনি, তাঁর ছেলেদের দেখে একটা idea পাবে।' গিরিশ বলিলেন, 'দেখ, ঠাকুর বলতেন, এইখানকে এলে গেলেই হবে'। 'এই খানকে' মানে কি জান—তাঁর চিহ্নিত ভক্তদের কাছে।'"[২৩] [ক্রমশঃ]

২০ উদ্বোধন ২৯ বর্ষ পৃঃ ২৭৯ ৮১

২১ শ্রীঅনন্ত লিখিত উদ্বোধন ২৪বর্ষ পৃঃ ২৯৩

২২ শ্রীঅনন্ত লিখিত ঐ ঐ পৃঃ ২৯২

* গিরিশচন্দ্র ঘোষের ছোট ভাই

২৩ শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল লিখিত, উদ্বোধন ২৪ বর্ষ, পৃঃ ৩০৪-৫

পরলোকে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

গভীর দুঃখের বিষয়, গত ৪ঠা ফেব্রুআরি সোমবার সকাল ৬টায় বিশ্ববিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ্ সত্যেন্দ্রনাথ বসু পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র ইত্যাদি ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি হৃদ্‌রোগাক্রান্তও হইয়াছিলেন। গত ২৪শে জানুআরি তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই শোকসংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব ছাত্রছাত্রী ও অনুরাগী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। বেলা ১টা নাগাদ তাঁহার মরদেহ লইয়া একটি শোকযাত্রা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্, বসু বিজ্ঞান মন্দির, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনস্টিটিউট, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ঘুরিয়া কেওড়াতলা মহাশ্মশানে যায় ও রাত্রি সাড়ে নয়টা নাগাদ বৈদ্যুতিক চুল্লীতে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়। পথের দুই পার্শ্বে ও শ্মশানে সহস্র সহস্র নরনারী শোকবিহ্বল শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুআরি কলিকাতায় আচার্য বসুর জন্ম হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মিশ্রগণিতে এম্. এস্‌সি.-তে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। বহুধা বিচিত্র তাঁহার কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: ১৯১৬-২১ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার, ১৯২১-২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার, ১৯২৪-২৫ ম্যাডাম কুরির সহকর্মী, ১৯২৫-২৬ আলবার্ট আইনস্টাইনের সহকর্মী, ১৯২৬-৪৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ১৯৪৫-৪৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ১৯৫২-৫৮ রাজ্য বিধানসভার সদস্য, ১৯৫৬-৫৮ বিশ্বভারতীর উপাচার্য। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে জাতীয় অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করেন এবং 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দেন। ঐ বৎসরই তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

বিজ্ঞানে 'বসু-সংখ্যায়ন' তাঁহার এক অবিস্মরণীয় অবদান। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের ব্যাখ্যা আইনস্টাইন করিয়াছেন বলিয়া উহার 'বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স' নামকরণ হইয়াছে। 'একক ক্ষেত্রতত্ত্বে'ও তাঁহার গবেষণা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তাঁহার প্রতিভার ক্ষেত্র ছিল বহুবিস্তৃত—রসায়ন খনিজতত্ত্ব জীববিদ্যা ভূতত্ত্ব দর্শন চারুকলা সাহিত্য এবং ভাষা। বিজ্ঞান ও বঙ্গভাষার যুগপৎ সেবা তাঁহার এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্ তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।

১৯৭৪-এর প্রারম্ভেই সারা পৃথিবীব্যাপী 'বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানে'র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে পালিত হইতেছে। এই সময় তাঁহার বিয়োগ সত্যই বেদনাদায়ক। তাঁহার দেহান্তে ভারত তথা বিশ্বের বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়

স্বামী প্রভানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সঙ্গে ধর্মসমন্বয় তথা সর্বধর্মসমন্বয় ভাবটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। 'সমন্বয়' শব্দটি শ্রীরামকৃষ্ণের পরবর্তীগণের মনগড়া কিছু নয়, তিনি নিজেই শব্দটি ব্যবহার করতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের পিতাকে বলছেন, 'যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে, আমি কিন্তু দেখি সব এক।'[১] আবার তিনি ঈশান মুখোপাধ্যায়কে বলছেন, 'আর সেই সমন্বয়ের কথা? সব মত দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়।'[২] প্রকৃতপক্ষে সমন্বয়ের ভাবাদর্শ তাঁর জীবন ও বাণীতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি বলতেন, 'একঘেয়ে হোস্ নি, একঘেয়ে হওয়া এখানকার ভাব নয়', 'আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব।'

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি সুন্দর তৈলচিত্র। ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র জনৈক সুদক্ষ শিল্পীকে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের ভাবটি ছবিতে তুলে ধরেন। ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে দেখাচ্ছেন, বিভিন্ন পথ দিয়ে সব ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছেন। গন্তব্যস্থান এক, শুধু পথ আলাদা। তৈলচিত্রটি নন্দ বসুর বাড়ীতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন, "...ওর ভিতর সবই আছে।—ইদানীং ভাব।"[৩]

ধর্মসমন্বয়-ভাবটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মধ্যে একটা আকস্মিক সংযোজন নয়। সমন্বয়ের ভাবাদর্শ তাঁর জীবনে অনুস্যূত, তাঁর বরদ বরদ জীবনরসে পরিপুষ্ট। 'তিনি কারও ভাব কদাচ নষ্ট করেননি, সমদর্শিতাই তাঁর ভাব।[৪] সকল মত-পথের সঙ্গে অবিরোধে অবস্থিত তাঁর যে সর্বাবগাহী ভাবাদর্শ তা সার্বভৌম, সেই কারণে তিনি 'সমন্বয়াচার্য'। তাঁর জীবনে সকল ধর্মের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত, সেই কারণে তিনি 'সর্বধর্মস্বরূপ'। মানবকল্যাণে নিয়োজিত সকল ভাবের মিলনসাগর তাঁর চরিত্র, সেই কারণে তিনি 'সর্বভাবস্বরূপ'[৫] তাঁর জীবন ও বাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেখানে মন মুখ এক। লাল-ফিতে পাড় ধুতি, বনাতের কোট বা মোলস্কিনের চাদর, মোজা ও কালো বার্নিশ করা চটিজুতা, কখনও বা কানঢাকা টুপি ও গলাবন্ধ পরিহিত 'পরমহংস' দেখে অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবান ব্যক্তিমাত্রই তাঁর পূতসঙ্গলাভ করে দেখেছেন তাঁর মধ্যে কখনও ভাবের ঘরে চুরি ছিল না। তাঁর প্রচারিত বাণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ তাঁর জীবন। তাঁর জীবনবৃক্ষে কখনই কোন বিরোধ বাসা বাঁধতে পারেনি, সর্বভাবসমন্বিত সুসংহত তাঁর জীবন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়-ভাবটি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন: 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা, ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা'।[৬] অধ্যাত্মজগতের সেরা ভাবাদর্শগুলি 'সূত্রে মণিগণা ইব' একত্রে গেঁথে শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ মালাখানি আপন

---

১ কথামৃত ৪।১৫।১
২ ঐ ৫।৮।১
৩ ঐ ৩।১৮।২
৪ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৯।৬৮
৫ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'সমন্বয়াচার্য,' 'সর্বধর্মস্বরূপ,' আর স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন, 'সর্বভাবস্বরূপ'।
৬ উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৪২,

গলায় পরেছেন। অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি মহা-মিলনের প্রতীক। তাঁর জীবন মিলনের পীঠস্থান। তাঁর বাণীতে ধ্বনিত মিলনের সুর। সেই কারণে তাঁর জীবন ও বাণী এত মাধুর্যময়, সকল দেশের সকল কালের মানুষকে এত আকৃষ্ট করে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেছেন, 'এই যে ইনি (পরমহংসদেব) যা বলেন, তা অত অন্তরে লাগে কেন ? এঁর সব ধর্ম দেখা আছে হিঁদু মুসলমান খৃষ্টান শাক্ত বৈষ্ণব এসব ইনি নিজে করে দেখেছেন। মধুকর নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবেই চাকৃটি বেশ হয়।'[৭]

'ধর্মসমন্বয়' কথাটির দু'টি পক্ষ। ধর্ম কাকে বলে—এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিয়েছেন, শাস্ত্র-শরিয়তে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরণের সংজ্ঞা। কণাদ বলেন, 'যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ'। ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধন, সর্বোপরি ত্রিতাপ হতে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তির পথ নির্দেশ করে ধর্ম। জৈমিনি বলেন, 'চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ'। অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত আচার পালন ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ হতে নিবৃত্তিই ধর্ম, যা আচরিত হলে মানুষের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে উন্নত জীবনযাপনের জন্য প্রেরণা, হেয়-উপাদেয় বোধ ও কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা জাগে। আবার পতঞ্জলি বলেন, পাঁচটি যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এবং পাঁচটি নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—এই দশটির পালনই ধর্ম। আবার ধর্মবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে, বোঝা যায় যে ধর্ম জগৎসংসারকে ধারণ করে আছে। মহাভারতকার বলেন, 'ধারণাদ্ধর্ম ইত্যাহুঃ ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ'। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানুষ ধর্মপথ অবলম্বন করে চলে, কারণ সে জানে 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ'। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে ধর্মসম্বন্ধে যে সংজ্ঞাগুলি পাওয়া যায় তাদের সবগুলিকে উপর্যুক্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আবার ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিতও হয়েছে। বর্তমানের **Encyclopaedia Britannica** একটি সর্বজন-গ্রাহ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন, '**Religion is man's relation to that which he regards as holy**' অর্থাৎ মানুষ যা পবিত্র মনে করে, তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কই হচ্ছে ধর্ম। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের মতে ধর্ম হচ্ছে গীতোক্ত 'সাত্ত্বিক সুখলাভের সর্বমানবসাধারণ উপায়'।[৮]

দ্বিতীয়তঃ সমন্বয় শব্দটির অর্থ কি ? তর্কের কূটজালের মধ্যে না প্রবেশ করেও বলা যেতে পারে সমন্বয় বোঝায় সঙ্গতি, সামঞ্জস্য, অবিরোধ, মিলন, ধারাবাহিক কার্যকারণ সম্বন্ধ। সেই সঙ্গে বোঝা দরকার যে সমন্বয় মানে সমীকরণ, সদৃশী-করণ বা একজাতীয়করণ নয়। বৈচিত্র্যময় ধর্ম-সকলের বিবাদ-বিসংবাদ, বিদ্বেষ-বিভেদ দূর করে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করাই ধর্মসমন্বয়ের লক্ষ্য।

এত রকমের ধর্মমত কেন ? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছেন, 'কি জানো, রুচিভেদ, আর যার যা পেটে সয়। তিনি নানা ধর্ম, নানা মত করেছেন—অধিকারী বিশেষের জন্য। ··· মা ছেলেদের জন্য বাড়ীতে মাছ এনেছেন। সেই মাছে ঝোল, অম্বল, ভাজা আবার পোলাও, করলেন। সকলের পেটে কিছু পোলাও সয় না; তাই কারু কারু জন্য মাছের ঝোল করেছেন,—তারা পেটরোগা। আবার কারু সাধ অম্বল খায়, বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা—আবার অধিকারী ভেদ।'[৯] এক এক জাতীয় রুচি-বুদ্ধি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানুষ এক একটি

---

৭ কথামৃত, ৪।২৮।১ ৮ 'পরমহংসদেবের ধর্মসমন্বয়ের একদিক', উদ্বোধন, ৩৯।৬২ ৯ কথামৃত ৩।৮।৫

দার্শনিক মতবাদ, এক একটি সাধনপদ্ধতি এবং সাধনানুকূল এক এক প্রকার আচার অনুষ্ঠান আশ্রয় করেছে। স্থান কাল ভেদে এই বৈচিত্র্য বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য মতবাদ, অগণিত সাধনপদ্ধতি, বহুধা বিচিত্র বিধি-নিষেধ, আচার-অনুষ্ঠান—এদের রক্ষণাবেক্ষণ পুষ্টি-সাধনের জন্য গড়ে উঠেছে নানা ধর্মসম্প্রদায়; গড়ে উঠেছে মন্দির-মসজিদ-গীর্জা; সৃষ্টি হয়েছে পাদ্রী-পুরোহিত-মোল্লা সম্প্রদায়; লেখা হয়েছে শাস্ত্র-শরিয়ৎ-স্ক্রিপচারস্। মতবাদের অনৈক্য ও আচারবিচারের বৈষম্যের সঙ্গে অধিকার-ভোগের আকাঙ্ক্ষা ধর্মসেবীদের প্রায়ই অধর্মের পথে প্ররোচিত করেছে। সাম্প্রদায়িক ধর্মনেতাদের উস্কানিতে সাধারণ মানুষ ভুলে বসে, '…সমগ্র ধর্মভাব অপরোক্ষানুভূতিতেই কেন্দ্রীভূত। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মানুষকে দেবতা হইতে হইবে। মন্দির, প্রার্থনাগৃহ, দেব-বিগ্রহ বা ধর্মশাস্ত্র—সবই মানুষের ধর্মজীবনের প্রাথমিক অবলম্বন ও সহায়ক মাত্র; তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে'।[১০] ধর্মচেতনার উন্মেষের সহায়ক মাত্র যাবতীয় শাস্ত্র-শরিয়ৎ, মন্দির-গীর্জা, আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ। এদের বৈষম্য থেকে কালে উপস্থিত হয়েছে বিরোধ, অনৈক্য থেকে সন্দিগ্ধতা, সঙ্কীর্ণতা থেকে দলাদলি। শকুন উঁচুতে উড়ে, মন পড়ে থাকে ভাগাড়ে। তেমনি স্বার্থান্বেষী ধর্মধ্বজীদের মুখে মহান তত্ত্বকথা আর আচরণে বিভেদ-বঞ্চনা, মারামারি, হানাহানি! স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মসভায় তাঁর প্রথম ভাষণেই বলেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই সকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত।[১১] মানুষের মন থেকে সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, ধর্মোন্মত্ততা প্রভৃতি পিশাচ দূর করে হৃদয়বেদীতে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম-সমন্বয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ আন্তর্ধর্মসমন্বয় সাধন করেছিলেন, আবার ধর্মে ধর্মে যে বিরোধ তার নিষ্পত্তি করে সর্বধর্মসমন্বয় করেছিলেন। সেই সময় হিন্দুধর্ম অন্তর্বিরোধে শতধা-বিভক্ত। হিন্দুসমাজ ভোগাধিকারতারতম্যে দুর্বল পঙ্গু। সগুণবাদ ও নির্গুণবাদ, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, স্বর্গবাদ ও মোক্ষবাদ, ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদ, কৃপাবাদ ও পুরুষকারবাদ—সে সময়ে বিবদমান এই বাদ-সকলের সংঘাতে সনাতন হিন্দুধর্ম জর্জরিত। সনাতন হিন্দুধর্মের ভিতরের বিরোধ ও বৈষম্যের গভীর অরণ্য ভেদ করে অগ্রসর হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বললেন, 'যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা হ'লে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন, বলা যায়না।'[১২] 'কালীই ব্রহ্ম, কালী নির্গুণা, আবার সগুণা, অরূপ আবার অনন্তরূপিণী'। তিনি দেখালেন, 'দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। … উহারা পরস্পর-বিরোধী নহে, কিন্তু মানব-মনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থাসাপেক্ষ।[১৩] শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিষ।– তবে একজন বলছে 'জল', আর একজন 'জলের খানিকটা চাপ'।"[১৪]

[ক্রমশঃ]

১০ বাণী ও রচনা, ১।২৪
১১ ঐ ১।১০
১২ কথামৃত ২।২।৫

১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ২।২১
১৪ কথামৃত, ৪।২৪।৮

সমালোচনা

নারদীয় ভক্তিসূত্র : স্বামী প্রভবানন্দ কর্তৃক রচিত এবং ক্রিস্টোফার ঈশারউডের ভূমিকা সংবলিত। অনুবাদক : শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ। উদ্বোধন কার্যালয় : ১৬৩ পৃষ্ঠা : মূল্য—সাধারণ সংস্করণ ৫.০০, শোভন সংস্করণ ৭.৫০।

গ্রন্থখানি স্বামী প্রভবানন্দের সুপরিচিত গ্রন্থ Narada's Way of Divine Love-এর বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ-গ্রন্থের সমালোচনা দুই দিক দিয়ে করা যায় : মূল গ্রন্থের পর্যালোচনা এবং অনুবাদের গুণবিচার। বর্তমান ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের বিবরণ দিয়েই সমালোচনা শুরু করা যেতে পারে। বলেছি, মূল গ্রন্থখানি সুপরিচিত। তবুও কিন্তু ইংরেজীতে লেখা বলে বাঙালী পাঠকের কাছে বিশেষ পরিচিত নয়। এমন কি নারদ সম্বন্ধেও সাধারণ পাঠকের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। অনেকেই নারদকে জানেন এমন একজন ঋষি বলে যিনি স্বর্গ ও মর্তে নিয়ত গতায়াত করে থাকেন এবং যাঁর ভূমিকা মোটামুটি বার্তাবহেরই মত। আর প্রবাদে তিনি কলহের দেবতা নামেও খ্যাত। মোটকথা, দেবর্ষি নারদ যে ভক্তিসূত্রের প্রণেতা তা অনেকেরই জানা নেই। নারদের এই পরিচয়ই হল গ্রন্থখানির উপক্রমণিকা। তারপর ন'টি পরিচ্ছেদে ভক্তিসূত্রের (সংখ্যায় ৮৪) ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে আছে 'পরাভক্তি'র সংজ্ঞা। এখানে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলিতে নারদ ভক্তিযোগের সঙ্গে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং রাজযোগও সংযুক্ত করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নামকরণ করা হয়েছে 'ত্যাগ ও শরণাগতি'। সূত্রগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় হল 'বাসনাপূরণের জন্য ভক্তিকে ব্যবহার করা চলে না' এবং ত্যাগের অর্থ 'সকল প্রকার কর্ম ঈশ্বরে উৎসর্গীকরণ'। অবশ্য আধ্যাত্মিক জীবন ঈশ্বরে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রবাক্যও মেনে চলতে হবে। তারপর 'দেশ জলপ্লাবিত হ'লে যেমন জলাধারের আর প্রয়োজন থাকে না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বেদের কোন প্রয়োজন নেই'। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিচার করা হয়েছে ভক্তির লক্ষণ : 'যখন সকল চিন্তা, সকল কথা ও সকল কর্ম ইষ্টপদে সমর্পণ করা হয়, যখন ক্ষণেকের জন্য ইষ্টকে ভুলিলে অবস্থা শোচনীয় হয়, তখন ভক্তির সঞ্চার হয়।" (ভক্তিসূত্র ১৯।) চতুর্থ পরিচ্ছেদে মানব-জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নারদের মতে, পরাভক্তিই শ্রেষ্ঠতম সাধনমার্গ, কারণ পরাভক্তির পরিণতি হল ব্রহ্মসংযোগ। বস্তুত 'পরাভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান এক ও অভিন্ন'। পঞ্চম পরিচ্ছেদে পরাভক্তিলাভের পথনির্দেশ করা হয়েছে : ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় এবং তার প্রতি আসক্তিও ত্যাগ, অনন্যচিত্ত হয়ে ঈশ্বরচিন্তায় ব্যাপৃত হওয়া, মহাপুরুষের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য এবং মহাপুরুষের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়। এর থেকেই এসে পড়েছে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত সূত্রাবলী—সৎসঙ্গ ও প্রার্থনা। মাত্র তিনিই মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন যিনি কর্মফল ও স্বার্থপ্রসূত সকল কর্মকে ত্যাগ করে দ্বন্দ্বাতীত হতে সমর্থ হন। (ভক্তিসূত্র ৪৮।) সপ্তম পরিচ্ছেদে পরাভক্তির প্রকৃতি ব্যাখ্যা, অষ্টম পরিচ্ছেদে ভগবৎপ্রেমের স্বরূপ বর্ণনা এবং শেষ বা নবম পরিচ্ছেদে নৈতিক ধর্ম ও ভগবৎ-পূজা-

সম্পর্কিত সূত্রসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

স্বামী প্রভবানন্দ নারদীয় সূত্রের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাতেই তাঁর কাজ শেষ করেননি; প্রতিটি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সদৃশ ধারণা, উক্তি ইত্যাদিও উপস্থাপিত করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গী বা catholicity কোন ক্রমেই সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং 'নারদীয় ভক্তিসূত্র'কে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত করা চলে। কবি পোপ সখেদে বলেছিলেন: "প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশেষ ধর্মাবলম্বীরা ঘোষণা করেন যে স্বর্গের চাবিকাঠিটি মাত্র তাঁদেরই হাতে।" 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' যেন এই ঘোষণারই প্রতিবাদ। যেমন: "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ—তাঁরা হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান বা ইহুদী যে ধর্মমতের লোকই হোন না কেন- চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে তাঁদের অন্তরের উপলব্ধি একরূপ।" (৩২ পৃষ্ঠা।)

গ্রন্থখানির মুখবন্ধে স্বামী প্রভবানন্দ বলেছেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও তাঁর শিষ্যগণের দিব্য-জীবন থেকে আমি ভক্তিসূত্রের এই ব্যাখ্যা রচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছি।...ঐ সকল দেবমানবের (শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণের) জীবনে—সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে নারদকর্তৃক বর্ণিত ভগবদ্জ্ঞান ও ভক্তি কি ভাবে প্রকটিত হয়েছিল—তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি ও প্রমাণ পেয়েছি যে, নারদের উপদেশাবলী বর্তমান যুগেও সমভাবে প্রযোজ্য।' এ ক্ষেত্রে ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্তানগণ যে একটু বেশী জায়গা জুড়ে থাকবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? এই কারণে আবার ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের যে সমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণে হয়েছে তার পর্যাপ্ত পরিচয়ও গ্রন্থখানিতে পাওয়া যায়।

অনুবাদের দিক দিয়ে প্রকাশকের উক্তিই উদ্ধৃত করে বলা যায়: "শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ ক'রে দিয়ে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।" এখানে 'আমাদের' বলতে প্রকাশন-কর্তৃপক্ষকে না বুঝিয়ে এই ধরনের গ্রন্থে আগ্রহী সকল পাঠককেই বোঝাচ্ছি। অনুবাদ সর্বক্ষেত্রে আক্ষরিক না হলেও মূল ভাব কোথাও ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। অনুবাদকের ভাষা অতি প্রাঞ্জল, অসঙ্গতি যদিও থাকে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তবে যতি চিহ্ন ব্যবহারে কিছু কিছু ত্রুটি নজরে পড়ে। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এ ত্রুটিও দূর হবে। প্রকাশক মহাশয় তাঁর নিবেদনে লিখেছেন: "গ্রন্থটি ভক্ত-জনের নিকট সমাদৃত হ'লে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।" উক্তিটি একটু পরিবর্তিত করে বলতে পারি: গ্রন্থটি ধর্মপিপাসুর পানীয়রূপে গণ্য হলে সকলেরই শ্রম সার্থক হবে।

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

A Few Zoroastrian Fundamentals: Dr. Jal K. Wadia. গ্রন্থকার কর্তৃক ২৭৫ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৩৬।

প্রচারের জন্য প্রকাশিত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা-খানিতে জরাথুস্ত্র কর্তৃক প্রবর্তিত অগ্নি-উপাসনা-মূলক ধর্মের মৌল বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষুদ্র হলেও পুস্তিকাখানি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায়ে আছে তিনটি প্রাচীন প্রার্থনার পরিচয়। চতুর্থ অধ্যায়ে অগ্নি-উপাসনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পঞ্চম বা শেষ অধ্যায়ে জরাথুস্ত্রীয় ধর্মের দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা অপনয়নের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের মধ্যে লেখকের আর একটি ছোট নিবন্ধ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

পুস্তিকাখানি পাঠ করলে জরাথুস্ত্রীয় ধর্ম সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। তা ছাড়া যাঁরা যোগাভ্যাস করতে চান তাঁরাও প্রথমপাঠের সন্ধান পুস্তিকাখানি থেকে পাবেন।

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীমৎ স্বামী শান্তানন্দজীর মহাপ্রয়াণ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ১৭ই জানুআরি, বৃহস্পতিবার সকাল ৮-২১ মিনিটে দক্ষিণ কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্বামী শান্তানন্দজী মহারাজ মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩, বেলুড় মঠে তিনি সহসা বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির বৃদ্ধিহেতু প্রস্রাবের অবরোধ ঘটায় ঐদিন তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসায় কষ্টের উপশম হইলেও বুকে সর্দি বসিয়া রোগীর অবস্থা জটিল হইয়া পড়িলে শ্বাসনালীতে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। ক্রমে রোগ চিকিৎসকদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় এবং তাঁহার দেহান্ত ঘটে। হাসপাতালে ২৪ দিন থাকাকালীন সমস্ত রোগযন্ত্রণা তিনি শান্তভাবে সহ্য করিয়াছেন—নিদারুণ দৈহিক কষ্টের মধ্যেও বলিয়াছেন, তাঁহার কোনও কষ্ট নাই। অন্তিম দিনেও মধুর কণ্ঠে 'মা' 'মা' এই মহানাম বারংবার উচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর হইয়াছিল।

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শেষ কৃত্যের জন্য নীত হইবার পূর্বে তাঁহার মরদেহ উত্তর কলিকাতায় বাগবাজারে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী'তে বেলা প্রায় বারোটার সময়ে আনয়ন করা হয়। যে বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণবন্দনা ও সেবা করিবার বিরল সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল, তীর্থীকৃত সেই পূত বাটীতে মাতৃচরণে অন্তিম শ্রদ্ধানিবেদন করিতে তাঁহার মরদেহ আনীত হইল এবং শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদী নির্মাল্য ধারণ করিয়া ধন্য হইল, ইহা জগন্মাতার অপার সন্তানবাৎসল্যের নিদর্শন, সন্দেহ নাই।

স্বামী শান্তানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল খগেন্দ্রনাথ মল্লিক। হাওড়া শহরের উপকণ্ঠে কাসুন্দিয়াতে ১২৯০ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। ধর্মশীলা জননীর সদ্‌গুণরাজি বালক খগেন্দ্রনাথকে বিশেষ প্রভাবিত করে। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে তাঁহার ভক্তিমতী জননীই তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি এবং সতীর্থ জিতেন্দ্রনাথ (উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের অষ্টম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ) দক্ষিণেশ্বরে, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে ও কথামৃতকার 'শ্রীম'র নিকট যাতায়াত করিতেন। ক্রমে তাঁহারা শ্রীমা সারদাদেবীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে আর এক বন্ধু (উত্তরকালে স্বামী গিরিজানন্দ) সহ তাঁহারা শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ লইয়া পরিব্রাজকের জীবন অবলম্বন করিতে সংকল্প করেন এবং জয়রামবাটী রওনা হন। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট গৈরিক বস্ত্রলাভ করিয়া এবং তাঁহার অমোঘ আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া, তাঁহারই নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহারা পদব্রজে

বারাণসীধামে উপনীত হন এবং স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-নাম প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসরই (১৯০৭ খৃষ্টাব্দ) স্বামী শান্তানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের শাখাকেন্দ্র কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অছি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির সদস্য নির্বাচিত হন এবং শেষ পর্যন্ত এ দুই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৮ খৃ: হইতে ছয় বৎসর কাল তিনি কাশী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ ১০।১১ বৎসর তিনি বেলুড় মঠেই অতিবাহিত করেন।

যদিও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর সমসাময়িক ছিলেন, শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ বা সহাধ্যক্ষ পদের দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার বহন করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। ফলে তাঁহার দীক্ষিত কোনও সন্তান ছিল না। কিন্তু অসংখ্য অনুরাগী ভক্ত সুদীর্ঘকাল তাঁহার নিকট হইতে সাধন ভজন সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশ পাইয়াছে। বেলুড় মঠে স্বল্পায়তন তাঁহার কক্ষটিতে ধর্মগ্রন্থ-পাঠ ও ভগবৎ-প্রসঙ্গের বিরাম ছিল না। সকলেরই তিনি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

উপনিষদের আদেশ, 'শান্ত উপাসীত'— শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে— শান্তানন্দজী সারাজীবন অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে কর্মোন্মাদনা না থাকিলেও কর্মে অপ্রীতি ছিল না। বহু যুবককে তিনি ত্যাগব্রত অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণসংঘে যোগদান করিয়া—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' কর্ম করিতে প্রেরণা দিয়াছেন। সংঘকে তিনি একটি মহান আশ্রয় বলিয়া গণ্য করিতেন এবং তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যোগদান করিয়াছে।

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-গ্রন্থের উভয় ভাগেই শ্রীশ্রীমায়ের সহিত তাঁহার কথোপকথন লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহার তিরোভাবের ত্রয়োদশ দিবসে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত করিয়াছেন; তাহা হইতে তাঁহার সরল অনাড়ম্বর তপস্যাপূত ধ্যাননিষ্ঠ জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

দেহপিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ আজ নির্মুক্ত—অসীম অখণ্ড চিদাকাশে তাহার স্বচ্ছন্দ অবাধ গতি!

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ : পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের ১১২ তম জন্মতিথি গত ২৯শে পৌষ, ১৩৮০ (১৪ ১.'৭৪) পুণ্য কৃষ্ণা-সপ্তমী, সোমবারে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি. বেদপাঠ, পূজা, হোম ভজন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ. কালীকীর্তন, বিবেকানন্দ লীলাগীতি এবং আলোচনা-সভা উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রভাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে ছাত্র-ও ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া নানাবিধ বাদ্য, সঙ্গীত ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে মঠের মন্দির প্রদক্ষিণ করে। মধ্যাহ্নে প্রায় বিশ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ী প্রসাদ দেওয়া হয়।

বৈকালে স্বামী গম্ভীরানন্দের পৌরোহিত্যে আয়োজিত উৎসব সভায় অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু ও **Swami Vivekananda in America : New Discoveries,** এবং **Swami Vivekananda, His Second Visit to the West : New Discoveries,** এই দুই বৃহদায়তন গবেষণা-গ্রন্থের প্রসিদ্ধ লেখিকা মেরী লুই বার্ক ভাষণ দেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মেরী লুই বার্কের ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ করিয়া শোনান।

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নানাবর্ণের ভক্তের আগমন-সম্পর্কিত দিব্যদৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া মেরী লুই বার্কের আগমন প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই বাণী পূর্ণ হইতেছে এবং যুগ যুগ ধরিয়া এমনিভাবে নানাবর্ণের নানাজাতির ভক্ত আসিবে। আর এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শ্রেষ্ঠ সন্তান প্রেরিত হইয়াছিল তাঁহাদের কাছে।

তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বামীজী কি দিতে চেয়েছিলেন সে-সম্পর্কে নিবেদিতা বলেছেন, তিনি যখন ছিলেন না, তখনও হিন্দুধর্ম ছিল, ছিল তাঁর মহান সত্যসমূহ ও সর্বধর্মমতে বিশ্বাস, কিন্তু এযুগে তিনি যদি না আসতেন তবে, সম্প্রদায়ে বিভক্ত, পরস্পর-প্রতিযোগী ও আপাতবিরোধী হিন্দুধর্মের সত্যসমূহকে একসূত্রে গ্রথিত করে হিন্দুধর্মের সমগ্ররূপকে জগতের সামনে কে তুলে ধরতেন?' তাই তাঁকে নব-শঙ্করাচার্য বলেছিলেন লোকমান্য তিলক। অধ্যাপক Ghurye-এর মতে সন্ন্যাসিসম্প্রদায়কে শঙ্করাচার্যের সময় থেকে এ যাবৎ যদি কেউ বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পেরে থাকেন তবে তা একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ। সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়কে নব চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ ক'রে পরিচালিত করারূপ বিরাট অবদান স্বামীজীরই।

'ভারতে যে জাতীয়তা-বোধ এনেছিলেন স্বামীজী তা কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়। আত্মচেতনার বোধি থেকে তাঁর আহ্বান মানুষের আত্মসম্মান বোধকে জাগ্রত করেছে। আর সেকালে যখন আমরা আমাদের জাতিকে ঘৃণা করে পাশ কাটিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম—তখন স্বামীজীই প্রথম জাতিকে গ্রহণ করেছিলেন, ভালবেসেছিলেন, বলেছিলেন—যদি তোমরা ডোব, তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে ডুবব। তিনি জাতিকে দিয়েছিলেন মহাবীর্যের শিক্ষা—মৃত্যুর অধিকার। তাঁর শিষ্যরা বলতেন, তিনি তাঁদের মৃত্যুকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন। তাঁরা পেয়েছেন অনন্ত জীবন—জীবন ও মৃত্যুকে এক করে দেখতে তিনিই শিখিয়েছিলেন। তিনি জাতিকে দিয়েছিলেন ত্যাগের ভাষা, আত্মবলি-দানের ভাষা। বিবেকানন্দের জীবন পাঠ করলে আমরা সব পাব—সাহিত্য শিল্পচেতনা জীবন-বোধ, সর্বোপরি ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়; তিনি কী না বলেছেন!

'যখন আমরা বিবেক থেকে দূরে চলে যাই, তখন আমরা হারিয়ে যাই—আমাদের ফিরে

যেতে হবে বিবেকানন্দের মধ্যে।'

পরিশেষে বক্তা স্বামীজীর আশ্চর্য পরিবর্তন, ভারত পরিভ্রমণ ও বিদেশে বক্তৃতাদির প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের অপ্রকাশিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন।

মেরী লুই বার্ক বলেন, 'আমাদের মনে হয়, স্বামীজী যেমন প্রাচ্যের তেমনি পাশ্চাত্যের। কতবার তিনি বলেছেন—আমি সারা জগতের। একদা তিনি বলেছেন, শ্রীবুদ্ধের যেমন প্রাচ্যের জন্য বাণী ছিল, তেমনি আমারও একটি বাণী আছে পাশ্চাত্যের জন্য।

'পাশ্চাত্যবাসী যখন স্বামীজীকে ভাবে তখন তাঁর সব কিছুই তাদের কাছে গ্রহণীয় মনে হয়। কারণ স্বামীজীর কোন কিছুই তাদের ধারণার বাইরে নয়। তাঁর মানবিকতা, উদারতা, সহনশীলতা, সব মতের প্রতি শ্রদ্ধা—এসবই আমাদের ঐতিহ্যগত. স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে তা গভীরতা লাভ করেছে।

'মানুষের আত্মশক্তি-উদ্বোধনে তাঁর বাণীর সঙ্গে আমেরিকাবাসীর অন্তরের ঐক্য রয়েছে। খৃষ্টধর্মের পাপবাদের প্রসঙ্গে স্বামীজী যখনই বলতেন—'পাপী ?—তোমরা পাপী নও, অমৃতের সন্তান। মানুষকে 'পাপী' বলাই পাপ'—তখনই তিনি অভিনন্দিত হতেন, কারণ ঐ পাপবাদ আমেরিকানরা কখনও প্রাণের সঙ্গে গ্রহণ করেনি।

'স্বামীজীর চিন্তার যুক্তিশীলতা ও অলৌকিকতার প্রতি অবজ্ঞাও আমেরিকাবাসীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। এমার্সনপ্রমুখ মনীষীদের চিন্তাধারার ফলেও স্বামীজীর আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। পরবর্তী স্বামীজীদের বেদান্তপ্রচারের দ্বারাও তিনি আমেরিকাবাসীর নিকট আপনজন হিসাবে গৃহীত হচ্ছেন।

'আমেরিকার সর্বস্তরের মানুষ প্রভূত পার্থিব সম্পদ ভোগ করেছে, কিন্তু তৃপ্তি পায়নি। প্রথম দিকে পাশ্চাত্যের লোকেরা বুঝতে পারেনি কত বড় একটি অধ্যাত্মশক্তির আধার, মহামানব সেদেশে এসেছিলেন—এখন ক্রমেই তাঁরা বুঝতে পারছেন, বিশেষতঃ গত দশ বছরে স্বামীজীর অধ্যাত্ম আদর্শে তাঁদের শ্রদ্ধা খুব বেড়ে গেছে। সুখভোগের সঙ্গে অতৃপ্তির ধারণাও তীব্রতরভাবে তাদের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। তাই তাঁরা যোগ, ভক্তি, ধ্যান, জ্ঞান প্রভৃতি ভারতীয় সাধন-ধারার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় ধর্ম- ও দর্শন-চর্চাও বেড়ে গেছে। বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয় ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ তাঁকে আধুনিক আমেরিকাবাসীদের প্রিয় নেতা করে তুলেছে।

'আমেরিকাবাসী বিবেকানন্দের ভক্তেরা অনুভব করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিকতার নবজাগরণ এসেছে তার সঙ্গে বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক সমুন্নতির লৌকিক দিকটি সংযুক্ত হলে জগতের ভাববিপ্লব সুসম্পূর্ণ হবে।'

সভাপতির ভাষণে স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন, "স্বামীজী রাজনৈতিক ছিলেন না একথা তিনি স্বয়ং বলে গেছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রচারক। তিনি চেয়েছিলেন, আকাশের মত সর্বব্যাপক উদারতা ও সমুদ্রের গভীরতা। ধর্ম-সমন্বয়ই এই উদারতা। সমন্বয় মানে সম্যক্ অন্বয়—যেখানে যত কিছু ভাল আছে তা এক জায়গায় করা নয়। উদারতা ও গভীরতা উভয় দিক তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে, পরে তা বিশেষভাবে প্রচার করেছিলেন। আজকের দিনের জটিল জীবন-যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশেষ পথের কথা সাধারণভাবে বলা চলে না। তিনি বলেছেন, যার নিজ চরিত্রে জ্ঞান ভক্তি কর্ম ও যোগ সমন্বিত হয়নি তার চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-মুদ্রায় উত্তমরূপে

ব্যক্ত হয়নি। মানুষের ভেতর এই চার প্রকারের ভাব খেলে বলে মানুষকে টুকরো টুকরো করা যায় না—এসব মিলিয়েই সমগ্র ব্যক্তিসত্তা—এই সমন্বিত-রূপই স্বাভাবিক সাধনার ধারা।

এই উদারতার সঙ্গে চাই গভীরতা। সত্যিকারের বোধ হওয়া চাই, ভগবানকে চাই-ই চাই। এই অকপট প্রত্যয় থাকলে তবে, যে কোন অবস্থায় যে কোন বৃত্তিতে তাঁকে ডাকা চলবে। তিনি যদি সর্বব্যাপী হন, তবে মন্দিরে মসজিদেই তাঁকে পাওয়া যাবে, কলকারখানায়, চাষার ক্ষেত-খামারেই বা পাওয়া যাবে না কেন? একারণেই স্বামীজী কার্যে পরিণত বেদান্তের কথা বলেছেন। একথাটিই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন 'চোখ বুজলে আছেন আর চোখ চাইলেই নাই!' ধ্যানকালেই তিনি থাকবেন, অন্য সময় নেই হয়ে যাবেন? তা তো নয়। মানুষকে লড়াই করে বাঁচতে হবে; যদি বলা হয় ধ্যান না করলে, মন্দিরে না গেলে হবে না—তবে. খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য কোন পথনির্দেশ তো হল না! তাই এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এ-ধরণের লোকও ধর্ম লাভ করতে পারে। চাই উদারতা ও গভীরতা। ওদেশে গিয়ে ধর্ম-ব্যাধ ও জনক ঋষির কথা বলেছেন কেবল সন্ন্যাসের কথাই বলেননি। কি করে জগতের সকলে ইহজীবনে ভগবানকে লাভ করতে পারে তা বলেছেন—সমস্ত মানুষকেই মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

তিনি চেয়েছিলেন সৌভ্রাত্র। বলেছিলেন—যদি স্বাধীনতা, মুক্তি চাও তো কেবল নিজের জন্য ভাবা দুর্বলতা। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ', অপরের কথা যত ভাববে—নিজেকে যত ভুলে যাবে ভগবানের সঙ্গে ততই এক হতে পারবে—ততই মুক্তির পথে এগিয়ে যাবে। তাই তাঁর দৃষ্টিতে খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান নেই, আছে শুধু আত্মা—সেই এক ব্রহ্ম। সাধনার ভেতর দিয়ে এই দৃষ্টি আনতে হবে—কথার কথা এটি নয়।

"মানুষ মানে, মানে হুঁশ—আত্মসম্মানের প্রতি সত্যিকারের দৃষ্টি। স্বামীজী প্রার্থনা শিখিয়েছেন—'মা, আমায় মানুষ কর'। এই 'মানুষ' হওয়া বর্তমান যুগের মানসিকতা নয়। এ হচ্ছে আত্মার একত্ববোধ আর তাতেই সৌভ্রাত্র আসবে। এই সত্য তিনি প্রত্যক্ষও করেছিলেন, যখন দেখেছিলেন একজন আফ্রিকান নিগ্রো—আগে যারা হয়তো মানুষের মাংস খেত—আমেরিকায় সুন্দর বক্তৃতা করলেন;—বুঝলেন আত্মা এক. শাস্ত্র তো সত্যিই বলেছে। তিনি ধ্যানে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক আত্মা আর বাইরের বিকাশেও তাই দেখলেন। চোখ বুজেও দেখেছিলেন, চোখ মেলেও তাই দেখলেন। হাঁ, এক। নর—নারায়ণ সর্বক্ষেত্রে। এই নর-নারায়ণের সেবার কথাই তিনি বর্তমান যুগের উপযোগী করে প্রচার করেছিলেন।"

সমাপ্তি-সংগীতের মাধ্যমে সভার কার্য শেষ হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভক্তের সমাগমে সভাটি বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল।

কল্পতরু উৎসব

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুর: শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্ত্য-লীলাভূমি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গত ১লা জানুআরি, ১৯৭৬ হইতে তিন দিন ধরিয়া কল্পতরু উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, পূজা, পাঠ ও ব্যাখ্যান, কথকতা, ভজন, ভাষণ, রামায়ণগান, কালী-ও কৃষ্ণ-কীর্তন, বাউলগান, এবং যাত্রাভিনয়ে হাজার হাজার ভক্ত নর-নারী যোগদান করাতে উৎসব আনন্দময় হইয়াছিল।

সর্বশ্রী ভূপেন চক্রবর্তী, প্রতাপ রায়, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, নির্মল মুখোপাধ্যায়, সত্যেশ্বর

মুখোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধরঞ্জন দে প্রমুখ বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পিগণ আকর্ষণীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 'রসরঙ্গ' 'দীনসঙ্ঘ', 'ভবতারিণী সঙ্ঘ' ও 'রহড়া বালকাশ্রম' প্রভৃতি উৎসবে অংশগ্রহণ করিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন স্বামী কৈলাসানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ ও শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার।

পদাবলী-কীর্তন, বাউলগান, পল্লীগীতি, ভক্তিসংগীত, 'নদের পাগল' যাত্রাভিনয় ও ভাষণ বিশেষ হৃদয়গ্রাহী ও উপভোগ্য হইয়াছিল।

১লা জানুআরিতে প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ী প্রসাদ পান। প্রতিদিন প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার ভক্ত-সমাগমে উৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামী সারদানন্দজীর জন্মোৎসব

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার: গত ১৬ই পৌষ, ১৩৮০, ইংরাজী ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩, সোমবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর শুভ জন্মতিথি মঙ্গলারতি, পূজা, হোম, চণ্ডীপারায়ণ, জীবনী-আলোচনা ও ভজনাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে ও উদ্বোধন কার্যালয়ের নবনির্মিত ভবনে পালিত হয়। বেলা ১০টায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা করেন। সমাগত ভক্তগণকে হাতে হাতে খিচুড়ী প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর প্রায় দুই শতাধিক ভক্তের এক সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর পুণ্যজীবনকথা আলোচনা করেন। বহু সাধু ও ভক্তের আগমনে ও ভজনসংগীতে উৎসব অধ্যাত্মভাবমণ্ডিত শান্তশ্রী ধারণ করে।

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭২-৭৩ সালের কার্যবিবরণী:

(৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পঠিত **গভর্নিং বডির** প্রতিবেদনের বঙ্গানুবাদ)

"বন্ধুগণ, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় রামকৃষ্ণ মিশনের আর একটি সার্থক সেবাকর্মময় বৎসর অতিক্রান্ত হইল। বিগত বৎসরগুলির অত্যধিক চাপ ও পরিশ্রমের পর ১৯৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ ছিল এবং ভারত ও ভারতেতর দেশসমূহে আমাদিগের কার্যসকল সংহত করিতে সহায়ক হইয়াছিল। পূর্ব বৎসরেই জানানো হইয়াছিল যে মূলতঃ ত্রাণ-ও পুনর্বাসন-কর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশে আমাদের কেন্দ্রগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারা গিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন অদ্যাবধি যত ত্রাণ-ও পুনর্বাসন-কার্য করিয়াছে তাহাদের মধ্যে বৃহত্তম ঐ কার্যটি এখনও বিপুল আকারে করা হইতেছে। যদিও তুলনা করা সর্বদাই অপ্রীতিকর, তথাপি দীর্ঘকালব্যাপী এইরূপ ত্রাণ-কার্যে নিরত অন্য কোনও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের কথা এখনও শোনা যায় নাই। এইরূপ বিরাট কর্মে আমরা সহায়তা পাইয়াছি কানাডার ইউনিটেরিয়ান সার্ভিস কমিটি, নূতন দিল্লিস্থিত বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি, ভারতীয় রেড ক্রশ সমিতি, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, ভারত ও বাংলাদেশের দুইটি সরকারের এবং জনসাধারণের নিকট হইতে। বস্তুতপক্ষে মিশন বিদেশে এই সর্বপ্রথম এত বিরাট আকারের ত্রাণ-কার্য পরিচালনা করিল। সম্ভবতঃ এই কার্য কোন না কোন আকারে আরো দুই বৎসর ধরিয়া চলিবে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের কেন্দ্রগুলি প্রবল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও স্থায়ীভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভারতে : অরুণাচল প্রদেশে নরোত্তমনগরে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রটির কর্ম দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতেছে : একটি ছাত্রাবাসের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে ও একটি বিদ্যালয়-নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। কনখল সেবাশ্রমে একটি নূতন প্রার্থনা-গৃহের উদ্বোধন করা হইয়াছে। মায়লাপুরের (মাদ্রাজ) ছাত্রাবাসে একটি নূতন 'স্টাডিহল' (পাঠগৃহ) খোলা হইয়াছে ; কলিকাতা সেবা-প্রতিষ্ঠানে সাততলা ব্লকটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উৎসর্গ করা হইয়াছে এবং নূতন ওয়ার্ড-সমূহ খোলা হইয়াছে ; আলং-এর বিদ্যালয়ে একটি নূতন অংশ সংযোজিত হইয়াছে। শ্রীলঙ্কায় : বাটিকলোয়াতে আশ্রমিক ও অনাথ ছাত্রদের আবাস-হিসাবে একটি নূতন বাড়ী নির্মিত হইয়াছে। বাংলাদেশে : ঢাকায় গ্রন্থাগার ও সভাগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হইয়াছে।

সদস্য ও কর্মকর্তৃগণ

পরিচালক সমিতি বা গভর্নিং বডির সদস্য এবং তাহার কর্মকর্তৃগণ পূর্ববৎসরের মতই ছিলেন। ১৯৭৩ সনের মার্চের শেষে মিশনের গৃহী ও সন্ন্যাসী সদস্য ছিলেন যথাক্রমে ৩৫৬ ও ৩৬৭ জন।

মিশনের তিনজন গৃহী ও এগারজন সন্ন্যাসী সদস্যের পরলোকগমনের সংবাদ আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যাবলী

১৯৭৩ সনের মার্চ মাসে বেলুড় মঠস্থিত প্রধান কার্যালয় ব্যতীত মিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল ৭৪টি শাখাকেন্দ্র, তন্মধ্যে বাংলাদেশে ৭টি, ব্রহ্মদেশ, ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা ও মরিসাসে একটি করিয়া এবং বাকী ৬১টি ভারতে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রামকৃষ্ণ মঠের প্রধান কার্যালয় ব্যতীত ভারতে ও বিদেশে মোট ৬৪টি মঠকেন্দ্র আছে এবং উহাদের কার্যবিবরণী এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক আচরিত ও উপস্থাপিত এবং স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও স্বীয় জীবনে প্রদর্শিত বেদান্তভিত্তিক নিষ্কাম সেবাই ছিল মিশনের কর্মক্ষেত্র। এই সেবাপ্রচেষ্টাকে মোটা-মুটি পাঁচটি বিভাগে ভাগ করা যায়—(১) ত্রাণ, (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের প্রচার এবং (৫) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনহিতকর কার্য।

ত্রাণকার্য : মিশন-পরিচালিত পূর্ববঙ্গের ব্যাপক উদ্বাস্তু-ত্রাণকার্যটি ১৯৭২ সনের ফেব্রু-আরিতে বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হয়। দুর্গত জনগণের এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনরত উদ্বাস্তুদের সেবা ও পুনর্বাসনই ছিল বাংলাদেশে মিশনের প্রধান কাজ। মিশন এই সেবাকার্য পরিচালনা করেন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বাগেরহাট, দিনাজপুর, ফরিদপুর, বরিশাল ও শ্রীহট্টস্থিত মঠ ও মিশন কেন্দ্র-গুলির মাধ্যমে। বেলুড় মঠস্থিত প্রধান কার্যালয়ের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে একটি স্বতন্ত্র সেবাকেন্দ্র খুলনা জেলার কুমারখালিতে সেবাকার্য পরিচালনা করে। ১৯৭২ সনের জানুআরি মাসে যশোহর ও খুলনায় দুইটি অস্থায়ী আশ্রয় শিবির পরিচালিত হয়। সর্বসাকল্যে, ৩,০৩,৬৯৮টি পরিবারের প্রায় ১২,১৫,৮৫০ জনকে ৩১.৩.৭৩ তারিখ পর্যন্ত নানাপ্রকার সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল। মোট খরচ হয় ৩১,৫২,৪২৮.২৫ টাকা। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সূত্র হইতে দানরূপে প্রাপ্ত নানাবিধ সামগ্রী দুঃস্থ লোকদের মধ্যে বিতরিত হয়। বিতরিত দ্রব্যের মূল্য এক কোটি টাকারও বেশী হইবে।

ভারতেও মিশনের শাখাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে নিম্নোক্ত নানাবিধ সেবাকার্য পরিচালিত হয়, তাহাতে মোট ২,৬৬,৭৫৯.২২ টাকা খরচ হয়

এবং প্রায় ৯,০০০ পরিবারের ২১,০০০ জন গ্রহীতা উপকৃত হয়: (১) বোম্বাই, নরেন্দ্রপুর ও রাঁচি কর্তৃক খরাত্রাণকার্য, (২) বোম্বাই, মাদ্রাজ, সেলম ও মালদহ কর্তৃক বন্যাত্রাণকার্য, (৩) বোম্বাই কর্তৃক আদিবাসীদের মধ্যে চিকিৎসা-কার্য, (৪) শিলচর কর্তৃক উদ্বাস্তু-ত্রাণকার্য। এতদ্ব্যতীত, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ ও রাজকোট মঠকেন্দ্র যথাক্রমে খরা, অগ্নি ও দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকার্য পরিচালনা করে।

শাখাকেন্দ্রগুলি যে স্বকীয় অঞ্চলে দরিদ্রদের নগদ অর্থ ও দ্রব্যাদি নিয়মিত সাহায্যরূপে দান করিয়াছে, তাহা এখানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেলুড় মঠস্থিত প্রধান কার্যালয় ৯৬টি পরিবার এবং ১৪০ জন ছাত্রকে নিয়মিত এবং ১৯১টি পরিবার ও ১৮ জন ছাত্রকে সাময়িকভাবে সাহায্য দান করিয়াছে, এবং এই কার্যে মোট ২১,৬৭৫.১১ টাকা খরচ হইয়াছে। ১১১টি পোশাক-পরিচ্ছদ, ৫৫টি কম্বল, ৪ খানি গরম চাদর এবং ৯১ খানি ধুতি ও শাড়ি দুঃস্থদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

চিকিৎসা: জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে রোগীদের সেবার জন্য ভারতস্থ অধিকাংশ মিশন কেন্দ্র কতকগুলি ইন্‌ডোর হাসপাতাল ও আউটডোর ডিসপেন্‌সারি পরিচালনা করে। আলোচ্য বর্ষে মিশনের আটটি হাসপাতালের ১,৫৫২টি ইনডোর শয্যায় ২৪,০৬৫ জন রোগী চিকিৎসিত হন। ৪৯টি আউট্‌ডোর ডিসপেন্‌সারিতে মোট ৩৫,৮৬,৪৮৬ জন রোগী চিকিৎসিত হন। রাঁচি হাসপাতাল এবং নিউদিল্লীস্থিত করলবাগের পর্যবেক্ষণ-শয্যাগুলিতে শুধু যক্ষ্মারোগীদের পরিচর্যা করা হয়। কলিকাতাস্থিত সেবাপ্রতিষ্ঠান অন্যান্য বিভাগ ছাড়াও একটি শুশ্রূষা ও ধাত্রীবিদ্যাশিক্ষণ শিক্ষালয় যথারীতি পরিচালনা করিয়াছে। ইহাতে 'সাহায্যকারী' ও 'সাধারণ' এই দুই শাখাতে মোট শিক্ষার্থিনীদের সংখ্যা ছিল ২১০।

মঠকেন্দ্রগুলির ৩২৬টি শয্যাসমন্বিত ৫টি ইন্‌ডোর হাসপাতালে ১০,৯৭৪ জন এবং ১৫টি আউট্‌ডোর ডিস্‌পেনসারিতে ৫,২৬,০২৯ জন রোগী চিকিৎসিত ও প্রায় ৩০ জন শুশ্রূষাকারিণী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

শিক্ষা: আলোচ্য বর্ষে মিশন পরিচালনা করিয়াছে: ৫টি সাধারণ কলেজ, ২টি বি. টি. কলেজ, ১টি স্নাতকোত্তর বেসিক্ ট্রেনিং কলেজ, ৪টি জুনিয়র বেসিক্ ট্রেনিং ইনস্টিট্যুট, ২টি বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ১টি শরীরশিক্ষা কলেজ, ১টি গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষাকলেজ, ১টি কৃষিশিক্ষা বিদ্যালয়, ২টি ইন্‌জিনিয়ারিং স্কুল, ১৫টি টেকনিক্যাল ও শিল্প বিদ্যালয়, ৭৯টি বিদ্যার্থী ভবন, ছাত্রাবাস ও অনাথাশ্রম, ৩৪টি বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৫টি অন্যান্য স্তরের বিদ্যালয়, ৬৪টি প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র, ১টি নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, ১টি অন্ধবালকদের শিক্ষা-নিকেতন, ১টি ভাষাশিক্ষা বিদ্যালয়, এবং ১টি মানবিকতা শিক্ষায়তন। এই সকল প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৫,৯৫২; তন্মধ্যে ছাত্র ৪৯,৬৩৭ এবং ছাত্রী ১৬,৩১৫ জন। মঠকেন্দ্রের পরিচালনাধীন বিশটি বিদ্যালয়ে ও বিদ্যার্থিভবনে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫,৭৪১।

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার:

এই কর্মবিভাগে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার পাঠাগার, সাময়িক প্রদর্শনী, উৎসবাদি, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে চিত্রপ্রদর্শন, নিয়মিত ক্লাস ও সেমিনারগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েকটি কেন্দ্রের প্রকাশন-বিভাগের কথাও উল্লেখ্য। এই সম্পর্কে কলিকাতার ইনস্টিট্যুট অব কালচার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মঠকেন্দ্র-সমূহের দ্বারা পরিচালিত বহু সংখ্যক বৃহৎ পুস্তক প্রকাশন-কেন্দ্র, মন্দির এবং আয়োজিত বক্তৃতা-

আলোচনাদির মাধ্যমে প্রচার-কার্যের বিষয় আমরা এই স্থলে উল্লেখ করি নাই।

গ্রামে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে সেবাকার্য : স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারানুযায়ী মিশন তাহার সীমিত সঙ্গতি ও লোকশক্তির সহায়ে ভারতের বিভিন্ন অংশের গ্রাম ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে দরিদ্র ও অনুন্নতদের মধ্যে যথাসাধ্য সেবাকার্য করিয়াছে। মিশনের চিকিৎসা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও অনগ্রসর লোকের সেবা করা হয়। একের পর এক ক্ষিপ্র গতিতে যে-সকল ত্রাণকার্য পরিচালিত হয়, ঐগুলি দুঃস্থ ও অনুন্নত জনগণের সাহায্যার্থেই করা হয় এবং বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলি সহস্র সহস্র লোককে জীবনের যে উচ্চতর ভাব ও আদর্শসমূহের সংস্পর্শে আনে দুঃখকষ্ট ও বিপর্যয়ের মধ্যে তাহা তাহাদের খুব কাজে লাগে। গ্রামাঞ্চলে সেবাকার্য সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, কমপক্ষে দশটি বৃহৎ কেন্দ্র গ্রামে ও উপজাতিদের অঞ্চলে অবস্থিত। তাহাদের ও অন্যান্য পৌর কেন্দ্রগুলির দ্বারা ১৪৯টি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়, তন্মধ্যে ৮টি বহুমুখী, ২টি মাধ্যমিক. ৩৯টি উচ্চ বেসিক, নিম্ন বেসিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ইংরেজী, ৩৮টি নিম্ন প্রাথমিক ও ৮২টি প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষর কেন্দ্র, ১৩টি দাতব্য ঔষধালয়, ১টি ভ্রাম্যমাণ সহ ২৩টি গ্রন্থাগার, ১০৩টি দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র, ৭টি চলচ্চিত্রের ইউনিট. ৯টি কম্যুনিটি সেণ্টার, ৭টি কারিগরি শিক্ষণ-কেন্দ্র, ১টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক-শিক্ষণ কেন্দ্র। এতদ্ব্যতীত শিলং ও লখনউ কেন্দ্রপরিচালিত এলোপ্যাথিক ভ্রাম্যমাণ ডিস্পেনসারি ২২,৯৮৭ জন রোগীর চিকিৎসা করিয়াছে। রাঁচি আশ্রম পরিচালিত আবাসিক যুব-প্রতিষ্ঠান 'দিব্যায়ন' কৃষি, হাঁস-মুরগী-পালন, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, ইত্যাদি শিক্ষণ-প্রকল্প এবং অন্যান্য নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে উপজাতিদের মধ্যে প্রশংসনীয় সেবাকার্য করিয়াছে। শিলচর আশ্রম কুকী, মিজো ও অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে বহুবিধ জনহিতকর কার্য করিয়াছে। মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি কেন্দ্র এবং অরুণাচল প্রদেশের আলং (সিয়াং) ও নরোত্তমনগর (তিরাপ) কেন্দ্রদ্বয় উদ্যম ও আগ্রহের সহিত শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক ও চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় কার্যাদি করিতেছে। এজন্য উক্ত কেন্দ্রগুলি উপজাতিদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। রায়পুরস্থিত পঞ্চায়তিরাজ শিক্ষণ কেন্দ্র এবং নরেন্দ্রপুরের গ্রামসেবক শিক্ষণ কেন্দ্রের সেবাকার্যও এখানে উল্লেখ্য।

বিদেশে প্রচারকার্য

সিঙ্গাপুর, ফিজি, মরিসাস ও শ্রীলঙ্কার মিশন কেন্দ্রসমূহ মুখ্যত: শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কার্যাদিই করে এবং ব্রহ্মদেশ ও ফ্রান্সের কেন্দ্র সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক কার্যে ব্যাপৃত।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, ইংলণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডস্থিত ১৫টি মঠকেন্দ্রও অনুরূপভাবে কার্য করে।

বাংলাদেশস্থিত ১০টি মঠ ও মিশন কেন্দ্র বর্তমানে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক কার্যের সহিত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কার্য পরিচালনা করিতেছে।

উপসংহার

বন্ধুগণ, উপস্থাপিত কার্যবিবরণী হইতে দেখা যাইবে যে, নানাবিধ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও মিশন বিশ্বাস, সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের সহিত কর্তব্য পালন করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব হইতে যে প্রেরণা আসে, তাহার দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে সরকার ও জনসাধারণের সক্রিয় সহানুভূতি ও সাহায্য, এবং আপনাদের সহৃদয় সহযোগিতাও অবশ্যই উল্লেখযোগ্য আর এজন্য আমরা সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান আমাদিগকে পথ দেখাইয়া ভবিষ্যতে সুষ্ঠুভাবে কর্তব্যপালনে সাহায্য করুন,—এই প্রার্থনা।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগের সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী অজেয়ানন্দ গত ৭ই জানুআরি অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৭৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। উহার একমাস পূর্বে জয়রামবাটীতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া তাঁহার উর্বস্থি ভাঙ্গিয়া যায় ও চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হয়। শ্বাস-নালীর শাখাসমূহ ও ফুসফুস্ সংক্রান্ত পীড়ায় তাঁহার অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া ওঠে এবং শ্বাস- ও হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতাহেতু তাঁহার দেহান্ত হয়।

স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া তিনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সংঘে যোগদান করেন ও স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার শেষজীবনের অধিকাংশ সময়ই বেলুড় মঠ ও জয়রামবাটীতে অতিবাহিত হয়।

স্বামী স্বয়ংপ্রভানন্দ গত ২৮শে জানুআরি কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে নিদ্রিত অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই তিনি বার্ধক্যজনিত নানারূপ ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্র-ও সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন।

বহুবিধ ত্রাণমূলক সেবাকার্য পরিচালনা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে রেঙ্গুন, বৃন্দাবন, লখনউ, এলাহাবাদ, শিলং এবং কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক! ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

আঁটপুর : ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দজীর ১১৩তম জন্মোৎসব এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার আটজন গুরুভ্রাতার একসঙ্গে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প-গ্রহণের স্মরণোৎসব আঁটপুরে গত ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩, হইতে দিবসত্রয় ধরিয়া পালিত হয়। বিশেষ পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকথামৃতপাঠ, ধর্মসঙ্গীত, সংকীর্তন, ভজন, গীতি-আলেখ্য, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, যাত্রাভিনয়, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ক্ষমানন্দ, বক্তা ছিলেন স্বামী রমানন্দ। তিথিপূজার দিন প্রেমানন্দ-জীবনী আলোচনা করেন স্বামী চিৎসুখানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীতামসরঞ্জন রায়। স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

বিভিন্ন দিনে সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীঅন্নদা চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়-পরিচালিত ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদ্, গীতচারণ শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীনির্মল বাউল ও সহশিল্পিগণ। শ্রীবঙ্কিম চক্রবর্তী ও শ্রীমতী আরতি লাহার সহ মিলন-মন্দিরের সন্তানদল স্বামীজীর রচনা পাঠ ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের জনশিক্ষা মন্দিরের সৌজন্যে 'রাণী রাসমণি' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং একদিন একটি আশ্রমকর্মিগণের যাত্রা অভিনীত হয়। এ ছাড়া দুইদিন উষাকীর্তন এবং একদিন বিরাট শোভাযাত্রা সমস্ত গ্রামটি পরিক্রমা করে। এই কয়দিনে অন্ততঃ ১০।১২ হাজার নর-নারী পরিতোষসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বারাসত: গত ৫ই পৌষ (২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩) হইতে ছয়দিন ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা, ভজন, শিবমহিম্নঃস্তোত্র পাঠ, বারাসত সরকারী বিদ্যালয়ে রক্ষিত মহাপুরুষ মহারাজের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত কর্তৃক স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জীবন ও উপদেশ আলোচনা এবং পরে 'শিবানন্দ-বাণী'র অখণ্ড পাঠ হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভায় স্বামী কৈলাসানন্দ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী অমৃতত্বানন্দ মহাপুরুষজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরে শ্রীশ্রীরামনামসংকীর্তন ও শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পদাবলীকীর্তন হয়। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে কথামৃতপাঠ, শ্রীঅনন্ত চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়ের শ্রীমা-গীতি-আলেখ্য এবং শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাকীর্তন হয়। তৃতীয় দিন অপরাহ্নে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ অধিকারী ও শ্রীনিশিকান্ত রায় কবিগান করেন। চতুর্থদিন পূর্বাহ্নে কয়েক সহস্র নরনারী ও বালক-বালিকার একটি শোভাযাত্রা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শিবানন্দ মহারাজের প্রতিকৃতি সহ ধর্মসঙ্গীত ও কীর্তন গাহিতে গাহিতে বারাসত শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে। অপরাহ্নে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী নিরাময়ানন্দ, অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী ও শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ ও শিবানন্দ মহারাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সায়াহ্নে রামায়ণগান, কালীকীর্তন ও লোকগীতি হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসদ্বয় সন্ধ্যায় সুরে 'কথামৃত', ভাগবত-উপাখ্যান প্রভাসযজ্ঞ, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন ও নিমাই-সন্ন্যাসকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিন সমবেত নরনারীদের মধ্যে অন্নপ্রসাদ বিতরিত হয়।

নব বারাকপুর: বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের নবনির্মিত গৃহ 'সারদা-ভবন'-এর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে ২রা ডিসেম্বর ১৯৭৩, রবিবার সারাদিনব্যাপী এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রত্যূষে স্তব, প্রার্থনা ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী-পাঠ ছাড়াও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোমের ব্যবস্থা করা হয়। অপরাহ্নে বেদগীতি ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন স্বামী যোগস্থানন্দ। অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী মঙ্গলাচরণ করেন। এই উপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ স্বামী ওঙ্কারানন্দের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করা হয়। সভাশেষে খিচুড়ী প্রসাদ বিতরিত হয়।

খিদিরপুর: গত ১৪ই জানুআরি মনসাতলা লেনে "স্বরবিতান" স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষ্যে 'বিবেক-বন্দনা'-শীর্ষক এক আকর্ষণীয় ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান করে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন এবং স্বামীজী সম্বন্ধে এক উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ দেন।

পরলোকে প্রভাসচন্দ্র সাহা

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ২৩শে নভেম্বর ১৯৭৩, শুক্রবার, রাত্রি প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকার সময় প্রভাসচন্দ্র সাহা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার পৈতৃক ভিটা ছিল আমলাসদরপুর, নদীয়ায় (বাংলাদেশ)। শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের, বিশেষতঃ লাটু মহারাজ ও মাষ্টার মহাশয়-এর পূত সংস্পর্শে আসিবার বিরল সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল। তাঁহার পরলোকগমনে আমরা প্রাচীন ভক্তকুলের একজনকে হারাইলাম।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

[পুনর্মুদ্রণ]

ভগবদ্‌গীতা শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

[মূল, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ গীতার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।—বর্তমান সম্পাদক]

মহাভাষ্যম্।

(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। (ক)

ভাষ্যমূল।

যথৈব হি শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম এবমপশব্দজ্ঞানেঽপ্যধর্ম্মঃ। অথবা ভূয়ানধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াং-সোঽপশব্দা অল্পীয়াংসঃ শব্দাঃ। একৈকস্য হি শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। তদ্ যথা,—গৌরিত্যস্য (খ) গাবীগোণীগোতাগোপোতলিকেত্যেবমাদয়োঽপভ্রংশাঃ (গ)। অথ যোঽবাগ্‌যোগবিদ্ অজ্ঞানং তস্য শরণম্। বিষম উপন্যাসঃ। নাত্যন্তায় অজ্ঞানং শরণং ভবিতুমর্হতি। যোঽজানন্ বৈ ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সুরাং বা পিবেৎ সোঽপি মন্যে পতিতঃ স্যাৎ। এবং তর্হি সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ। কঃ, অবাগ্‌যোগবিদেব।

বঙ্গানুবাদ।

যেরূপ শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম হয়, তদ্রূপ অপশব্দজ্ঞানে অধর্ম্ম আছে। অথবা অধিক অধর্ম্মই উপস্থিত হয়। অপশব্দ অত্যন্ত অধিক, শব্দ অল্প সংখ্যক। এক একটি শব্দের আবার অনেকগুলি অপভ্রংশ শব্দ আছে। যেমন "গো" এই শব্দের গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা (১) ইত্যাদি অপভ্রংশ শব্দ। অথবা যিনি অবাগ্‌যোগবিৎ (অর্থাৎ যিনি শব্দের যথার্থ ব্যবহার জানেন না) অজ্ঞানই তাঁহার আশ্রয়। ইহা বিষম কথা। অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় হইতে পারে না। "যে না জানিয়া ব্রাহ্মণকে হত্যা করে অথবা সুরাপান করে ; সেও পতিত হয়।" "অতএব তবে তিনি অনন্ত জয়লাভ করেন, বাগ্‌যোগবিৎ ব্যক্তি অপশব্দ প্রয়োগ দ্বারা দূষিত হয়েন।" কে ? অবাগ্‌যোগবিদ্ ব্যক্তিই।

---

(১) প্রাকৃত ভাষায় এইগুলির ব্যবহার আছে।

(ক) উদ্বোধন, ৭৫তম বর্ষ, পৃঃ ৩৮৮ দ্রষ্টব্য।—বর্তমান সম্পাদক

(খ) পাঠান্তর : গৌরিত্যস্য শব্দস্য " "

(গ) ঐ : মাদয়ো বহবোঽপভ্রংশাঃ " "

ভাষ্যমূল।

অথ যো বাগ্‌যোগবিদ্ বিজ্ঞানং তস্য শরণম্। ক্ব পুনরিদং পঠিতম্। ভ্রাজা নাম শ্লোকাঃ, কিঞ্চ ভোঃ শ্লোকা অপি প্রমাণম্। কিং চাতঃ। যদি শ্লোকা অপি প্রমাণময়মপি (ক) প্রমাণং ভবিতুমর্হতি।

যদুদুম্বরবর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।
পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎ ক্রতুগতং নয়েৎ॥ ইতি।

প্রমত্তগীত এষ তত্রভবতো যস্ত্বপ্রমত্তগীতস্তৎ প্রমাণম্। যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে।

অবিদ্বাংসঃ। "অবিদ্বাংসঃ প্রত্যভিবাদে নাম্নো যেন প্লুতিং বিদুঃ। কামং তেষু তু বিপ্রোষ্য স্ত্রীষ্বিবায়মহং বদেৎ॥" অভিবাদে স্ত্রীবন্মাভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। অবিদ্বাংসঃ।

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্যক্তি শব্দ প্রয়োগে জ্ঞানসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞানই তাহার আশ্রয় (অর্থাৎ বাগ্‌যোগবিদ্ ব্যক্তি শব্দ ও অপশব্দ এই উভয় জানিয়াই শব্দ প্রয়োগ করেন, অপশব্দ প্রয়োগ করেন না; তিনি জ্ঞান-পূর্ব্বক প্রয়োগ করেন, এই হেতু তিনি অভ্যুদয়ভাগী হয়েন।) কোন স্থলে এই বাক্য পঠিত হইয়াছে? ভ্রাজ নামক শ্লোক আছে তাহাতে, শ্লোকও আপনার প্রমাণ হইবে? ইহা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ? যদি শ্লোকও প্রমাণ হয়, তবে ইহাও প্রমাণ হইবে,—"তাম্রবর্ণ ঘটির (১) অত্যধিক সংখ্যক পান করিলেও স্বর্গলাভ হয় না; তবে, তাহা কেন যজ্ঞগত করা হয় (২)।" ইহা আপনার প্রমত্তবাক্য; যাহা প্রমত্ত বাক্য নহে, তাহা প্রমাণ; (৩) "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে" 'যিনি প্রয়োগ করেন' এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

"অবিদ্বাংসঃ" "বিদ্যাবিহীন ব্যক্তি"—"যাহারা প্রত্যভিবাদন বাক্যে নামের প্লুতস্বর (৪) জানেনা তাহারা বিদ্যাবিহীন, তাহাদিগের সমীপে যেরূপ স্ত্রীলোকের সমীপে বলা হয়, তদ্রূপ "অয়মহম্" "এই আমি" এইরূপ বলিবে (৫)। অভিবাদন বাক্যে স্ত্রীলোকের ন্যায় না হই; এই নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "অবিদ্বাংসঃ" বিদ্যাহীন ব্যক্তি এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

---

(১) ঘটি শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র ঘট। এস্থলে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ঘটি শব্দের অর্থ সুরাপূর্ণ পাত্র বুঝাইতেছে।

(২) এই শ্লোকটি সৌত্রামণিনামকযাগে সুরাপানের দোষ প্রকটিত করিতেছে।

(৩) কাত্যায়নোক্ত ভ্রাজনামক শ্লোক মধ্যে পঠিত "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে"···এই শ্লোকের শ্রুতি প্রমাণ আছে। যথা,—"একঃ শব্দঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ সুষ্ঠুঃ প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্‌ভবতি।" একটী শব্দ সুন্দররূপে জ্ঞাত হইয়া উত্তমরূপে প্রযুক্ত হইলে তাহা স্বর্গলোকে কামবর্ষী হয়। অতএব উক্ত ভ্রাজনামক শ্লোক প্রমত্তবাক্য নহে।

(৪) তিন মাত্রা যুক্ত স্বরকে প্লুতস্বর কহে।

(৫) ইহার নিয়ম "প্রত্যভিবাদেঽশূদ্রে। ৮।২।৮৩।" এই সূত্রে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত আছে।

(ক) পাঠান্তর: অয়মপি শ্লোকঃ—বর্ত্তমান সম্পাদক

ভাষ্যমূল।

বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি "প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্য্যাঃ" ইতি। ন চান্তরেণ ব্যাকরণং প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ শক্যাঃ কর্ত্তুম্। বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি।

বঙ্গানুবাদ।

"বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি"—"বিভক্তি প্রয়োগ করেন।"—যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন, "প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্য্যাঃ।" প্রযাজমন্ত্র সকল বিভক্তিযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিবে। ব্যাকরণ শাস্ত্র ব্যতিরেকে প্রযাজ মন্ত্র সকলকে বিভক্তিযুক্ত করিতে পারা যায় না। "বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি" "বিভক্তি প্রয়োগ করেন।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্যমূল।

যো বা ইমাম্। "যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশো (ক) বাচং বিদধাতি স আর্ত্বিজীনো ভবতি।" আর্ত্বিজীনাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যো বা ইমাম্।

বঙ্গানুবাদ।

"যো বা ইমাম্।" "যিনি এই বাক্যকে পদানুসারে স্বরানুসারে ও বর্ণানুসারে ব্যবহার করেন, তিনি আর্ত্বিজীন অর্থাৎ যাজক বা যজমান হয়েন।" যাজক বা যজমান হইবে, এই নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "যো বা ইমাম্।" "যিনি এই বাক্যকে।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্যমূল।

চত্বারি। "চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ॥" ইতি।

চত্বারি শৃঙ্গাণি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ। ত্রয়ো অস্য পাদাঃ। ত্রয়ঃ কালা ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানাঃ। দ্বে শীর্ষে দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্যশ্চ। সপ্তাহস্তাসো অস্য। সপ্ত বিভক্তয়ঃ। ত্রিধাবদ্ধস্ত্রিষু স্থানেষু বদ্ধ উরসি কণ্ঠে শিরসীতি। বৃষভোবর্ষণাৎ। রোরবীতি শব্দং করোতি। কুত এতদ্? রৌতিঃ শব্দকর্ম্মা। মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশেতি। মহান্ দেবঃ শব্দোমর্ত্ত্যা মরণধর্ম্মাণোমনুষ্যাস্তানাবিবেশ। মহতা দেবেন নঃ সাম্যং যথা স্যাদিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।

বঙ্গানুবাদ।

"চত্বারি।" ("চারি।")—"ইহার চারি শৃঙ্গ, তিন চরণ ও দুই মস্তক। ইহার সপ্ত হস্ত। ত্রিভাগে বদ্ধ, বৃষস্বরূপ, মহান্ দেব শব্দ, রব করিতেছেন এবং মনুষ্যসকলে আবিষ্ট হইতেছেন।"

চারিটি শৃঙ্গ,—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারিপ্রকার পদসমষ্টিই শব্দরূপ বৃষের শৃঙ্গ। তিনটি চরণ, অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই তিন কালই ইহার চরণ। দুই মস্তক,—নিত্য ও কার্য্য (১) এই দুইপ্রকার শব্দ রূপই ইহার দুইটি মস্তক। ইহার সাতটি

(১) যাহা ব্যঙ্গ্য (খ) অর্থাৎ প্রকাশ্য; তাহা নিত্যশব্দ এবং ব্যঞ্জক অর্থাৎ প্রকাশক, তাহা কার্য্যশব্দ।

(ক) পাঠান্তর: অক্ষরশঃ—বর্ত্তমান সম্পাদক

(খ) কৈয়ট, নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি 'ব্যঙ্গ্য' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।—বর্ত্তমান সম্পাদক

হস্ত, সাত প্রকার বিভক্তি—(১) তিন অংশে বদ্ধ—বক্ষোদেশ, শিরোদেশ ও কণ্ঠদেশ এই তিন স্থানে বদ্ধ অর্থাৎ এই তিন স্থান অবলম্বন করিয়াই শব্দসমূহ সমুৎপন্ন হয়, এই কারণ বশতঃই উক্ত তিন প্রকার স্থানই ইহার বন্ধনস্থান।)। বর্ষণ করেন অর্থাৎ অভীষ্ট পূরণ করেন, এই কারণবশতঃই ইহাকে বৃষ কহা যায়। "রোরবীতি" অর্থাৎ শব্দ করেন। কেন, এইরূপ বলিলে? (অর্থাৎ "রোরবীতি" এই পদের অর্থ "শব্দ করেন" এই বাক্য হইল কেন?) রু ধাতু শব্দকর্ম্মক (অর্থাৎ রু ধাতু প্রয়োগ করিলেই শব্দ তাহার কর্ম্মরূপে অন্তর্নিহিত থাকে)। মহান্ দেব মর্ত্ত্যসমূহে আবিষ্ট হইয়াছেন,—মহান্ দেব অর্থাৎ শব্দ, মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণধর্ম্মবিশিষ্ট মনুষ্যসকলে আবিষ্ট অর্থাৎ অবস্থিত আছেন। মহান্দেবের সহিত (২) আমাদিগের যাহাতে সাম্য উপস্থিত হয়, তন্নিমিত্তও ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।

অপর আহ। "চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ। গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥" চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি। চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ। তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ। মনস ঈষিণো মনীষিণঃ। গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি। গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি ন চেষ্টন্তে ন নিমিষন্তীত্যর্থঃ। তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি। তুরীয়ং বা এতদ্বাচোযন্মনুষ্যেষু বর্ত্ততে। চতুর্থমিত্যর্থঃ। চত্বারি।

বঙ্গানুবাদ

অপর কেহ বলেন;—"চারিপ্রকার পদ বাক্যপরিমিত; যে ব্রাহ্মণগণ মনীষী, তাঁহারাই সেই সকলকে অর্থাৎ বাক্যসকলকে জানেন। ইহাদিগের তিনভাগ গুহায় নিহিত আছে, তাহা ঈঙ্গিত (ক) হয় না। মনুষ্যেরা বাক্যের চতুর্থ ভাগ ব্যবহার করে।" চারি প্রকার, বাক্যপরিমিত পদ—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারি প্রকার পদসমষ্টিই বাক্য (৩) যে ব্রাহ্মণগণ মনীষী তাঁহারাই সেই সকলকে জানেন। যাঁহারা মনকে বশীভূত করিয়াছেন তাঁহারাই মনীষী। তিনভাগ গুহায় নিহিত আছে তাহা ঈঙ্গিত (ক) হয় না;—গুহাতে অজ্ঞানেতে তিনভাগ নিহিত রহিয়াছে, তাহা ঈঙ্গিত (ক) হয় না, কার্য্যকারী হয় না অর্থাৎ প্রকাশিত হয় না। মনুষ্যেরা বাক্যের

---

(১) সাত প্রকার বিভক্তি; যথা,—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

(২) এই স্থলে ভাষ্যপ্রদীপকার কৈয়ট "মহান্ দেব" ইহার অর্থ পরমব্রহ্ম বলিয়াছেন।

(৩) মূলে আছে,—"বাক্‌পরিমিতা পদানি।" "বাক্‌পরিমিতা" এইটি বৈদিক প্রয়োগ। লৌকিক ভাষায় এই স্থলে 'বাক্‌পরিমিতানি' এইরূপ প্রয়োগ হইবে। এই স্থলে কৈয়ট পরিমিত শব্দের অর্থ পরিচ্ছিন্ন বলিয়াছেন। অতএব "চারি প্রকার পদ বাক্‌পরিমিত।" অর্থাৎ চারি প্রকার পদসমষ্টিই বাক্য।

(ক) 'ইঙ্গিত' হওয়াই বাঞ্ছনীয়—বর্ত্তমান সম্পাদক

চতুর্থ ভাগ ব্যবহার করে;—"মনুষ্যলোকে যাহা আছে; ইহার বাক্যের তুরীয় অংশ আছে (১)।" (ক) তুরীয় অর্থ চতুর্থ। "চত্বারি।" "চারি।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্যমূল।

উতত্বঃ।—"উতত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচ-

মুতত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।

উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে

জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥"

অপি খল্বেকঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি বাচম্, অপি খল্বেকঃ শৃণ্বন্নপি ন শৃণোত্যেনামিতি। অবিদ্বাংসমাহার্দ্ধম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে তন্বং বিবৃণুতে। জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ। তদ্‌যথা জায়া পত্যে কাময়মানা সুবাসাঃ স্বমাত্মানং বিবৃণুতে। এবং বাগ্ বাগ্‌বিদে স্বমাত্মানং বিবৃণুতে। বাঙ্‌নো বিবৃণুয়াদাত্মানমিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। উতত্বঃ।

বঙ্গানুবাদ।

"উতত্বঃ।" ("অন্য এক ব্যক্তি।") অন্য এক ব্যক্তি বাক্যকে দেখিয়াও দেখেন না (অর্থাৎ প্রত্যক্ষে শব্দের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াও অর্থজ্ঞানের অভাবে বোধগম্য করিতে পারেন না।) অপর কোন ব্যক্তি শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করেন না (অর্থাৎ অর্থজ্ঞানের অভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না।) এই অর্দ্ধ ঋক্ বিদ্যা বিহীন ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা হইল। পতিলাভার্থিনী জায়া যেমন সুবস্ত্রে ভূষিত হইয়া নিজের আত্মাকে বরণ করে (দান করে) তদ্রূপ, বাগ্‌দেবী অপর এক ব্যক্তিকে অর্থাৎ বাগ্‌বিদ্ ব্যক্তিকে নিজ আত্মা বরণ করেন। বাগ্‌দেবী আমাদিগকে নিজ আত্মা বরণ করুন, (দান করুন) এই নিমিত্তও ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "উতত্বঃ।" ("অপর এক ব্যক্তি।") এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইত।

ভাষ্যমূল।

সক্তুমিব।—"সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো

যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।

অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে

ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি॥"

সক্তুঃ সচতের্দ্ধাবো ভবতি কসতের্বা বিপরীতাদ্বিকসিতো ভবতি। তিতউ পরিপবনং ভবতি। ততবদ্বা তুন্নবদ্বা। ধীরা ধ্যানবন্তো মনসা প্রজ্ঞানেন বাচমক্রত অকুর্বত। অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে। ক এষ দুর্গো মার্গঃ। একগম্যো বাগ্‌বিষয়ঃ। কে পুনস্তে? বৈয়াকরণাঃ। কুত

(১) "তুরীয়ং বা এতদ্বাচো যন্মনুষ্যেষু বর্ত্ততে।" এইটি শ্রুতি। ইহা প্রামাণ্যের নিমিত্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা "তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।" ইহার ব্যাখ্যা নহে।

(ক) 'মনুষ্যলোকে যাহা আছে, তাহা বাক্যের তুরীয় অংশ'—এইরূপ অনুবাদ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

—বর্তমান সম্পাদক

এতৎ ? ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি। এষাং বাচি ভদ্রা লক্ষ্মীর্নিহিতা ভবতি। লক্ষ্মীর্লক্ষণাদ্ভাসনাৎ পরিবৃঢ়া ভবতি। সক্তুমিব।

বঙ্গানুবাদ।

তিতউ দ্বারা অর্থাৎ কুলা বা চালনী দ্বারা সক্তুর ন্যায় (অর্থাৎ যেমন মনুষ্যগণ কুলা বা চালনী দ্বারা সক্তুকে পবিত্র অর্থাৎ তুষাদিবিহীন করিয়া লয়, তদ্রূপ) ধীর ব্যক্তিগণ যাহাতে মনের দ্বারা বাক্যকে পবিত্র করিয়া ব্যবহার করেন। ইহাতে সাধুগণ সখ্য জানেন। ইহাদিগের বাক্যে ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলকারিণী লক্ষ্মী নিহিত আছেন। সচ্ ধাতুর সক্তু দুর্ধাব্য অর্থাৎ দুঃশোধ্য হয় (অর্থাৎ 'সক্তু', এই শব্দটী সচ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিলে, "সচ্" ধাতুর অর্থ সেচন করা, যাহাকে সেচন করিতে হয় অর্থাৎ বিশেষ প্রকারে শোধন করিতে হয়, তাহা সক্তু।))। বিপরীত কস্ ধাতুর বিকসিত অর্থাৎ প্রস্ফুটিত হয় (স্থল বিশেষে বর্ণ সকলের ব্যত্যয় হয়; যেমন—হিন্স্ ধাতু হইতে 'সিংহ' এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়; তদ্রূপ, 'কস্' ধাতুর বর্ণ ব্যত্যয় হইলে 'সক্' হয়, অনন্তর 'সক্তু' এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সক্তু এই শব্দটি 'কস্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় বলিলে, যাহা বিকসিত হয় অর্থাৎ ক্লেশ স্বীকার করিলে পরিষ্কৃত করা যায়, অসাধ্য নহে, তাহা সক্তু।)। পরিপবনকে অর্থাৎ যাহা দ্বারা সক্তু, তণ্ডুল প্রভৃতিকে পরিপূত অর্থাৎ তুষাদিবিহীন করা যায়, তাহাকে তিতউ কহে। তাহা ততবৎ অর্থাৎ বিস্তারযুক্ত (যেমন, কুলা) অথবা তুন্নবৎ অর্থাৎ বহু ছিদ্রযুক্ত (যেমন, চালনী)। ধীর অর্থাৎ ধ্যানশীল ব্যক্তিগণ মনের দ্বারা অর্থাৎ প্রজ্ঞাদ্বারা (১) বাক্যকে ব্যবহার করেন অর্থাৎ অপশব্দ হইতে পৃথক্ করেন।

ইহাতে সাধুগণ (২) সখ্য জানেন অর্থাৎ সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন। (ইহাতে) কোথায় ? এই দুর্গম মার্গে। বাক্যের বিষয় একগম্য অর্থাৎ কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা লভ্য। তাহারা কে ? (অর্থাৎ সাধুগণ কে ?) বৈয়াকরণেরা। ইহা কেন ? (অর্থাৎ বৈয়াকরণগণই সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন, কেন ?) ইহাদিগের বাক্যে ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলকারিণী লক্ষ্মী নিহিত আছে। লক্ষ্মী লক্ষণ অর্থাৎ প্রকাশবশতঃ পরিবৃঢ়া অর্থাৎ প্রভুস্বরূপা। ("সক্তুমিব" "সক্তুর ন্যায়।") এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্যমূল।

সারস্বতীম্। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি।—"আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্ব্বপেদিতি।" প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। সারস্বতীম্।

বঙ্গানুবাদ।

"সারস্বতীম্।" "সরস্বতীসম্বন্ধীয়া।" "আহিতাগ্নি অর্থাৎ সাগ্নিক ব্যক্তি অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত সরস্বতী দেবতার যাগ করিবে।" প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য না হই, এই নিমিত্তও ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত।" "সারস্বতীম্।" "সরস্বতীসম্বন্ধীয়া।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল। (ক্রমশঃ)

---

(১) প্রকৃষ্ট জ্ঞানকে প্রজ্ঞা কহে।

(২) এই স্থানে মূলে পাঠ আছে,—'সখায়ঃ।" কৈয়ট তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সখায়ঃ সমানখ্যাতয়ো ভেদগ্রহস্ত নিবৃত্তত্বাৎ সর্ব্বমেকমিতি মন্যন্তে।"

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।]　　১৫ই জ্যৈষ্ঠ। (১৩০৬ সাল)　　[১০ম সংখ্যা।]

বর্ত্তমান ভারত।

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

৮ম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।

প্রাকৃতিক নিয়মে জরাজীর্ণের স্থানে নবপ্রাণোন্মেষের প্রতিস্থাপনের স্বাভাবিক চেষ্টায় উহা সমুপস্থিত হয়। এ সংগ্রামে জয় বিজয়ের ফলাফল পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক্ প্রযুক্ত ছিল।—অবনতির পূর্ব্বকালে তাহাই আবার কেবলমাত্র ভোগ্যসংগ্রহে বা আধিপত্যবিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত। যে শক্তির আধারত্বে তাঁহার মান, তাঁহার পূজা, সেই শক্তিই এখন স্বর্গধাম হইতে নরকে সমানীত। উদ্দেশ্যহারা, খেইহারা পৌরোহিত্যশক্তি ঊর্ণাকীটবৎ আপনার কোষে আপনিই বদ্ধ, যে শৃঙ্খল অপরের পদের জন্য পুরুষানুক্রমে অতি যত্নের সহিত বিনির্ম্মিত তাহা নিজের গতি-শক্তিকে শত বেষ্টনে প্রতিহত করিয়াছে, যে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বহিঃশুদ্ধির আচারজাল সমাজকে বজ্রবন্ধনে রাখিবার জন্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারই তন্তুরাশিদ্বারা আপাদ-মস্তক-বিজড়িত পৌরোহিত্যশক্তি হতাশ হইয়া নিদ্রিত। আর উপায় নাই, এজাল ছিঁড়িলে আর পুরোহিতের পৌরোহিত্য থাকে না। যাঁহারা এ কঠোর বন্ধনের মধ্যে স্বাভাবিক উন্নতির বাসনা অত্যন্ত প্রতিহত দেখিয়া এ জাল ছিঁড়িয়া অন্যান্য জাতির বৃত্তি অবলম্বনে ধনসঞ্চয়ে নিযুক্ত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পৌরোহিত্য অধিকার কাড়িয়া লইতেছেন। শিখাহীন, টেড়িকাটা, অর্দ্ধ ইউরোপীয় বেশভূষা আচারাদিসুমণ্ডিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যে সমাজ বিশ্বাসী নহেন। আবার ভারতবর্ষে যেথায় এই নবাগত ইউরোপীয় রাজ্য, শিক্ষা এবং ধনাগমের উপায় বিস্তৃত হইতেছে, সেথায়ই পুরুষানুক্রমাগত পৌরোহিত্য ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে ব্রাহ্মণযুবকবৃন্দ অন্যান্য জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনবান হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুরোহিত পূর্ব্বপুরুষদের আচার ব্যবহার একেবারে রসাতলে যাইতেছে।

গুর্জ্জরদেশে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে প্রত্যেক অবান্তর সম্প্রদায়েই দুইটি করিয়া ভাগ আছে,—একটী পুরোহিত ব্যবসায়ী অপরটী অপর কোনও বৃত্তি দ্বারা জীবিকা করে। এই পুরোহিতব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই উক্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত এবং অপর সম্প্রদায় একই ব্রাহ্মণকুলপ্রসূত হইলেও পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না। যথা নাগর ব্রাহ্মণ বলিলে উক্ত ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে যাঁহারা ভিক্ষাবৃত্ত পুরোহিত, তাঁহাদিগকেই কেবল বুঝাইবে। নাগর বলিলে উক্তজাতির যাঁহারা রাজকর্ম্মচারী বা বৈশ্যবৃত্ত, তাঁহাদিগকে বুঝায়। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে উক্ত প্রদেশ সমূহেও এ বিভাগ আর বড় চলে না। নাগর ব্রাহ্মণের পুত্রেরাও ইংরাজী পড়িয়া রাজকর্ম্মচারী হইতেছে, অথবা বাণিজ্যাদি ব্যাপার অবলম্বন করিতেছে। টোলের অধ্যাপকেরা

সকল কষ্ট সহ্য করিয়া আপনাপন পুত্রদিগকে ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইতেছেন এবং বৈদ্য কায়স্থাদির বৃত্তি অবলম্বন করাইতেছেন। যদি এই প্রকার স্রোত চলে, তাহা হইলে বর্ত্তমান পুরোহিত জাতি আর কতদিন এদেশে থাকিবেন, বিবেচ্য বিষয় সন্দেহ নাই। যাঁহারা সম্প্রদায়বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের উপর ব্রাহ্মণজাতির অধিকার-বিচ্যুতি-চেষ্টারূপ দোষারোপ করেন, তাঁহাদেরও জানা উচিত যে, ব্রাহ্মণ জাতি প্রাকৃতিক অবশ্যম্ভাবী নিয়মের অধীন হইয়া আপনার সমাধিমন্দির আপনিই নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইহাই কল্যাণপ্রদ, প্রত্যেক অভিজাত জাতির স্বহস্তে নিজের চিতা নির্ম্মাণ করাই প্রধান কর্ত্তব্য।

শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকীরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্ব্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে সমাজশরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অপরদিকে রাজসিংহে মৃগেন্দ্রের গুণদোষরাশি সমস্তই বিদ্যমান। একদিকে আত্মভোগেচ্ছায় কেশরীর করাল নখরাজী তৃণগুল্মভোজী পশুকুলের হৃৎপিণ্ড বিদারণে মুহূর্ত্তও কুণ্ঠিত নহে, আবার কবি বলিতেছেন, ক্ষুৎক্ষাম জরাজীর্ণ হইলেও ক্রোড়াগত জম্বুক সিংহের ভক্ষ্যরূপে কখনই গৃহীত হয় না। প্রজাকুল রাজশার্দ্দূলের ভোগেচ্ছার বিঘ্ন উপস্থিত করিলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ, বিনীত হইয়া রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেই তাহারা নিরাপদ। শুধু তাহাই নহে, সমান প্রযত্ন, সমান আকূতি, সাধারণ স্বত্বরক্ষার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ, পুরাকালের কি কথা, আধুনিক সময়েও কোনও দেশে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হয় নাই। রাজরূপকেন্দ্র তজ্জন্যই সমাজ দ্বারা সৃষ্ট, শক্তি সমষ্টি সেই কেন্দ্রে পুঞ্জীকৃত এবং তথা হইতেই চারিদিকে সমাজ শরীরে প্রসৃত। ব্রাহ্মণাধিকারে যে প্রকার জ্ঞানেচ্ছার প্রথম উদ্বোধন, ও শৈশবাবস্থায় যত্নে পরিপালন, ক্ষত্রিয়াধিকারে সেই প্রকার ভোগেচ্ছার পুষ্টি এবং তৎসহায়ক বিদ্যানিচয়ের সৃষ্টি ও উন্নতি।

মহিমান্বিত লোকেশ্বর কি পর্ণকুটীরে উন্নত মস্তক লুক্কায়িত রাখিতে পারেন, বা জনসাধারণলভ্য ভোজ্যাদি তাহার তৃপ্তি সাধনে সক্ষম?

নরলোকে যাঁহার মহিমার তুলনা নাই, দেবত্বের যাহাতে আরোপ, তাঁহার উপভোগ্য বস্তুর উপর অপর সাধারণের দৃষ্টিক্ষেপই মহাপাপ, লাভেচ্ছার ত কথাই নাই। রাজশরীর সাধারণ শরীরের ন্যায় নহে, তাহাতে অশৌচাদি দোষ স্পর্শে না, অনেক দেশে সে শরীরের মৃত্যু হয় না। অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রাজদারাগণও এই ভাব হইতে সর্ব্বতোভাবে লোকলোচনের সাক্ষাতে আবরিত। কাজেই পর্ণকুটীরের স্থানে অট্টালিকার সমুত্থান, গ্রাম্যকোলাহলের পরিবর্ত্তে মধুর কৌশলকলাবিশিষ্ট সঙ্গীতের ধরাতলে আগমন। সুরম্য আরাম, উপবন, মনোমোহন আলেখ্যনিচয়, ভাস্কর্য্যরত্নাবলী, সুকুমার কৌষেয়াদি বস্ত্র, শনৈঃ পদসঞ্চারে প্রাকৃতিক কানন, জঙ্গল, স্থূল বেশভূষাদির স্থান অধিকার করিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী পরিশ্রমবহুল কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া অল্পশ্রমসাধ্য ও সূক্ষ্মবুদ্ধির রঙ্গভূমি শত শত কলায় মনোনিবেশ করিল। গ্রামের গৌরব লুপ্ত হইল। নগরের আবির্ভাব হইল।

(ক্রমশঃ)

দিব্য বাণী

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপে॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২।৫৪

চন্দ্র যদি উদিত হয়
ধরণীতলে আর কি রয়
দিবাকরের প্রখর তাপ ?

বিশ্বপ্রভু ভগবানের
অমিত বল যে পদযুগে
সে পদনখ-চন্দ্রিকাতে
কামাদিতাপ নষ্ট হলে,

ভজনশীল সাধকদের
সে তাপ বলো, আর কী ভাবে
উদিত হবে হৃদয় মাঝে ?

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীচৈতন্যপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

লৌকিক বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পঞ্চমবর্ষীয় বালকবৎ সহজ সরলবিশ্বাসী হইলেও অতিলৌকিক বিষয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রীশ্রীজগন্মাতা স্বয়ং তাঁহাকে দিব্যদর্শনাদির দ্বারা জানাইয়া বুঝাইয়া দিতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। শাস্ত্রে উল্লিখিত তত্ত্বসমূহ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য তিনি পণ্ডিতগণের নিকটে যান নাই। উত্তরকালে তিনি বলিয়াছিলেন, 'হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম। মাকে বল্লাম, আমি মুখ্যু—তুমি আমায় জানিয়ে দাও, বেদ পুরাণ তন্ত্রে, নানা শাস্ত্রে কি আছে। ··· তিন দিন ধরে কেঁদেছি, আর বেদ পুরাণ তন্ত্র—এসব শাস্ত্রে কি আছে—(তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন।'

শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সম্বন্ধে প্রথমে তাঁহার সন্দেহ ছিল। সন্দেহ নহে—প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসই ছিল। তাঁহার ধারণা ছিল—নেড়ানেড়ীরাই শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতার খাড়া করিয়াছে। পরে আনুমানিক ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি রাণী রাসমণির জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাসের সহিত নবদ্বীপধাম দর্শনে যান। শ্রীচৈতন্যদেব যদি অবতারই হ'ন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার জন্মস্থানে কিছু না কিছু দিব্য ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাইবেন. এই আশায় তিনি নবদ্বীপের সর্বত্র মন্দির ও গোস্বামীগণের গৃহে গৃহে ঘুরিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া পরিশেষে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য নৌকায় উঠিলেন। এমন সময়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার কৃপায় তাঁহার এক অদ্ভুত দিব্যদর্শন হইল। দেখিলেন—তপ্তকাঞ্চনবর্ণ অপরূপ-রূপ দুইটি কিশোর—শীর্ষে তাহাদের জ্যোতির্মণ্ডল—হাত তুলিয়া তাঁহারই দিকে চাহিয়া আকাশপথ দিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ঐ অলৌকিক দর্শনে অভি-ভূত হইয়া—'ঐ এলোরে, এলোরে' বলিয়া তিনি তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ-বিহ্বলতা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। ঐ কথাগুলি বলিতে না বলিতেই সেই কিশোরদ্বয় তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং তিনি বাহ্য সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। জলেই পড়িয়া যাইতেন, ভাগিনেয় হৃদয়রাম নিকটেই থাকায় তাঁহাকে রক্ষা করেন। এই দর্শনের ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্ব ধারণা পরিবর্তিত হইয়া যায়—শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে জানাইয়া দেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব বাস্তবিকই অবতার। এই ঘটনাটি তিনি নিজেই বিস্তারিত বলিয়াছেন।

উপর্যুক্ত দর্শনটিই এই বিষয়ে একমাত্র দর্শন নহে। শ্রীশ্রীজগন্মাতার কৃপায় শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কিত আরও অনেক দর্শন তাঁহার হইয়াছিল, ইহাও তিনি নিজেই বলিয়াছেন। নবদ্বীপের সমীপস্থ গঙ্গার চড়ার উপর দিয়া যাইবার সময় তাঁহার যেরূপ গভীর ভাবাবেশ হইয়াছিল, নবদ্বীপে যাইয়া সেইরূপ হয় নাই। মথুরবাবু প্রভৃতি ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাস্থল গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে; ঐ সকল চড়ার স্থানেই সেই পুরাতন নবদ্বীপ বিদ্যমান ছিল এবং সেইজন্যই ঐ সকল স্থানে তাঁহার গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের পরে কোন এক সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইচ্ছা হইয়াছিল, অবতার পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের বহু-বিশ্রুত নগরকীর্তন দর্শন করেন। তাঁহার শুদ্ধ মনে যে ইচ্ছার উদয় হইত,

জগন্মাতা তাহা পূর্ণ করিতেন। ফলতঃ একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিজ কক্ষের বাহিরে দণ্ডায়মান শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিলেন পঞ্চবটীর দিক্ হইতে একটি বিরাট সংকীর্তনদল হরিনামে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণেশ্বর-উদ্যানের প্রধান ফটকের অভিমুখে যাইতেছে; দেখিলেন ঐ দলের মধ্যমণি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ধীরপদে অগ্রসর হইতেছেন এবং অসংখ্য ভক্ত গৌরাঙ্গপ্রেমে তন্ময় হইয়া উদ্দাম নৃত্যাদির মাধ্যমে আপন আপন হৃদয়ের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের নগরসংকীর্তনের এই দিব্য-দর্শনলাভের কিছুকাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সিহড় গ্রামে ভাগিনেয় হৃদয়রামের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। সেখানেও তিনি পুনরায় শ্রীচৈতন্য-দেবের দর্শন লাভ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—'হৃদের বাড়ীতে যখন ছিলাম, গৌরাঙ্গ দর্শন হয়েছিল—কালাপেড়ে কাপড় পরা'।

এই সময়েই তিনি সংকীর্তনে শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যদ্ভুত লোক-আকর্ষিণী শক্তির চমৎকারিত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করেন। সিহড় হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত ফুলুই-শ্যামবাজার নামক স্থানে বহু বৈষ্ণব নিত্য কীর্তনাদি করেন, সংবাদ পাইয়া সংকীর্তন শুনিতে তিনি তৎপার্শ্ববর্তী বেলটে গ্রামের নটবর গোস্বামীর গৃহে সাত দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কীর্তন শুনিতে শুনিতে তাঁহার অপূর্ব সাত্ত্বিক বিকারসমূহ, বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা ইত্যাদি দিব্যভাবের সংবাদ দূর দূরান্তরের বহু গ্রামে পৌঁছিয়া যায়। ফলে ঐ সকল গ্রাম হইতে অসংখ্য সংকীর্তনদল স্রোতের ন্যায় ফুলুই-শ্যামবাজারে আসিতে থাকে এবং সেখানে দিবারাত্র আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইতে থাকে। অগণিত ভক্ত তাঁহাকে দর্শন ও প্রণামাদি করিবার জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলে, তাঁহার স্নানাহারের অবকাশ পর্যন্ত থাকে না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া হৃদয়রাম তাঁহাকে লইয়া লুকাইয়া সিহড়ে পলাইয়া আসেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই বলিয়াছিলেন—

'ওদেশে যখন হৃদের বাড়ীতে ছিলাম, তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম গৌরাঙ্গভক্ত। গাঁয়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলাম গৌরাঙ্গ! এমনি আকর্ষণ—সাত দিন সাত রাত লোকের ভিড়। কেবল কীর্তন আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক, গাছে লোক।...রব উঠে গেল—সাত বার মরে, সাত বার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে। পাছে আমার সর্দিগর্মি হয়, হৃদে টেনে নিয়ে যেতো—সেখানে আবার পিঁপড়ের সার। আবার খোল করতাল তাকুটী! তাকুটী!... আকর্ষণ কাকে বলে, ঐখানেই বুঝলাম। হরি-লীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্‌কী লেগে যায়।'

স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন—'সত্য দুই প্রকার। এক—যাহা মানব-সাধারণের পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। দুই—যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য'। শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে সকল সত্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন তাহা শেষোক্ত প্রকারেরই। এখানে অবশ্য স্মরণীয়—'ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না,' 'অবতারেতে তিনি এক রকম প্রকাশ, আবার জীবেতে এক রকম,' 'অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে' ইত্যাদি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিনিচয়। যোগজ শক্তির তারতম্য আছেই। অবতার ও জীবের যোগজ শক্তির পার্থক্য সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায়। অবতারের যোগজ শক্তি সাধনসিদ্ধ নহে, স্বভাবসিদ্ধ। সেই স্বভাবসিদ্ধ অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তিসহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত

হইয়াছিলেন এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহাদের নিকট সেই সকল কথা বলিতেন। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরম ভক্ত বলরাম বসু তাঁহার নিকটে প্রথম আসামাত্র দক্ষিণেশ্বরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দৃষ্ট পূর্বোক্ত নগরকীর্তন-দলের মধ্যে তিনি যে বলরাম বসুর ভক্তির স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ভরা মুখখানি দেখিয়াছিলেন এবং বলরাম বসু যে পূর্বজীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের একজন লীলাপার্ষদ ছিলেন, তাহা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—'চৈতন্যদেবের সংকীর্তনের দল দেখালে। তাতে বলরামকে দেখলাম··· আর এঁকে ('শ্রীম'-কে) দেখেছিলাম।'

শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু উক্তি আছে। আমরা কয়েকটি উক্তির উল্লেখ ও সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। শ্রীচৈতন্যদেব যে অবতার ইহা তিনি বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে ভক্তগণের নিকট বারংবার বলিয়াছেন: 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি (কালী)। তিনি নররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।' 'চৈতন্য ভক্তির অবতার; জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন।' 'যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন। আর চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন—অতএব ভাল। দেখো চৈতন্যদেব কত বড় পণ্ডিত—আর তিনি অবতার—তিনি যেকালে এই নাম প্রচার করেছিলেন, এ অবশ্য ভাল।'

'তাঁর (শ্রীচৈতন্যদেবের) আলাদা কথা। তিনি ঈশ্বরের অবতার। তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাৎ। তাঁর এমন বৈরাগ্য যে, সার্বভৌম যখন জিহ্বায় চিনি ঢেলে দিলে, চিনি হাওয়াতে ফরফর্ ক'রে উড়ে গেল, ভিজলো না। সর্বদাই সমাধিস্থ। কত বড় কামজয়ী। জীবের সঙ্গে তাঁর তুলনা!'

জীবের 'ভাব' পর্যন্ত হয়—'প্রেম' হয় না, 'প্রেম' অবতারাদিরই হইয়া থাকে; শ্রীচৈতন্য-দেবের 'প্রেম' হইয়াছিল—এই ধরণের উক্তি সমূহের দ্বারাও শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করিতেন:

"তোমরা 'প্যাম' 'প্যাম' করো; কিন্তু 'প্রেম' কি সামান্য জিনিস গা? চৈতন্যদেবের 'প্রেম' হয়েছিল। প্রেমের দুটি লক্ষণ। প্রথম—জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য! চৈতন্যদেব 'বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।' দ্বিতীয় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে না, দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে। ঈশ্বরদর্শন না হলে 'প্রেম' হয় না।"

শ্রীচৈতন্যদেব যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি স্থির সিদ্ধান্ত। তিনি বলিতেন—'হাতীর বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে আক্রমণের জন্য এবং ভিতরের দাঁত খাদ্য চর্বণ করিয়া নিজ শরীর পোষণের জন্য থাকে, তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে দুই প্রকার ভাবের প্রকাশ ছিল। বাহিরের মধুরভাবসহায়ে তিনি লোককল্যাণ সাধন করিতেন এবং অন্তরের অদ্বৈতভাবে প্রেমের চরম পরিপুষ্টিতে ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং ভূমানন্দ অনুভব করিতেন।' শ্রীচৈতন্যদেবের তিন প্রকার অবস্থার কথা তিনি বারংবার বলিয়াছেন এবং তাহার যে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা হইতেও শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্বৈতানুভূতির বিষয় পরিষ্কার জানা যায়:

'চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা হ'ত—বাহ্যদশা, তখন স্থূল আর সূক্ষ্মে তাঁর মন থাকৃত; অর্ধবাহ্যদশা, তখন কারণশরীরে, কারণানন্দে মন গিয়েছে; অন্তর্দশা, তখন মহাকারণে মন লয় হ'ত। বেদান্তে

পঞ্চকোষের সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। স্থূল-শরীর, অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ। সূক্ষ্মশরীর, অর্থাৎ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। কারণশরীর, অর্থাৎ আনন্দময় কোষ। মহাকারণ, পঞ্চকোষের অতীত। মহাকারণে যখন মন লীন হ'ত তখন সমাধিস্থ। এরই নাম নির্বিকল্প বা জড়-সমাধি। চৈতন্যদেবের যখন বাহ্যদশা হ'ত তখন নাম-সংকীর্তন করতেন। অর্ধবাহ্যদশায় ভক্তসঙ্গে নৃত্য করতেন। অন্তর্দশায় সমাধিস্থ হতেন।'

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিম্নলিখিত উক্তিনিচয়ও স্মরণীয়: "কেউ কেউ ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ভক্তি নিয়ে থাকে—লোকশিক্ষার জন্য; যেমন অবতারাদি। দেহাত্মবুদ্ধি, 'আমি'-বুদ্ধি কিন্তু সহজে যায় না; তাঁর কৃপায় সমাধিস্থ হলে যায়—নির্বিকল্প সমাধি, জড়-সমাধি। সমাধির পর অবতারাদির 'আমি' আবার ফিরে আসে—বিদ্যার 'আমি', ভক্তের 'আমি'।... চৈতন্যদেব এই 'আমি' দিয়ে ভক্তি আস্বাদন করতেন, ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতেন; ঈশ্বরীয় কথা কইতেন; নাম সংকীর্তন করতেন।... চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান—জ্ঞান-সূর্যের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম—দুইই ছিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার একটি দর্শনের কথা 'শ্রীম'কে বলিতেছেন: 'দেখলাম—খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বল্লে, আমি যুগে যুগে অবতার। তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ঐ সব কথা বলছি। তারপর চুপ ক'রে থেকে দেখলাম। তখন দেখি আপনি বলছে—শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও বলিয়াছেন: 'ভক্তি তাঁহার (শ্রীচৈতন্যদেবের) বাহিরের ভাব—সাধারণের নিকট প্রচারের জন্য, এবং বেদান্ত ও শক্তি-উপাসনা তাঁহার ভিতরের ভাব—উহা নিজের জন্য; কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ এবং অন্নপূর্ণা দেবীর উপাসনাতেই উহা বুঝা যায়।'

'শ্রীম' শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'আমার বোধ হয়, তিন জনেই এক বস্তু—যীশুখৃষ্ট চৈতন্যদেব আর আপনি—এক ব্যক্তি'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর দেন—'এক, এক—এক বই কি!'

শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে এবং হইতেছে। ভবিষ্যৎ গবেষকগণ যদি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিসমূহ হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে গবেষণা করেন, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র নূতন আলোকে পরিদৃষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়।

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায়
হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্, ১১

আনন্দস্বরূপ ও লীলাময়-বিগ্রহধারী, সুবর্ণকান্তি ও মনোহরদিব্যমূর্তি, সেই সুপ্রসিদ্ধ মহান্ প্রেমামৃতপ্রদাতা চৈতন্যচন্দ্রকে বারংবার নমস্কার।

"প্রজহাতি যদা কামান্"

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

'মার' যদি মারতে পারিস্
তবেই যাবে দুঃখ-ভার !
স্বর্গেরে তুই কোথায় খুঁজিস্ ?
অন্তরে তোর স্বর্গ-দ্বার !

পেরিয়ে গেলে তৃষ্ণা-নদী
আনন্দেরই মহোদধি !
সেই সাগরে ডুব্‌বি যদি
ভুলিস্‌নে তুই অল্পে আর !

দিগ্বলয়ের আহ্বানে যার
রক্তে বাজে বাঁশির সুর—
গণ্ডী-ঘেরা পিঞ্জর তার
অশ্রু-জলের সমুদ্দুর !

মনে রাখিস্—তুই যে আলোর !
শাশ্বত সুখ অনন্তে তোর !
দিব্য সুরার নেশায় বিভোর
দাস হয়ে থাক্ চরণে তাঁর !

সফল সাধন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আকাশ উদার যখন ধরার বুকে তার হেম প্রতিধ্বনি
জাগায় অমল কনকোজ্জ্বল কিরণে—শিহরে নয়নমণি•
রূপের বিছনে, সুখের স্বপনে যখন হৃদয় উছসি' ওঠে
ভূলোকে হ্যুলোকে যখন ঝলকে আশাকল্লোল, প্রাণের তটে
প্রতিপদে জাগে রসে রঙে রাগে অলখের হাতছানি মধুর,
কল্পনা ডাকে কোমল সোহাগে ধরা দেয় হাতে চাঁদ সুদূর,
সঙ্গীতে ঝরে আলো, অম্বরে হাসে নবারুণ অমিতাভায়
কঙ্কর ম্লান কমলের গান গায় অমরার মূর্ছনায়।
জানে না হৃদয় তবুও অভয় উল্লাসে দূর তীর্থপথে
হয় আগুয়ান তনু মন প্রাণ ধায় কলতান রঙিন রথে—
তখন তোমার কৃপাঝঙ্কার শুনি' কে না চায় দিতে দোয়ার :
"তুমি আছ তাই না-চাহিতে পাই প্রসাদ অপার প্রভু তোমার"।

পরে যবে হায় সুদিন লুকায়, মেঘে ঢাকে নীলকান্ত আঁখি,
গভীর ব্যথায় অন্তর ছায় তখন তোমায় কাতরে ডাকি :
"নাথ, তুমি কেন নিষ্ঠুর হেন ? তোমার অলকা-দীপালিকার
ক্ষেমপ্রভার লেশঝঙ্কার বাজে কই ? শুধু অসহভার
বাধার বেদনা আবরে চেতনা কালো গুণ্ঠের ম'ত নিমেষে,
গেছে বসন্ত বর্ণ ছন্দ রূপ সুগন্ধ কোথায় ভেসে !
স্বদেশকে মনে হয় পরিচয় পাই নি তার এ-অচিনপুরে,
নিরাশা-বাদল ঢাকে নির্মল হুরাশা কাঁদে সে করুণস্বরে"।

বলো হেসে তুমি : "করুণা কুসুমি' ওঠে প্রেমলের ক্ষণে ক্ষণে
জাগাতে হৃদয়ে উছল প্রণয়ে গোলাপের হাসি কাঁটার বনে।
এ-জগতে চলে অস্ত-অচলে প্রকাশিতে নিতি নব তপন
নবীন উদয়ে জয়ে পরাজয়ে ঝঙ্কারি' ওঠে মণি-স্বপন।
বিশ্বের বিধান সুধার নিশান আমারি—জ্যোতির ভাব বিভোর
পেতে চিরদিশা বেদনার নিশা-তিমিরে বরিতে হবে রে তোর।
সুখে যার গান গাই 'মহীয়ান্' ঘোষি' তারে করি স্তব উছল,
দুঃখেও তার বাণী মহিমার যে শোনে সাধনা তারি সফল"।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মবৃক্ষের তলায় বাস করতেন। তিনি বহুরূপী ঈশ্বরতত্ত্বের নানা বর্ণবৈচিত্র্য তো বটেই আবার বর্ণশূন্যতাও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি সামগ্রিকভাবে অনুভব করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় চরম সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ। আর্য ঋষিদের উচ্চারিত 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি', 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী' ইত্যাদি বেদমন্ত্রের সত্যতা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে পুনঃপ্রমাণিত হয়—শ্রীকৃষ্ণের বাণী 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' পুনবায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়। তাঁর বৈচিত্র্যময় সাধনজীবনের দ্বারা হিন্দুধর্মের যাবতীয় অন্তর্বিরোধের অবসান হয়। হিন্দুধর্মসংহতিতে তাঁর অতুলনীয় ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন :

'... আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতদৃষ্টে বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম-নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতনধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতনধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্ব-সমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন।'[১৫] শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবনের নির্যাস উদ্ঘাটিত করে স্বামী বিবেকানন্দ লিখছেন : 'বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের যে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র. সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্ত-জ্ঞান হইতে নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত, এমন কি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ—হিন্দুধর্মে এগুলির প্রত্যেকটিরই স্থান আছে।'[১৬] সনাতন হিন্দুধর্মের এই গভীর অথচ ব্যাপক ও সর্বজনীন অচ্ছেদ্য অখণ্ড রূপ তুলে ধরেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আপাতদৃষ্টিতে বহুসম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দুধর্মের সমন্বিত অখণ্ড ভাবাদর্শ প্রচার করেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই ভাবাদর্শ ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করে বহুধা-বিভক্ত ভারত-বর্ষের সংহতি সাধনে সাহায্য করে। এই দুরূহ কাজে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা আদিগুরু শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তুলনীয়।[১৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর অধিকাংশের ধর্ম—হিন্দুধর্মকে সুসংহত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হননি। ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিবদমান ধর্মমতগুলির মধ্যেও তিনি একটি সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করেছিলেন। হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মমত ও তাদের অন্তর্গত সম্প্রদায়গুলি দীর্ঘকাল ধরে ঈর্ষা, অনুদারতা, সঙ্কীর্ণতা, বিদ্বেষের তুষানলে দগ্ধ—সহানুভূতির অভাবে একে অপরের উপর খড়্গহস্ত। সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় সংগঠনের অত্যাচার-উৎপীড়নে সমাজদেহ দীর্ণ, গর্বিত মানবসভ্যতার কিরীট ধুলায় অবলুণ্ঠিত, ধর্ম বৈষম্য-ব্যাধিতে পীড়িত সমাজদেহ

১৫ স্বামী বিবেকানন্দ : হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ

১৬ বাণী ও রচনা, ১।১৬

১৭ K. M. Panikkar : The Determining Periods of Indian History, p. 53

পন্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘকাল দক্ষিণেশ্বরে সাধন ভজন করে আবিষ্কার করলেন বৈষম্য-ব্যাধির নিরাকরণের তত্ত্ব। উন্মোচিত হ'ল মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন দিগন্ত।

ধর্মে ধর্মে বৈষম্যব্যাধিটি প্রাচীন, ব্যাধি-নিরাময়ের প্রচেষ্টাও প্রাচীন। দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ, শাস্ত্রশরিয়তের প্রমাণপত্র, ধর্মমতের তুলনামূলক বিচার, রাজনৈতিক বলপ্রয়োগ, সামাজিক চাপ ইত্যাদি নানা উপায়ে বৈষম্যব্যাধি নিরাময়ের চেষ্টা হয়েছে। অবতারপুরুষ, পয়গম্বর, প্রেরিতপুরুষ—এঁরা নিজেদের জীবনদান করে বিরোধ-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। যাবতীয় প্রচেষ্টা ও তার বিফলতার কারণ বিশ্লেষণ করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "আমরা দেখিতে পাই. 'সকল ধর্মমতই সত্য' – একথা বহু প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে আলেকজান্দ্রিয়ায় ইউরোপে চীনে জাপানে তিব্বতে এবং সর্বশেষ আমেরিকায় একটি সর্ববাদিসম্মত ধর্মমত গঠন করিয়া সকল ধর্মকে এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিবার শত শত চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সবগুলিই ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ তাহারা কোন কার্যকর প্রণালী অবলম্বন করে নাই।"[১৮] শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি প্রেমসূত্রের তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেই তত্ত্বটিকে বাস্তবে রূপদানের কার্যকর কর্মপ্রণালীও দেখিয়েছিলেন। তাত্ত্বিক অনুভূতির স্বর্ণকে তিনি বাস্তবের খাদ মিশিয়ে দৃঢ় ও উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সূত্রাকারে সমাধান দিয়েছিলেন, 'যত মত তত পথ।'[১৯] বিশ্বের বুধমণ্ডলী এই সমাধান-সূত্রকে স্বাগত জানিয়েছেন কিন্তু কেউ কেউ এর যৌক্তিকতা, যাথার্থ্য ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। জনৈক প্রতিষ্ঠিত বাঙালী বিদ্বান্ লিখেছেন: 'ধর্মসমন্বয় কথাটা অর্বাচীন যুগের বিকৃত মস্তিষ্কের একটা খিচুড়ি। ধর্মের সমন্বয় হয় না, ধর্ম বৈচিত্র্যময়।' জনৈক ভারত-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'যত মত তত পথ'-নীতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন: " 'যত মত তত পথ'—সমন্বয়ের এই যে মূলমন্ত্র, কার্যক্ষেত্রে ইহা যদি সম্ভবপরও হয় তাহা হইলেও ইহার পরিণাম খুব অশুভও হইতে পারে।" অন্যত্র তিনি আবার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন: "এই সব কথা চিন্তা করলে 'যত মত তত পথ' এই সূত্রটির প্রকৃত অর্থ কি তা নির্ণয় করা কঠিন হয়, সন্দেহ জন্মে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে 'মত' কোন অংশটুকু?" অপরপক্ষে বিশ্ববরেণ্য শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে সর্বমতের সমন্বয় হইয়াছে।'[২০] বিদগ্ধ সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ 'রামকৃষ্ণ-জীবনীর' ভূমিকায় লিখেছেন, 'And it is because R akrishna more fully than any other man not only conceived, but realised in himself the total unity of this river of God, open to all rivers and all streams, that I have given him my love.' উপনিষদের যৎ পশ্যসি তদ্বদ – যা দেখছেন তাই বলুন—এই নীতিতে গড়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। তিনি যা

---

১৮ বাণী ও রচনা, ৩।১৫৯

১৯ কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, এটি শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি নয়। এ ধারণা ভুল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণউপদেশ', এবং লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব ও গুরুভাব (উত্তরার্ধ) দ্রষ্টব্য।

২০ উদ্বোধন, ১৩৫২, জ্যৈষ্ঠ।

দেখেছেন জেনেছেন প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন তাই তুলে ধরেছেন বিশ্ববাসীর কাছে। শ্রীরাম-কৃষ্ণের সমন্বয়ভিত্তিক সামগ্রিক অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিশ্ববাসী, জানিয়েছেন বিশ্ব-বিশ্রুত ঐতিহাসিক টয়েনবি।[২১]

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সর্বধর্মসমন্বয়-মতবাদ যা বিশ্ববাসীকে আকৃষ্ট করেছে তার প্রকৃতরূপ ও তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা যাক্। ধর্মসমন্বয়ের বহুবিধ আকার কল্পনা করা যেতে পারে; সংহতি সামঞ্জস্য সমাকলন বিভিন্ন স্তরে হতে পারে। আবার ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সমন্বয়-তত্ত্বের প্রয়োগ বিভিন্নভাবে হতে পারে।

আলোচ্য বিষয়ের বোধসৌকর্যের জন্য প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মকে চারটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ প্রত্যেক ধর্মমতের মধ্যে রয়েছে দার্শনিক ভাগ বা ধর্মের মূলতত্ত্ব, যা ধর্মের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যকে আয়ত্ত করার উপায় নির্দেশ করে। দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক ভাগ যা সেই দর্শনের স্থূলরূপ প্রকটিত করে। তৃতীয়তঃ ধর্মের অধিকতর স্থূলভাগ অর্থাৎ বাহ্য আচার অনুষ্ঠানাদি। চতুর্থতঃ ও প্রধান হচ্ছে তত্ত্বানুভূতি অর্থাৎ ধর্মের তত্ত্ব বোধে বোধ করা, অপরোক্ষানুভব করা। বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে বিভেদ বিদ্বেষ সংঘর্ষ দূর করে বিভিন্ন ধর্মসেবীদের প্রেম-মৈত্রীর রাখিবন্ধনে বাঁধার জন্য উপরোক্ত এক বা একাধিক স্তরে চেষ্টা করা হয়েছে। এই সকল প্রচেষ্টার স্বরূপ-নিরূপণ এবং তার পটভূমিকাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুসৃত সর্বধর্মসমন্বয়ের তাৎপর্য ধৈর্যসহকারে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

(১) বিভিন্ন ধর্মের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের জীবন ও বাণীতে অপর ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতা দেখা যায়। বিভিন্ন শাস্ত্রশরিয়তে পরধর্মসহিষ্ণুতার হিতোপদেশ পাওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও ধর্মসম্প্রদায়-গুলি বারংবার ধর্মের দোহাই দিয়ে হিংসা-দ্বেষের বিষবাষ্প ছড়ায়, মানুষকে উদ্বাস্তু করে, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন বিপর্যস্ত করে। সম্প্রদায়কর্তারা গোঁড়ামির তাড়নায় দাবী করে, 'অন্য ধর্মের মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ সত্য আমাদের ধর্মেই। আমাদের ধর্মই মানুষকে আত্যন্তিক কল্যাণ দিতে সমর্থ।' আত্যন্তিক-কল্যাণ-বিধানে তৎপর অত্যুৎসাহী স্বসংঘ ধর্মধ্বজীগণ ছলে বলে কৌশলে হিদেন কাফের ম্লেচ্ছদের ধর্মান্তরিত করতে থাকে, অপর সকল ধর্মমত দাবিয়ে নিজেদের ধর্মমতের আধিপত্য বিস্তারের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠে। জেহাদ, ক্রুসেড, ধর্মের লড়াই ধর্মের বেদীতে অধর্মের পিশাচকে প্রতিষ্ঠা করে। ধর্মধ্বজীগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক চাপের সৃষ্টি করে অপরের ধর্মমত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নাশ করে। এইভাবে এক ধর্মমতকে 'একজাতীয়করণের' দ্বারা ধর্মের বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা অনেকে অনেকবার করেছে। একটি ধর্মমতের অপর সকলের উপর বিজয়লাভ তথা একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুধু যে ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, এর প্রতিক্রিয়ার বিষবাষ্পে মানব-সমাজ বারংবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

প্রাগুক্ত ধর্মে ধর্মে বাগ্‌বিতণ্ডা দ্বন্দ্ব-কোলাহলের পটভূমিকাতে শুনি শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: 'যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম করে—এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও এর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া! এ বুদ্ধি নাই যে যাঁকে কৃষ্ণ বলছ, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়,

২১ Arnold Toynbee's Introduction to 'Sri Ramakrishna and His Unique Message'

তাঁকেই যীশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়! এক রাম তার হাজার নাম। বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্ছে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম।··· তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া; ধর্ম নিয়ে লাঠালাঠি, মারামারি, কাটাকাটি; এসব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্ছে, আন্তরিক হলেই, ব্যাকুল হলেই তাঁকে লাভ করবে।'[২২] ধর্মে ধর্মে বিরোধের মূলে কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, মূঢ়তা, ধর্মোন্মত্ততা। ধর্মের গোঁড়াদের লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'আমি বলি সকলেই তাঁকে ডাকছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই।···তবে এই বলা যে মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatism) ভাল নয়; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের ভুল। আমার ধর্ম ঠিক; আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে এ ভাব ভাল'।[২৩]

(২) বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক পাঠ ও আলোচনা করে 'বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ববোধঃ' নীতি অনুসারে কোন কোন ধর্মনেতা বিভিন্ন ধর্মের সারাংশ সঙ্কলন করেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মবৃক্ষ হতে নিজের পছন্দমত ফুল তুলে ধর্মসমন্বয়ের মালা গেঁথেছেন, মানবসমাজকে সর্ববাদিসম্মত নূতন ধর্মমত উপহার দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রচেষ্টা স্মরণ করা যেতে পারে। উদারহৃদয় আকবর প্রধান ধর্মমতগুলির সারভাগ একত্র করে 'দীন-ই-এলাহি' নামে নূতন ধর্মমত চালু করেন। মোহম্মদ দারাসিকোহ ফারসী ভাষায় 'মজম-উ-ল-বহরৈন' (দুই সাগরের মিলন) রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ইদানীং কালে রামমোহন রায় বিচার বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করেন, প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মমতের লক্ষ্য 'একেশ্বরবাদ'। তাঁর ধর্মসমীকরণ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম ও খৃষ্টধর্মের চয়নের সমন্বয় বলা যেতে পারে। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান, ইসলাম ও চীনদেশীয় ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে সংগ্রহ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার জন্য 'শ্লোকসংগ্রহ' প্রকাশ করেন।[২৪]

এ-ধরণের সমন্বয় প্রচেষ্টা কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট।[২৫] এ-ধরণের নূতন ধর্মমতের পশ্চাতে আচার-অনুষ্ঠান রীতি-নীতি বিশ্বাসের ধারা-বাহিকতা না থাকায় মানুষ তৃপ্তিলাভ করে না, নূতন ধর্মমতের প্রতি ধর্মপিপাসুগণ আকৃষ্ট হয় না। অপরপক্ষে নূতন ধর্মমতের প্রচার ও পুষ্টিসাধনের জন্য প্রয়োজন হয় সম্প্রদায়ের এবং সম্প্রদায় গড়ে উঠলেই গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি দোষগুলি বাসা বাঁধতে থাকে। এইভাবে সমুচ্চয়ের সমন্বয় ধর্মবিরোধের স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না।　　[ক্রমশঃ]

---

২২ কথামৃত ২।১৩।৩
২৩ কথামৃত ২।১৫।১
২৪ J. N. Farquhar: Modern Religious Movements in India, p. 46
২৫ Rev. Frederic A. Wilmot: Prabuddha Bharata, 1935, Jan.

মানসপুত্র

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

"বেলুড় মঠে এক রোববার দু'জন মান্দ্রাজী-ভক্ত কিছু ফুল নিয়ে ঠাকুর ঘরে গিয়ে আবার ফুল সমেত ফিরে সোজা মহারাজের কাছে এল, 'ভাবিলাম, কি আশ্চর্য! ঠাকুরের স্থান, এমন সুন্দর গোলাপ ঠাকুরকে না দিয়া অম্লানবদনে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে'। ভক্তদ্বয় কিন্তু কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ না করিয়া মহারাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আঁখির পলকে মহারাজ একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া ধ্যানস্থ হইবার উপক্রম করিলেন এবং পরক্ষণেই সমাধিস্থ হইয়া ঠাকুরের ছবির মূর্তির মত, নিশ্চল নিস্পন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন।... মহারাজ অসুস্থ হইয়াছেন মনে করিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল নিকটেই বসিয়া ছিল, তাড়াতাড়ি নাড়ী টিপিল। বলা বাহুল্য, কিছুই অনুভব করিতে পারিল না একজন জল আনিতে ছুটিল। মান্দ্রাজী ভক্তদ্বয় কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, ধীরে ধীরে মহারাজের অভয় চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান করিল।...অজ্ঞমন কেবলই বলিতে লাগিল, নররূপী নারায়ণ ঠাকুর শ্রীরাম-কৃষ্ণের ছবিতে ও তাঁহার মানসপুত্র সচল বিগ্রহ রাখালরাজে বিশেষ প্রভেদ নাই।"[২৪]

গিরিশবাবুর কথায়: "রাখাল-টাখাল আমার কাছে ছেলেমানুষ। কালকের ছোকরা। ঠাকুরের কাছে আমি যখন যেতাম, তখন আর ওদের বয়স কত? এই রাখালকে আমি ঠাকুরের মানসপুত্র বলে জানি। তাকি শুধু শুধুই মানি? যখন আমার প্রথম হাঁপানী আরম্ভ হল, তখন খুব জ্বর, খুব দুর্বল হয়ে পড়লুম। এখানে তো শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ হচ্ছে। এদিকে আমার মনে এক সর্বনেশে ভাবের উদয় হল—ঠাকুর একজন মানুষ, একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। তখনি মনে হল—গুরুতে মানুষ জ্ঞান, মানুষ-বুদ্ধি, আমি বেটা তো গেছি। মনে দারুণ অশান্তি, কিছুতেই ঠাকুরের উপর ভগবদ্-বুদ্ধি এল না। অনেককে বলসাম, যেসব ত্যাগী গুরু-ভাইরা আমাকে দেখতে আসত—সবাইকে বলতাম।... এই সময় হঠাৎ একদিন রাখাল দেখতে এল। সামনে বসে জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন আছেন মশায়?'... আমি তাকে কাতর-ভাবে বললেম 'ভাই! আমার সর্বনাশ উপস্থিত। এত গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ শুনছি,—ভগবানকে দিনরাত ডাকচি অথচ ঠাকুরের উপর মানুষ-বুদ্ধি হল। কিছুতেই এটা যাচ্ছে না—আমার নরক-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছে। একি হল? উপায় কি?' রাখাল আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল। হেসে বললে, 'ও আর কি? ঢেউ যেমন হুস করে উঁচু হয় আবার তখনি নীচু হয়ে নেমে যায়, মনটাও তেমনি। ভাববেন না, শীঘ্রই আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটা উচ্চস্তরে আপনাকে নিয়ে যাবে তাই মন এমনি হচ্ছে কিছু চিন্তা করবেন না।'... যাবার সময় হেসে বল্লে, 'ব্যস্ত হবেন না, কোন ভয় নেই, মন আবার তড়াক করে লাফ দিয়ে কোথায় চলে যাবে।' এই বলে যেই আমার বাড়ীর সামনের গলি পার

---

২৪ শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল লিখিত, উদ্বোধন ২৪ বর্ষ পৃঃ ৩০৫-৬

হয়ে অক্ষ গলিতে মোড় ফিরলে, অমনি আমার কাঁধের উপর থেকে ভূতটা যেন চলে গেল—ঠাকুরের উপর আবার অমনি সেই ভগবদ্-বুদ্ধি এল। সাধ করে কি ওকে মানি? রাখাল পেছন ফিরলে অনেক সময় ঠাকুর বলে আমারই ভুল হয়। ঠিক সেই রকম হাবভাব কথাবার্তা কতক কতক পেয়েছে।"[২৫]

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন: "শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'রাখাল আমার ছেলে'—মানসপুত্র। ...শিখা হইতে অনুরূপ শিখার সঞ্চার, যদি একথায় তাৎপর্য হয়, পিতা-পুত্র উভয়কে দেখিবার অপরিসীম সৌভাগ্য যাঁহার ঘটিয়াছে, তিনিই কতক উপলব্ধি করিতে পারিবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন বলিতেন—'রাখাল আমার ছেলে'।

"..মহারাজ অমিত ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ছিলেন; তাঁহাব বহুমুখী শক্তি বর্ষার বারিধারার ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু,... এই উদার বিশ্বপ্রেমের অমৃত আস্বাদ পাইয়া কেহ ধারণা করিতে পারিত না যে, এই নিশ্চিন্ত, শান্ত, শিবময় পুরুষের অন্তরে কি মহান্ ত্যাগ, কঠোর বৈরাগ্য, অপরিমেয় তিতিক্ষা, কি জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্কাম কর্মানুরক্তি, সংসার-মোহ-হারিণী কি মহাশক্তি উদ্বোধনের জন্য নিরুদ্বেগ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া থাকিত! ভিক্ষু তাঁহার অপ্রত্যাশিত করুণায় কৃতার্থ হইয়া ফিরিত; জ্ঞানী জ্ঞান-চর্চ্চায় তাঁহার ইতি করিতে পারিত না; ভক্ত সে ভক্তিসিন্ধু সন্তরণ করিয়া পার পাইত না; কর্মী কর্মকৌশলে তাঁহার কাছে হার মানিত; সংশয়ী বিশ্বাসের বল পাইত; সংসারী সংসার-ধর্মের নিগূঢ় মর্ম বুঝিত; রসিক তাঁহার রস-স্ফূর্তিতে মহাহাস্যধারায় হাবুডুবু খাইত; সাধক তাঁহার কাছে সাধনার উচ্চতত্ত্ব লাভ করিয়া চরিতার্থ হইত; তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া হতাশচিত্ত উৎসাহে, ভগ্নহৃদয় আশার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিত; অথচ এই মহারাজ বালকের সঙ্গে বালক হইয়া খেলা করিতেন!

"মহারাজ যে মহারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, সেথায় দুঃখ দৈন্য শোকের প্রবেশাধিকার ছিল না;... সে রাজ্যের যাঁহারা প্রজা—অমায়িক মহারাজের ব্যবহারে তাঁহারা ভাবিতেন, আমিই তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়; অথচ আপন আপন অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করিয়া প্রশ্রয় লইতে কেহ কখন সাহসী হইতেন না।"[২৬]

মানবীয় ভাষায় কোনও পুরুষোত্তম সম্পর্কে এর বেশী কিছু বলা যায় কি না জানি না। তবে, ইনি যাঁর অংশমাত্র—সন্তান, তাঁর সম্পর্কে বলতে গেলে এই রকম কথাই আমরা বলব—হয়ত অপার অসীম অনন্ত এরূপ কতকগুলো বিশেষণ দেব। দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণই যেন ভিন্ন আধারে আপন সন্তানে তাঁর সকল ভাবৈশ্বর্য নিয়ে খেলা করছেন—সেই সর্বযোগ-ধর্ম-সমন্বিত উদার সুমহান্ চরিত্র! সেই সর্বভাবঘন, করুণারসমণ্ডিত মূর্তি!!

এবারে যাঁরা তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠশালায় দক্ষিণেশ্বরে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে তপস্যায় কর্মে ধ্যানে আলাপে কৌতুকে দিনে রাতে মহাতীর্থপথের সাথী হয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপায় ও আপন আপন সাধনচেষ্টায় যাঁরা সকলেই আপ্তকাম মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁদের শ্রীমুখ-উচ্চারিত বাণী-সংকলন সামান্যতঃ করা হল:

পূজনীয় শশীমহারাজ মাদ্রাজের অনুগামী ভক্তদের বলেছিলেন: 'তোমরা ত শ্রীগুরু মহা-

---

২৫ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ২২৮-৩০

২৬ উদ্বোধন ২৪ বর্ষ, পৃঃ ৩০৭-৮

রাজকে দর্শন কর নাই, মহারাজকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও।'[২৭] আবার বলেছিলেন : To offer these fruits to the Maharaj is as good as offering them to Sri Ramakrishna.'[২৮] (মহারাজকে এই ফলগুলি দেওয়া আর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করা সমান।) শুধু কথায় নয়, কাজেও পূজনীয় শশী-মহারাজ ঐভাবে তাঁকে দেখতেন বলে তাঁর পরিত্যক্ত ভুক্তাবশেষ থেকে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন।[২৯] আর এই কারণেই কি বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে মহারাজকে মঠে ফিরিয়ে নেবার জন্য বলেছিলেন![৩০] ঠাকুরের মানসপুত্রের, তাঁর বাল-গোপালের ভিতর দিয়েই সঙ্ঘের কাজ ঠাকুর করছেন—এই বিশ্বাস তাঁর ছিল।

স্বামী সারদানন্দ, শ্রীশ্রীমায়ের ভারী, বলেছিলেন : 'আমাদের মধ্যে একমাত্র মহারাজের ভিতরেই ঠাকুরের পরমহংস-অবস্থার হাবভাব, চালচলন দেখতে পাওয়া যায়। মহারাজকে পিছন দিক থেকে দেখলে ঠাকুর বলেই মনে হত।'[৩১]

"... একদিন মাদ্রাজে আমি মহাপুরুষ মহারাজকে বলেছিলুম—'আপনি তো মহারাজের 'yes-man', তাঁর সব কথায় হাঁ বলেন।' মহাপুরুষ মহারাজ হেসে উত্তর দিলেন—'অবনী, তোমরা দেখ মহারাজকে মহারাজ। আমরা কি দেখি জান? বাহিরে মহারাজের খোলটা আর অন্তরে ঠাকুর ছাড়া আর কিছু নেই।"[৩২]

"You have seen the son of God, you have seen God."[৩৩]

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ লিখেছেন : "তিনি মিষ্টি কথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশবাণী আমাদের নিকট কতই না বলিয়াছেন। দেবদেবীর বিষয় তিনি বলিতেন যে তাঁহারা সত্যসত্যই আছেন। কল্পনার কথা নহে। তিনি তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেন ও তাঁহাদের সহিত কথা বলিতেন ও তাঁহাদের প্রত্যুত্তর শুনিতেন। একদিকে স্বামীজীর নিরাকার অনুভূতি, আর একদিকে রাখাল মহারাজের দেবদেবীর দর্শন, এই দুইয়ের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের সম্যক্ রূপ উপলব্ধি করা যায় এইরূপ আমার মনে হয়।"[৩৪]

কথাপ্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং বলেছিলেন, "মন এখন লীলা হইতে নিত্য এবং নিত্য হইতে লীলায় আসে।"[৩৫]—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই ভাবটি বিশদ করে বলার অপেক্ষা রাখে না, যে তা রাখাল মহারাজের মধ্যেও সহজভাব ধারণ করেছিল। অন্যান্য গুরুভাই-এরা যে অনুরূপ-ভাবেই মহারাজকে দেখতেন তা বলাই বাহুল্য। প্রবন্ধ-কলেবর বড় হবার আশঙ্কায় সকলের কথা বলা হল না। স্বামীজীর লেখা ও উক্তির উল্লেখ না করলে যেন অপূর্ণ থাকবে আলোচনা—তাই তাঁর বাণীর শরণ নেওয়া হল। হরিদাস বিহারী-দাসকে স্বামীজী লিখেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দজীর পরিচয় দিতে গিয়ে—"As to the other two Swamis, they

---

২৭ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ২৩৩
২৮ ঐ পৃঃ ২৩৬
২৯ ঐ পৃঃ ২৪০
৩০ ঐ পৃঃ ২৩৬
৩১ ঐ পৃঃ ২৩৮
৩২ শিবানন্দস্মৃতিসংগ্রহ ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১০-১১

৩৩ শিবানন্দস্মৃতিসংগ্রহ ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ পৃঃ ১১-১২
৩৪ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—ভূমিকা
৩৫ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ২৮৭

were my Gurubhais one of them is our leader." (অপর দুজন স্বামীজীর সম্পর্কে বলি—তাঁরা আমার গুরুভাই—এঁদের একজন আমাদের নায়ক)।[৩৬]

আমেরিকা থেকে ফিরে 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' বলে পাদবন্দনা করেছিলেন। গিরিশবাবুকে একসময়ে বলেছিলেন—"'রাজা'র কাজ দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি। কি সুন্দরভাবে মঠ মিশনের কাজ চালাচ্ছে! 'রাজা'র রাজবুদ্ধির তারিফ করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'রাখালের রাজবুদ্ধি, একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে।' তা ঠিক।'" গিরিশবাবু বলেছিলেন, 'তাঁর ত ছেলে, হবে না কেন?'— স্বামীজী তা শুনে আনন্দে বলেছিলেন—'রাজার spirituality আঁকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে কোলে করতেন, আদর করে খাওয়াতেন, একসঙ্গে শয়ন করতেন! তার কি তুলনা হয়? রাজা আমাদের মঠের প্রাণ—আমাদের রাজা!' "[৩৭]

বেলুড়ে মঠ স্থাপন করে ১৮৯৯ খৃঃ ২রা জানুয়ারি মহারাজকে ষোড়শোপাচারে ভোজন করিয়ে যুক্তকরে স্বামীজী বলেছিলেন: 'রাজা, তোর আদর তিনিই জানতেন—আমরা কি জানি যে তোর আদর করব?'[৩৮]

সর্বভাবময় ঠাকুরের ধর্মসঙ্ঘ একদিকে নিরাকারের ঘরের স্বামীজী অপরদিকে সাকারের ঘরের মহারাজজীর বিপুল অধ্যাত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবই যেন তত্ত্বজ্ঞানাংশে বিবেকানন্দরূপে এবং আনন্দাংশে প্রেমময় রাখাল-রাজরূপে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে জীব-উদ্ধারের লীলা-কার্য করে গেছেন। অথচ সকল ব্যাপারেই মহারাজ ছিলেন বালক। সেই চিরশিশুর বাল্য-লীলা আদি ও অন্তে সমভাবে চলেছিল। শেষ সময়ে আপনার স্বরূপের সাক্ষাৎ দর্শন অপরূপভাবে বলে গেছেন—"ঐ যে—পূর্ণচন্দ্র! রামকৃষ্ণ!—রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই। আমি ব্রজের রাখাল,—দে দে আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে, —আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচব।·· কৃষ্ণ এসেছ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।···আহাহা, কি সুন্দর! আমার কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ, ব্রজের কৃষ্ণ, এ কষ্টের কৃষ্ণ নয়। এবারে খেলা শেষ হল। দেখ দেখ—একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে আর বলছে আয়, চলে আয়।"[৩৯]

জ্যোতির্ময়-শিশু, ক্ষমারূপা তপস্বিনী জগজ্জননী, সপ্তর্ষির ঋষি একজোটে যে-লীলায় অবতীর্ণ, তারই মাঝে ব্রজের রাখাল বালকের এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। মনে হয়, বুদ্ধিগর্বী মানুষের অন্তরে চিরশিশুর এই আনন্দপ্রিয় ক্রীড়া-মধুর অনাসক্তির আদর্শ চিরবিদ্যমান। তাই মানুষ শিশুকে দেখে মুগ্ধ হয়—ভালবাসে। ব্যস্ত ব্যগ্র যান্ত্রিক সভ্যতার বহুভাব-সংঘর্ষোত্থ মহাকোলাহলের মাঝে তাই কি আর একবার ব্রজপুলিনের বংশিধ্বনি বেজে উঠল? ঐ হাস্যময় অনাসক্ত মাতৃপ্রেমে আত্মহারা শিশুমূর্তি কি আমাদের চিত্তকে সবলে আকর্ষণ করছে না? বহু সমস্যা বিজড়িত আধুনিক সংশয়ীমনের গভীরে বাজছে সেই অমিয় মধুর আশ্বাসের সুর, শ্রীরামকৃষ্ণ-মানস স্পন্দন, যা স্পন্দিত ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর সত্তা থেকে: "ভগবান আছেন, ধর্ম আছে · সত্যই তিনি আছেন, তিনি প্রত্যক্ষের বিষয়, উপলব্ধির বিষয়। তাঁর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই।"[৪০] "এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও।"[৪১] "লাগ দেখি একবার জোর করে। দেখবে মনের সব শক্তি এক করতে পারলে আগুন ছুটে যাবে। লাগ, লাগ। জপ করে হয়, ধ্যান করে হয়, বিচার করে হয়—সবই সমান। একটা ধরে ডুবে যাও। আর প্রশ্ন নয়।"[৪২]

৩৬ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ১৬১
৩৭ ঐ পৃঃ ১৭৯
৩৮ ঐ পৃঃ ১৮১
৩৯ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ৩২০
৪০ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ৫১
৪১ ঐ পৃঃ ১০৭
৪২ ঐ পৃঃ ১০৬

মুসলীমের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ

আলহাজ আহ্মদ তৌফিক চৌধুরী

ইসলাম বলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এবং জাতিতে অসংখ্য নবী-রসুল বা অবতারের (অবতার-অর্থ—যিনি অবতরণ করেন অর্থাৎ 'নাজিল' হন) শুভাগমন হয়েছে। (ইউনুস, ৪৮ আয়াত; ফাতির, ২৫ আয়াত; নহল, ৩৮ আয়াত; রাদ, ৮ আয়াত)। প্রত্যেক অবতারই মাতৃ-ভাষায় ঐশী বাণী লাভ করে প্রচার-কার্য চালিয়ে গিয়েছেন। (ইব্রাহীম, ৫ আয়াত)। ইসলামে বিশ্বাসী প্রতি মুসলীমকে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতিতে আগত এইসব অবতার বা নবী-রসুলের উপর এবং তাঁদের কাছে প্রতিভাত সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। (বাকারা, ২৮৬ আয়াত)। কোন এক নবীকে অস্বীকার করে অবশিষ্ট নবীকে মান্য করলেও বিশ্বাসী হওয়া যায় না। (নেছা, ১৫১ আয়াত)। ইসলাম এই সব ঈশ্বরপ্রেরিত নবী রসুল বা অবতারের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছে। (বাকারা, ২৮৬ আয়াত)।

ধর্মগ্রন্থ আল কোরআনে অগণিত প্রেরিত পুরুষের মধ্যে মাত্র কতিপয়ের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এছাড়া আরো বহু নবী-রসুল রয়েছেন যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। (নেছা, ১৬৫ আয়াত; মুমিন, ৭৯ আয়াত)। নাম না জানা প্রেরিত পুরুষদেরকে সার্বজনীন সত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে। নবী-রসুলের সত্যতা যাচাই করার সবচাইতে সহজ এবং সরল পন্থা হল এই,—"পূর্ববর্তী সকল নবী যাঁরা ভারত, চীন, পারস্য এবং পৃথিবীর অন্য অংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সহস্র সহস্র মানবের হৃদয়ে যাঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠিত, যাঁরা নিজ ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত যাঁদের মতাদর্শ প্রচলিত ছিল, তাঁরা সকলেই ঈশ্বর-প্রেরিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। এই নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক ধর্ম-প্রবর্তক, যাঁদের জীবন উক্ত নিয়মানুযায়ী পাওয়া যায়, তাঁরা হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হউন, আর পার্শীধর্মের প্রবর্তক হউন কিংবা চীন, ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান প্রভৃতি যে কোন ধর্মের সংস্থাপক হউন না কেন, আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি। (তোহ ফায়ে কায়সারিয়া ৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ইসলামের এই মহান্ শিক্ষার আলোকে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ভারতভূমিতে আগত মহামানব শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর-প্রেরিত অবতার বা রসুল ছিলেন। পবিত্র কোরআনে তাঁর নামের উল্লেখ না থাকলেও ফোরকানের মাপকাঠিতে তিনি সত্য নবীরূপে প্রতিপন্ন, উত্তীর্ণ হন। 'তারিখে হামদান,' নামক পুস্তকের 'বাবুল কাফ' অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলেছেন—"ভারতে কৃষ্ণবর্ণের এক নবী আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর নাম ছিল "কহন"। (এই পুস্তকটি নিজাম হায়দরাবাদের কুতুবখানা আসফিয়ায় সুরক্ষিত আছে)। এই "কহন" কৃষ্ণ বা কিষণ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। অনেক ক্ষেত্রে 'স' বা 'ষ' অক্ষর 'হ' রূপে উচ্চারিত হওয়ার রীতি সর্বজনবিদিত। এছাড়া "কহন" শব্দ কানাই-এর অপভ্রংশ বা রূপান্তরও হতে পারে।

ইসলামের চতুর্থ খলীফা, মহানবীর জামাতা মহাপ্রাণ হজরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, "আল্লাতালা কৃষ্ণবর্ণের এক নবী পাঠিয়েছিলেন, যাঁর নাম কোরআনে উল্লেখ করা হয় নাই।"

(তফসিরে কাশশাফ, জিল্‌দ—৩, পৃষ্ঠা ৬০, মিশর সংস্করণ এবং তফসীরে মাদারেক, জুজ—২, পৃষ্ঠা ৬৫, মিশর সংস্করণ দ্রষ্টব্য)।

উপরে বর্ণিত কোরআন ও হাদিসের অনুসরণে মুসলীম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংস্কারক ও উলামা-পণ্ডিতগণ ভারতে আগত নবী-রসুলের সত্যতা স্বীকার করে বিভিন্ন পুস্তকে তা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। আমরা নিম্নে ঐসব উক্তি থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করলাম।

লাহোরের জমিন্দার পত্রিকার সম্পাদক মোঃ জাফর আলী খান বলেন, "এমন কোন জাতি বা দেশ নেই যার ত্রুটি সংশোধনের জন্য উপযুক্ত সময়ে আল্লাতালা কোন নবী-রসুল প্রেরণ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ নবীদের এই আন্তর্জাতিক ধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।" (প্রতাপ পত্রিকার শ্রীকৃষ্ণ সংখ্যা, ২৮শে আগস্ট, ১৯২৯ ইং)। প্রখ্যাত সংস্কারক মোজাদ্দেদে আলফেসানী সৈয়দ আহ্‌মদ, সরহিন্দ এলাকার কোন একস্থানে কাশফে (দিব্যদৃষ্টিদ্বারা) কতিপয় ভারতীয় নবীর সমাধি দর্শন করেছিলেন। (হাদিকা মাহ্‌মুদীয়া, ১০৫ পৃষ্ঠা)। 'সিরাতুন্নবী' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা শিবলী নোমানী ভারতীয় নবীদের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন যে নানারূপ কল্প-কাহিনীর আড়ালে ঐসব নবীর সত্যিকার পরিচয় আজ ঢাকা পড়ে আছে। (জিল্‌দ—১, পৃষ্ঠা ২)। বিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম নাস্তবী শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রকে সত্য নবী বা অবতার বলে উল্লেখ করেছেন। (মোবাহেসা শাহ্‌-জাহানপুর, ৩১ পৃষ্ঠা, ১২২৫ হিজরী সংস্করণ ও সৎ ধরম প্রচার, ৮ পৃষ্ঠা)। মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান কোরআনের ভাষ্য লিখতে গিয়ে বলেছেন, "ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে হজরত কৃষ্ণ (আঃ) আল্লার এক প্রিয় ও সৎপথ প্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং নিজ যুগ ও জাতির জন্য খোদার পক্ষ থেকে সতর্ককারী-রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।" (তফসিরে ওয়াহিদী)। নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার বংশধর খাজা হাসান নিজামী বলেছেন, "শ্রীকৃষ্ণও ভারতের পথ-প্রদর্শক ছিলেন।" (কৃষ্ণ বিতি, ২৯ পৃষ্ঠা)। অন্যত্র গীতার বাণী, 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" (৪র্থ অধ্যায়, অষ্টম শ্লোক) সমর্থন করে বলেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশকল্পে প্রেরিত হয়েছিলেন।" (ঐ, ৯১ পৃষ্ঠা)। খ্যাতনামা তাপস মীর্জা মাজহাব জান জানান এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রকে নবীরূপে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। (মকামাতে মাজহারী, ৩৩ পৃষ্ঠা)। ইদানীং মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ রফিক জাকারিয়া 'Is Islam Secular?' নামক প্রবন্ধে বিভিন্ন মুসলীম উলামার উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'According to the Quranic declarations, not only Moses and Jesus but all the Vedic rishis of old and Rama, Krishna, Mahavira and Buddha of India, Zarathustra of Persia and Confucius of China have alike a place in the hearts of the true followers of Islam,' (The Illustrated Weekly of India, 28. 10. 73, pages 10, 11)।

আল্লা, রসুল, খলিফা, মুজাদ্দিদ, ওলীআল্লা, বিশিষ্ট আলেম এবং অন্যান্য মুসলীম পণ্ডিতদের উদ্ধৃত বাণী এবং উক্তি থেকে একথা স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণ নিজ যুগের এক নবী-রসুল বা অবতার ছিলেন। প্রত্যেক নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেহেতু প্রতিটি মুসলীমের অবশ্য কর্তব্য, অতএব, নবী শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ, বরণ ও মান্য করাও মুসলীম-বিশ্বাসের

অন্যতম এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বটে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবন-চরিত আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর জীবন এবং মূসা নবীর জীবনের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। এখানে কতিপয় সাদৃশ্য দেখান হল: (১) মূসা জালেম সম্রাট ফেরাউনের রাজত্বে জন্ম গ্রহণ করেন; শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী রাজা কংসের রাজত্বে জন্ম গ্রহণ করেন। (২) ফেরাউন ইস্রায়েলের পুত্র সন্তান বধের নির্দেশ দিয়েছিল; কংস বসুদেব এবং দেবকীর সন্তান হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। (৩) ফেরাউনের ভয়ে মূসাকে মায়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হয়; কংসের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণকেও মাতৃক্রোড় থেকে অন্যের গৃহে আশ্রয় নিতে হয়। (৪) উভয়ই মাতৃভূমি থেকে দূরে জীবনের এক বৃহৎ অংশ অতিবাহিত করেন। (৫) উভয়ই মেষ বা গাভীর রাখাল ছিলেন। (৬) মূসার প্রচার-কার্যে ভাই হরুণ সহযোগী ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণের প্রচার-কার্যে ভাই বলরাম সাহায্যকারী ছিলেন। (৭) যুদ্ধের বিষয়ে মূসা যদ্রূপ অনুসারীদেরকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও করেছিলেন। (৮) মূসার বিরুদ্ধাচরণ করে ফেরাউন নিহত হয়েছিল; শ্রীকৃষ্ণের হাতেও কংস ধ্বংস হয়েছিল। মূসার পূর্বপুরুষ ইউসুফের সঙ্গেও কোন কোন দিক দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যায়। ইউসুফ এবং জুলেখাকে কেন্দ্র করে যেমন নানা-রূপ প্রেম-কাহিনী রচিত হয়েছে ঠিক তেমনি রাধা এবং কৃষ্ণকে নিয়েও বহু কল্প-কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সব রূপকথার সঙ্গে সত্যের দূরতম সম্পর্কও নেই। নবীকে কিরূপে ভালবাসতে হয়, নবীর জন্য কি করে যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনীর মধ্যে তাই সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যত দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এই রূপকের আক্ষরিক ব্যাখ্যা নিয়ে।

আমাদের দেশে 'নৌকা বিলাস' নামে এক প্রকার কৃষ্ণযাত্রা প্রচলিত আছে। উক্ত যাত্রা গানে যমুনা নদী পার হওয়ার একটি দৃশ্য আছে। রাধা এবং অন্যান্য গোপীরা নদী পার হতে এসেছে। খেয়া নৌকার মাঝি হলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণ গাইছেন:

পারে যাবি কে তোরা, আয় ছুটে আয়।
তরী নিয়ে বসে আছি নদী-কিনারায়॥
নাইকো ভয় ঝড় তুফানে,
দিই গো পাড়ি রাত দিনে
দানের কড়ি বুঝে নিয়ে তুলি আমি নায়॥

নদী পার হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের দাবী হল, ষোল পণ কড়ি। এথেকে এক কানা কড়িও কম নয়।

এই ছোট্ট দৃশ্যটিতে শ্রীকৃষ্ণের তথা অবতারের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সহজ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যুগে যুগে অবতারগণ অক্ষম মানবকে ভবনদী পার করার জন্যই জগতে আগমন করে থাকেন। যারা মুক্তিলাভ বা ভবনদী পার হতে চায় তাদেরকে অবতারের আহ্বানে যথাসর্বস্ব দান করতে হয়। অল্প কিছু দিয়ে অবশিষ্ট অন্যের জন্য রেখে দিলে চলে না। নারী যেমন তার স্বামীর কাছে দেহ, মন, যৌবন বিনা দ্বিধায় সমর্পণ করে তেমনি ভক্তকেও তার ষোল আনা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হয়। পবিত্র কোরআনেও পুণ্যবান ব্যক্তিদেরকে রূপকভাবে নারীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। (সুরা তাহরিম শেষ রুকু দ্রষ্টব্য)।

অনেকের মতে রাধা বা রাধিকা, 'আরাধিকা' শব্দ থেকে উৎপন্ন। যারা তনু, মন, ধন দিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করেন তারাই রাধিকা নামে আখ্যাত হন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,

Radha was not of flesh and blood
Radha was a froth in the ocean of love.

অর্থাৎ রাধা কোন রক্তে মাংসে গড়া অস্তিত্ব নয়, রাধা হল প্রেমসাগরের বুদ্‌বুদ বা ফেনা। আজকাল শ্রীকৃষ্ণের যেসব কল্পিত চিত্র দেখতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে একটিতে তাঁকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক রূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। যে বয়সে কাম ভাবের উদ্রেক হতে পারে না, সেই রূপটিই রাধার সঙ্গে দেখান হয়েছে। এই রূপক চিত্রের একমাত্র অর্থ হল, শ্রীকৃষ্ণ শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ ও নিরহঙ্কার ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন শিশু-হেন উলঙ্গ পরানের অধিকারী। তাঁর হাতে যে বাঁশিটি দেখা যায়, সেটি হল খোদা-প্রেমের মধুর বাণীর প্রতীক। অবতারগণ এইরূপ বাঁশির ধ্বনির মাধ্যমেই ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করে থাকেন। কোরআন শরীফে একে 'নুফিকা ফিছ্‌ছুর' অর্থাৎ ছুর বা সুরধ্বনি বলা হয়েছে। বাইবেলে বলা হয়েছে, 'তুরিধ্বনি' (মথি, ২৪ : ৩১)।

এমনিভাবে আমরা যদি সকল প্রকার রূপকের বেড়াজাল ছিন্ন করে, কল্প-কাহিনীর অন্ধকার ভেদ করে সত্যের আলোকে শ্রীকৃষ্ণকে এনে দর্শন করি, তাহলে দেখতে পাব, কোরআনে বর্ণিত নবীর গুণাবলীর সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য নেই, সংঘাত নেই।

আর এমনি করে কোরআনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে যেদিন প্রতিটি মুসলমান শ্রীকৃষ্ণকে নবীরূপে গ্রহণ করতে পারবে সেদিন নিঃসন্দেহে হিন্দু-মুসলীম মিলনের পথ আরো সুগম হবে। উভয়ের মধ্যে প্রেম, প্রীতি আর ভালবাসার বন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে। অতএব, হিন্দু ভাইদেরও উচিত রূপকের দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করে তাঁরা যেন শ্রীকৃষ্ণকে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে না রাখেন।*

* ২৮।১২।৭৩ তারিখে কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট্ অফ্ কালচার-এ প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

[পিলুবারোঁয়া—কাহারবা]

জয় ধরম-স্থাপনকারী।
দেবকীনন্দন যশোদাজীবন কৃষ্ণ কেশব মুরারি॥
দুর্জন-দলন সজ্জন-পালন গোবর্ধন-গিরিধারী
জয় যদুনন্দন যদুকুলনাশন ভূভারহরণকারী॥
নিখিল-শরণ মরণ-নিবারণ মুনিগণ-চিত-মনোহারী
নররূপ-ধারণ জগজনতারণ মোহন-মুরলীধারী॥

আদিগঙ্গা ও শ্রীচৈতন্য

শ্রীপ্রসিত রায় চৌধুরী

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় সামাজিক বিপর্যয় ও উপপ্লবের লগ্নে আবির্ভূত হয়েছিলেন আচার্য শঙ্কর। সারা ভারত পরিক্রমা করে জ্ঞান ও মনীষার মাধ্যমে বিরোধী শক্তিকে—তান্ত্রিক-বৌদ্ধ-কদাচারকে—পরাভূত করে আত্মস্থ করেছিলেন দেশ ও জাতিকে। তাঁর ছশো বছর পরে ভারতবর্ষ ইসলামী-তরঙ্গাভিঘাতে বিপর্যস্ত হবার উপক্রম হয়। সেই বিপর্যয় থেকে জাতি ও সমাজকে রক্ষা করার জন্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন শিখগুরু নানক আর—পূর্বপ্রান্তে শ্রীচৈতন্য। আচার্য শঙ্করের মতই শ্রীচৈতন্য প্রায় সারা ভারত পদব্রজে পরিভ্রমণ করে দেশের অমঙ্গলকর মতগুলিকে পরাভূত করেন। প্রাচীন ভারতের তীর্থগুলিকে উদ্ধার ও সংস্কার করে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চিন্তাদর্শগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটান। উনবিংশ শতকে বাংলাদেশে ইউরোপীয় চিন্তার অভিঘাতে যে নবজাগরণ ঘটে চৈতন্য-চিন্তাশ্রিত জাতীয় পুনরুজ্জীবনের গভীরতা ও ব্যাপকতা বোধ করি তার চেয়ে বেশীই হবে, কারণ উনবিংশ শতকের ইংরাজী-শিক্ষিত শ্রেণীমাত্র নব-জাগরণের ফলভাগী হয়েছিল—সাধারণ মানুষ ছিল বঞ্চিত। এই বঞ্চিত মানুষদেরই ধর্মীয় ও সামাজিক মুক্তির দিশারী ছিলেন শ্রীচৈতন্য। ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সংহতির বীজমন্ত্রটি তিনি শুধু বাংলাদেশ নয়, ছ'বছর ব্যাপী (১৫১০-১৫১৬ খ্রীঃ) ভারত পরিক্রমাকালে সমগ্র দেশ ও জাতিকে দিয়ে গেছেন। এই হেতু তিনিও অন্যতম ভারত-পথিক। পরবর্তী কালে, আচার্য শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যের মতই জাতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্য দেশ ও জাতির আত্মিক পরিচয় পেতে মহাভারতের পথে প্রান্তরে পরিক্রমা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। আচার্য শঙ্করের ভারত-পরিক্রমা-পথ আজ বিস্মৃতির অতলে। স্বামী বিবেকানন্দের পর্যটন-পথ প্রায় সবটাই জানা গেছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব মাত্র সাড়ে চারশো বছর আগে কোন্ পথ ধরে ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন, তা আজ বিতর্কের বিষয়। তাঁর চরিতকথা ও স্থানীয় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে একটা পরিভ্রমণ-পথ-রেখা অনুমান করা যায় মাত্র।

মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে রাঢ় দেশের অন্তর্ভুক্ত কন্টকনগরে (কাটোয়া) অদ্বৈতবাদী কেশব-ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্য ফিরে আসেন শান্তিপুরে। শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্যের গৃহ থেকে তিনি নীলাচল তীর্থের (পুরী) উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে। (শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার: চৈতন্য চরিতের উপাদান পৃঃ ১৪)।

"সেইক্ষণে মহাপ্রভু মত্তসিংহ গতি
চলিলেন শুভ করি নীলাচল প্রতি ॥"

(চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড ২য় অধ্যায়, পৃঃ ২৫৪, উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)।

আদিগঙ্গার তীর ধরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গড়িয়া-বৈষ্ণবঘাটায় আসেন। পথে আদিগঙ্গার তীরবর্তী কালীঘাট তীর্থ পড়ে। আদিগঙ্গার স্রোত তখন প্রখর, তার বিস্তারও বিপুল। অনেকের ধারণা, তিনি আদিগঙ্গার স্রোতেই নৌকা ভাসিয়ে নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা

হয়েছিলেন (১)। এ ধারণার কারণ, মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়, বাঙালী সওদাগরেরা আদিগঙ্গা পথেই সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দূর সমুদ্রপারের দেশগুলির উদ্দেশ্যে বাণিজ্যতরণী ভাসাতেন।

পঞ্চদশ শতকে রচিত বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে দেখা যায়, চাঁদ সওদাগর কালীঘাটে কালীপূজা করে ডিঙা ভাসিয়ে চলেছেন,—

"কালীঘাটে চাঁদরাজা কালিকা পূজিয়া।
চূড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া॥
ধনস্থান এড়াইল মহাকুতূহলে।
বাহিল বারুইপুর (২) মহাকোলাহলে॥
ছুলিয়া গাঙ্ বাহি চলিল ত্বরিত।
ছত্রভোগ (৩) গিয়া রাজা চাপায় বুহিত॥"

(বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসামঙ্গল', ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত পৃঃ ১৫০,১৫২)।

ষোড়শ শতকে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল" পুঁথিতে দেখা যায়, ধনপতি সওদাগর আদিগঙ্গায় চলেছেন,—

"লঘুগতি সদাগর যায় কালীঘাট।
দুই কূলে জপতপ যাত্রিকের ঠাট॥
তীরের মতন যেন চলে তরীবর।
তাহার মেলানি বাহে মাহিনগর॥
নাচনঘাটা, বৈষ্ণবঘাটা, বামদিকে থুয়া।
দক্ষিণেতে বারাসত গ্রাম এড়াইয়া॥
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে ধনপতি।
ছত্রভোগ উত্তরিল তীরসম গতি॥"

(কবিকঙ্কণ চণ্ডী, পৃঃ ২৪৭, অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৪৪ সাল)।

সপ্তদশ শতকে লিখিত কবি কৃষ্ণরামের "রায়মঙ্গল" পুঁথিতে দেখা যায়, বণিক পুষ্পদত্ত বাণিজ্য করে ফিরছেন আদিগঙ্গার স্রোতে ডিঙা ভাসিয়ে। কাকদ্বীপ ছেড়ে তাঁর ডিঙা—

---

(১) 'শ্রীচৈতন্য নীলাচল যাত্রাপথে আদিগঙ্গাতীরে আটিসারা গ্রামে অবতরণ করেছিলেন।' ('আটিসারা ও বারুইপুর'—পঃ বঃ সংস্কৃতি, পৃঃ ৬১৭;—বিনয় ঘোষ)।

(২) কলিকাতা হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত অর্ধ-শহর। এখানে প্রতাপাদিত্যের সৈন্যাধ্যক্ষ মদন রায়ের (মল্ল) কাছারীবাড়ী ছিল। মদন রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রাজবল্লভ রায় রাজপুরের পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বারুইপুরে চলে আসেন। সঙ্গে আনেন দেবী আনন্দময়ী (কালী) কে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এখানে নীলকর সাহেবদের কুঠিবাড়ী ও ব্যবসাকেন্দ্র ছিল। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র এইখানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস রচনা করেন। আলিপুর বোমার মামলার পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ এখানে এসে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। (১৯০৮ খ্রীঃ এপ্রিল)। বারুইপুরের দক্ষিণে ধপ্‌ধপি গ্রামের (এখানকার লোকদেবতা দক্ষিণ রায় বিখ্যাত) কাছে আদিগঙ্গার কূলে চাঁদ সওদাগরের নামে চাঁদোখালি গ্রাম আজও বিদ্যমান।

(৩) কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত। তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবনতির পর দক্ষিণ বঙ্গে শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। চীনা পর্যটক হুয়েন সাঙ্ এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তাঁর বর্ণনায় আছে, এখানে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল—বৌদ্ধ মঠও ছিল। পরবর্তীকালে এখানে শাক্ত ও শৈব ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে এ অঞ্চলের শাসনকর্তা রামচন্দ্র খাঁ বৈষ্ণব হলে এখানকার লোকেরাও বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করে। রামচন্দ্র খাঁর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজো আছে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণব-সমাজ কর্তৃক এখানে একটি পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাতে লেখা আছে ১৪৩১ শকে শ্রীচৈতন্যদেব এখানে পদার্পণ করেন। শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্তৃক এই পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত।

"উপনীত হইল ছত্রভোগ।"

"অম্বুলিঙ্গ মহাস্থান নাহি যার উপমান
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ।
বাদ্য বাজে সুমধুর বাহিয়া রাজা 'বিষ্ণুপুর'
'জয়নগর' করিল পশ্চাত।"

তারপর—

" 'বড়ু ক্ষেত্র' বাহিল আনন্দে।
'বারাসতে' উপনীত হইয়া সাধু হরষিত
পূজিল ঠাকুর সদানন্দে॥"

* * *

"সাধুঘাটা পাছে করি 'সূর্যপুর' বাহে তরী
চাপাইল 'বারুইপুরে' আসি।"

* * *

" 'মালঞ্চ' রহিলা দূর বাহিয়া 'কল্যাণপুর'
কল্যাণমাধবে প্রণমিল।
বাহিলেক যত গ্রাম কি কাজ করিয়া নাম
'বড়দহ' (৪) ঘাটে উত্তরিল॥"

(কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২৪৪, সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৫৮ খ্রীঃ)।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত কবি অযোধ্যারাম পাঠকের "সত্যনারায়ণের কথা"য় (অপ্রকাশিত পুঁথি) আছে, জনৈক সওদাগরের আদিগঙ্গা পথে যাত্রার কথা—

"কালীঘাটে পরিহরি বেয়ে চলে দ্রুত তরী
মহা আনন্দিত সদাগর।
... ... বামে রহে গ্রাম 'রসা'
বাহিল 'বৈষ্ণবঘাটা'...
'বারুইপুরে'র পর রত্নাকর সদাগর
সাধুঘাটা করিল পশ্চাত।..."

এরপর বারাসত গ্রামে বিশ্বনাথকে পূজা দিয়ে অম্বুলিঙ্গ, হাতিয়াগড়, পার হয়ে—

"গঙ্গা পরশিয়ে কপিলেরে প্রণমিয়ে
পূজে গঙ্গাসাগর মাধব।"

অষ্টাদশ শতকে রচিত হরিদেবের "শীতলামঙ্গলে" আদিগঙ্গাপথে সাগর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী বণিকের বর্ণনায় দেখা যায়—

" 'বোড়াল'-এ পুরায়ে প্রণিপাত
গুণার্ণব হরষিতে 'কুদল' এড়ায় তাতে
রসাঘাটে দিল দরশন।
মনে মানি পুলকিত কালীঘাটে একচিত্ত
নিরীক্ষিল কালীর চরণ॥"

[ক্রমশঃ

(৪) "বড়দহের" বর্তমান নাম "বড়দায় খোল"। কলিকাতা হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে রাজপুর পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত। ইহা রাজা মদন রায়ের নৌ-বন্দর ছিল।

পরলোকে প্রখ্যাত শিল্পিগণ

গভীর দুঃখের বিষয়, ভারতীয় সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে যাঁহাদের অবদান অবিস্মরণীয় এইরূপ পাঁচজন বিশিষ্ট শিল্পীকে আমরা গত ফেব্রুআরি মাসেই হারাইয়াছি :

আমীর খাঁ

সুপ্রসিদ্ধ খেয়াল গায়ক ওস্তাদ আমীর খাঁ গত ১৩ই ফেব্রুআরি ১৯৭৪, মধ্যরাত্রে দক্ষিণ কলিকাতায় এক মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন। রক্তাপ্লুত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁহাকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেইখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬২ বৎসর।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নাগপুরের আকোলা শহরে সংগীত-ঐতিহ্যময় এক পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহ ছঙ্গে খাঁ একজন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। ইন্দোর ঘরানার স্রষ্টা বলিয়া তাঁহার নাম উল্লিখিত হয়। পিতা শমীর খাঁ একজন প্রসিদ্ধ বীণকার ও সারেঙ্গীবাদক ছিলেন এবং তাঁহারই নিকট আমীর খাঁ দশ বৎসর বয়স হইতে সঙ্গীত-শিক্ষা শুরু করেন। ইন্দোরে তাঁহাদের গৃহে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-সাধকদিগের সমাগম হইত এবং ঐ সকল গুণিজনের সংস্পর্শে আসিয়া সঙ্গীতময় পরিবেশে কুড়ি বৎসর নিরন্তর সাধনা করিয়া আমীর খাঁ হিন্দুস্থানী কণ্ঠসঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে অল বেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্সে সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া একজন অসাধারণ সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি দেশের সর্বত্র বিস্তৃতিলাভ করে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবে তিনি কাবুল, কানাডা ও আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সঙ্গীত আকাদেমির সম্মান ও ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ‘পদ্মভূষণ’-উপাধি প্রাপ্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজঙ্কার

ধ্রুপদ সঙ্গীতের মহান শিল্পী, সুবিখ্যাত ডঃ রতনজঙ্কার বৃহস্পতিবার ১৪ই ফেব্রুআরি ১৯৭৪, বোম্বাই শহরে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

হিন্দুস্থানী কণ্ঠসঙ্গীতকে স্বকীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার ব্যাপক শিক্ষা ও প্রসারে যাঁহারা জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজীর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজঙ্কার ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে লখনউ ম্যারিস কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরবর্তী কালে কলেজটির ‘ভাতখণ্ডে ইউনিভারসিটি’, ‘ভাতখণ্ডে কলেজ অফ হিন্দুস্তানী মিউজিক’ ইত্যাদি বিভিন্ন নামকরণ হইলেও, তিনি সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর কাল উহার অধ্যক্ষপদেই অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাগসঙ্গীতের শিক্ষাধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। ১৯৫৭ হইতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি মধ্যপ্রদেশের খয়রাগড় ইন্দিরা কলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদ অলঙ্কৃত করেন। রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি অনেক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আকাশবাণীর তিনি অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া উত্তরকালে অনেকেই শিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ভারত সরকার তাঁহাকে ‘পদ্মভূষণ’ উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন।

অনাদিকুমার দস্তিদার

সুপ্রসিদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষক সঙ্গীতাচার্য অনাদিকুমার দস্তিদার সোমবার ৪ঠা ফেব্রুআরি ১৯৭৪, কলিকাতায় ৭১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি প্রথম সেরিব্রাল থ্রম্বসিস্ রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৬৬ সালে ঐ রোগের দ্বিতীয় আক্রমণে তিনি দীর্ঘ আট বৎসর যাবৎ শয্যাশায়ী ছিলেন।

তাঁহার আদি নিবাস শ্রীহট্ট। জন্ম ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। নয় বৎসর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতনে যান বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র হিসাবে। সতের হইতে বাইশ বৎসর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী, নকুলেশ্বর গোস্বামী ও রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট রাগসঙ্গীতও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে কলিকাতায় আসিয়া তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা দিতে শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ঐ কার্যে নিরত ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতশিক্ষক ব্যতীত তিনি একজন প্রখ্যাত স্বরলিপিকার ছিলেন। 'গীতবিতান'-নামক প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অধিকর্তা ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারে তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়।

অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

স্বনামখ্যাত শিল্পী ও শিল্প-সমালোচক অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় শনিবার ৯ই ফেব্রুআরি ১৯৭৪, কলিকাতায় নিজ বাসভবনে ৯৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। স্ট্রোকের ফলে গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি বিশেষ অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁহার শেষ তেরো দিন অজ্ঞানাবস্থায় অতিবাহিত হয়।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অগস্ট কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মাতামহ শ্রীনাথ ঠাকুর একজন সুদক্ষ মূর্তিকর ছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই অর্দ্ধেন্দ্র কুমার শিল্প-প্রেরণা প্রাপ্ত হন। শিল্পাচার্য যামিনীপ্রকাশ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া এবং স্বকীয় অনলস সাধনাসহায়ে তিনি একজন বিশিষ্ট শিল্পীতে পরিণত হন। অন্যদিকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯০০ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরেজীতে অনার্স লইয়া বি. এ. পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ছিলেন এবং ১৯৪৩ খ্রীঃ এ্যাটর্নীর পেশা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সুযোগ্য সচিব ছিলেন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'রূপম্' তাঁহার অসাধারণ শিল্পবোধের পরিচায়ক। শিল্পসম্বন্ধীয় বহু অমূল্য গ্রন্থ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার অসংখ্য প্রবন্ধাদি বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পাহাড়ী সান্যাল

অতুলপ্রসাদ-সঙ্গীতের ধারক ও বাহক সুপ্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র-অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল শনিবার ৯ই ফেব্রুআরি ১৯৭৪, 'করোনারি থ্রম্বসিস্'রোগে আক্রান্ত হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুআরি দারজিলিঙে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম নগেন্দ্রনাথ সান্যাল, কিন্তু 'পাহাড়ী সান্যাল' নামেই তিনি সুপরিচিত। লখনউ ম্যারিস কলেজ হইতে তিনি সঙ্গীত-উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্যকাল হইতে যৌবন পর্যন্ত দীর্ঘ ১২।১৩ বৎসর লখনউতে

তিনি অতুলপ্রসাদ সেনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। অতুলপ্রসাদ নূতন নূতন গান রচনা করিয়া তাহাতে সুর দিয়া সেই সুর স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন এবং প্রতিভাধর শিষ্য দু-একবার শুনিয়াই তাহা আয়ত্ত করিয়া সঙ্গীতগুরুকে শুনাইতেন। এইভাবে গানগুলির মৌল সুর তাঁহার জানা ছিল এবং অতুলপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকীতে তিনি বিভিন্ন সভাসমিতিতে গুরুর স্মৃতিচারণার সহিত প্রকৃত গায়নশৈলীরও পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। চলচ্চিত্র-অভিনেতা হিসাবে তিনি সুবিদিত। সে-সম্বন্ধে অধিক লেখাই বাহুল্য। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ দেড় শত চিত্রনাট্যে নানা ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান ছিল।

এই সকল প্রতিভাধর গুণিজনের মৃত্যুতে ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হইল। ইঁহাদের প্রতি আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। শ্রীভগবানের নিকট ইঁহাদের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি।

সমালোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণায়ন : শ্রীমাখন গুপ্ত। প্রকাশক : জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯। পৃষ্ঠা ১১০, মূল্য চার টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনেক জীবনী বেরিয়েছে তার মধ্যে শ্রীমাখন গুপ্ত রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণায়ন' একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংযোজন। অনেকটা লীলা-গীতির ঢংএ লেখা বইটির বৈশিষ্ট্য ঘটনাবিন্যাসে নয়, সুলিখিত গদ্য ও সাবলীল পদ্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থানে। ফলে রচনাটিতে যে কাব্যধর্মিতার প্রকাশ ঘটেছে তা কাব্যানুরাগী পাঠকের ভাল লাগবে। 'রামায়ণে'র কথা স্মরণে রেখেই যে আলোচ্য গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে তা সহজ-বোধ্য। কিন্তু রামায়ণ মহাকাব্য হলেও তা 'ইতিহাস'ও বটে। আধুনিক যুগের ইতিহাস কিন্তু অধিকতর ঘটনা-নিষ্ঠ। 'শ্রীরামকৃষ্ণায়নে' আমাদের প্রত্যাশিত ঘটনা-নিষ্ঠা কাব্যের খাতিরে মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়েছে।

উল্লেখ্য ত্রুটির মধ্যে, শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামের 'জ্যেষ্ঠা কন্যা কাত্যায়নীর বাড়ীতে' দেহত্যাগের ঘটনাটি শ্রীশ্রীঠাকুরের সবচেয়ে প্রামাণিক জীবনী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে'র বর্ণনার সঙ্গে মেলেনা। শেষোক্ত গ্রন্থানুযায়ী ক্ষুদিরামের মৃত্যু হয় তাঁর ভাগ্নের বাড়ীতে। পরবর্তী সংস্করণে এটি সংশোধিত হলে ভাল হয়।

বইটির ছাপা ও বাঁধাই ভাল। শ্রীশ্রীঠাকু-রের চিত্র-সমন্বিত প্রচ্ছদপটটি সুরুচিসম্মত।

স্বামী ভাস্করানন্দ

গৃহীর সাধনা (সহজ পথে) : শ্রীবিমল বিহারী হালদার। প্রকাশিকা : শ্রীমতী বীণাপাণি হালদার, ৮ ওল্ড কলিকাতা রোড, পোঃ তালপুকুর, জিলা চব্বিশ পরগণা। পৃষ্ঠা ১৭০, মূল্য ৫৲ টাকা।

ধর্মের অনুশীলন ব্যতীত জীবন প্রকৃত সুখ শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ হয় না। লেখক এই একান্ত প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গৃহী ব্যক্তিদের জন্য সাধন-ভজনের কতকগুলি উপদেশ পুস্তকটিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দুরূহ কাজটি তিনি সম্পাদন করিয়াছেন তাঁহার গুরুদেব

শ্রীশ্রীপাগল বাবার ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে। প্রতি মানুষে সুপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিকে জাগ্রত করিবার প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়কেই 'সাধনা' বলিয়া অভিহিত করিয়া গৃহী সাধকদের জন্য নিতান্ত সহজ সরল পদ্ধতিতে এবং তাহাদের স্ব স্ব ব্যক্তিগত ও সমাজগত উপজীবিকার সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া যে-প্রকার সাধনা করা সম্ভব হইবে, কেবলমাত্র তাহাই এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ২৫টি খণ্ডে বিভক্ত প্রথম অধ্যায়ে প্রাতঃকালীন কর্মসূচী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বগৃহে ইষ্টদেবদেবীর আসন প্রতিষ্ঠা, বাক্‌সংযমাদি সাধন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্যভাবে মূলসিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা হইয়াছে। লেখকের মতে : 'সুসম গার্হস্থ্য নীতিই গৃহী-সাধকের প্রকৃত ধর্মসাধন মনে করিতে হইবে।' পৃঃ ৬)— 'স্ত্রী পুত্র পরিবারই প্রকৃত সংসার-বন্ধনের হেতু নয়, অন্তরের কুসংস্কাররাশিই প্রকৃত বন্ধন।' (পৃঃ ২৪)—অথবা 'কর্ম যেন কখনও স্বার্থসূচক না হয়। যেরূপ কর্মের সাহায্যে পরিবার তথা দশের এবং দেশের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাকেই কেবলমাত্র "বিশুদ্ধ কর্ম" বলিয়া জানিবে।' পৃঃ ১৮)

৬০টি খণ্ডে বিভক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক নানাবিধ শাস্ত্রবাক্য ও মহাপুরুষগণের উপদেশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি শব্দ ও বিষয়ের নিগূঢ় অর্থও দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টাংশ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিপূরক। গ্রন্থটি গৃহীদের উন্নত জীবন যাপনে সাহায্য করিবে, সন্দেহ নাই। প্রচ্ছদপট সুন্দর ও মজবুত, ভাষা সরল ও সহজবোধ্য। আশা করি পুস্তকখানি সুধী পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইবে।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

গীতোক্ত সনাতন ধর্মের অনুশীলন

(চিত্তশুদ্ধির উপায়) : শ্রীঅমূল্য পদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : শ্রীমানস কুমার সান্যাল, ১৮২, এস্. এন্ রায় রোড, কলিকাতা-৩৮। পৃঃ ৩৮, মূল্য পঞ্চাশ পয়সা।

গ্রন্থখানি স্বল্পকায় হইলেও ইহাতে জাতীয় জীবন গঠনের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে আজকাল স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে কেবল ডিগ্রী-লাভের ও অর্থোপার্জনের দিকেই দৃষ্টি থাকে, কিন্তু নৈতিক জীবন গঠিত হইল কিনা সেদিকে কাহারও দৃষ্টি থাকে না। ফলে যে সকল তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিতেছে, তাহাদের অধিকাংশেরই নৈতিক মান অবনত। অপরপক্ষে পল্লীগ্রামের সরল ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ, যাহারা অশিক্ষিত বলিয়া উপেক্ষিত, তাহারা পূর্বোক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অনেক উন্নত।

গ্রন্থকারের মতে ধর্ম ও ঈশ্বরকে বাদ দিয়া জগতের প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম উদার—সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত। ভগবান সর্বব্যাপক ও সকলের মূল। এই বিচিত্র সৃষ্টিতে তিনিই সমন্বয়-সূত্র। যেমন মূল সুরকে বাদ দিয়া যন্ত্রসকলের ঐকতান সম্ভব হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরকে বাদ দিয়া মানবজীবনে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ঈশ্বরদৃষ্টি ত্যাগ করিলে ক্ষুদ্র অহঙ্কার উহার স্থান অধিকার করে এবং জগতে নানা অশান্তির সৃষ্টি করে। ইহার প্রতিকারের জন্য গ্রন্থকার শিক্ষার দ্বারা যাহাতে দৈবী সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে গীতার ষোড়শ অধ্যায়টি ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে বলিয়াছেন এবং পুস্তিকাটিতে সমগ্র ষোড়শ অধ্যায়টি অর্থসহ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রও নাই—সকল

ধর্মের সকল ছাত্রছাত্রীই ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবে।

গ্রন্থের শেষে গীতোক্ত সাম্যবাদের কথা উক্ত হইয়াছে এবং গীতা হইতে নানা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ঐ সাম্যবাদের স্বরূপ দেখান হইয়াছে। উহাই স্বাভাবিক সাম্যবাদ। ধর্ম ও ঈশ্বরকে বাদ দিয়া যে সাম্যবাদের কথা শ্রুত হয় তাহা অহংকারের চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত।

গ্রন্থকার বহু বৎসর শাস্ত্রচর্চা করিয়া কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থের রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি গ্রন্থই সুলিখিত, সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী। বর্তমান পুস্তিকাখানিও অনুরূপ। জাতিকে বাঁচিতে হইলে এবং জাতীয় জীবনে বলাধান করিতে হইলে এই পুস্তিকায় উক্ত উপায়গুলি অবলম্বন ও অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

মন্দিরের চাবি : শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। পরিবেশক : ফার্মা কে এল. মুখোপাধ্যায়, ২৫৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ২৭২ + ১২ ; মূল্য আট টাকা।

'মন্দিরের চাবি' একখানি কবিতা-গ্রন্থ। নামটির মধ্যেই পুস্তকটির অনেকখানি পরিচয় বিদ্যমান। যথার্থ মন্দির কি, কোথায়, মন্দিরের চাবি কিভাবে পাওয়া যায় ?—এই সব জিজ্ঞাসা আধুনিক মানুষের। গ্রন্থটিতে এই সকল প্রশ্নের যেমন বাস্তবধর্মী উত্তর পাওয়া যাইবে, তেমনি পাওয়া যাইবে গ্রন্থের নামকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য নাই এমন স্বতঃস্ফূর্ত রসোত্তীর্ণ রচনাসম্ভার।

আলোচ্য পুস্তকটি পরিবর্তিত ও বর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। বর্ষীয়ান্ কবি বাংলা কাব্য-জগতে প্রথিতযশা। ১৩৩৮ সনে সাহিত্যের চাবিতে সংস্কারের রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিবার প্রয়াসে যখন এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তখন সর্বসাধারণের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিপ্লবাত্মক ভাবের বাহক বলিয়া তদানীন্তন রাজ্য সরকার কর্তৃক পুস্তকখানির প্রচার নিষিদ্ধ হইয়া যায়। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে নানা পরিবর্তন আসে, বইখানির নিষেধাজ্ঞাও উঠিয়া যায় এবং ১৩৬২ সনে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাহার পর দীর্ঘ ১৮ বৎসর পরে বর্তমান তৃতীয় সংস্করণটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গ্রন্থে ১৮০টি কবিতা স্থান পাইয়াছে, সবগুলিই পড়িতে ভাল লাগে, কোন কোনটির ভাব মনের মধ্যে বসিয়া যায় :

'মন্দিরের দ্বারে' কবিতায় প্রশ্ন ও আবেদন—

'বলো, কা'র হাতে মন্দিরের চাবি ?
কোন সনাতনী দ্বিজ
অন্ধ অহংকারে নিজ
অস্বীকারে বঞ্চিতের দাবী ?
ফেলে দিক দেউলের চাবি,—
মেনে নিক প্রবেশের দাবী।' (পৃঃ ২)

'যুগসূর্য বিবেকানন্দ' কবিতায় কবির উক্তি

'আজিও ধ্বনিত হয় সে গম্ভীর মেঘমন্দ্র স্বর
সর্বজীবে এক আত্মা পরমাত্মা প্রত্যক্ষ ঈশ্বর।
প্রভায় ও প্রতিভায় কেহ নাই প্রতিদ্বন্দ্বী তা'র
পৃথ্বীর প্রতীচ্য প্রাচ্য নীরাজনা করে বারংবার।'
(পৃঃ ২০৫)

'লোকমাতা নিবেদিতা' কবিতায় কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি—

'স্নেহে লোকমাতা তুমি, ত্যাগে বৈরাগিণী
দেহ-গেহ-উপেক্ষিতা যৌবনে যোগিনী।
নিঃস্ব সন্ন্যাসিনী তুমি বিশ্বের বন্দিতা
বিবেকানন্দের পদে আত্মনিবেদিতা।' (পৃঃ ২০৬)

আমরা আশা করি পুস্তকটির এই নূতন সংস্করণ সুধীসমাজে সমাদৃত হইবে।

স্বামী জীবানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ১২ই ফাল্গুন, ১৩৮০, (২৪.২.৭৪) রবিবার, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৯তম পুণ্য জন্মতিথি উৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারাত্রিক, বেদপাঠ ও উষাকীর্তন এবং পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপারায়ণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, কালীকীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ২৫,০০০ ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ পান। সমগ্র দিন দলে দলে ভক্ত নরনারী হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি ভক্তি-বিনম্রচিত্তে নিবেদন করিতে সমাগত হন।

বৈকালে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ, ও শ্রীতামসরঞ্জন রায় বাংলায় এবং স্বামী চিদাত্মানন্দ ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাপতিত্ব করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরায় বলেন :

"আজ ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি ; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য আবির্ভাব তিথি। প্রায় সার্ধ শতবর্ষ পূর্বে দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে তাঁর সাধনযজ্ঞ উদ্‌যাপিত হয়েছিল। দ্বাদশবর্ষব্যাপী সেই বিশিষ্ট সাধনার ফলশ্রুতি অনন্ত। তাঁর সিদ্ধি ও প্রভাব আজ সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত।

"মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য কি ? এই প্রশ্ন শাশ্বত, সনাতন। ঠাকুর বলেছিলেন, মানুষের সর্বোত্তম লক্ষ্য ভগবান্‌-লাভ, সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য ধর্মানুভূতি। তার জন্য প্রয়োজন তপস্যার।

"ধর্মের আঙ্গিকের মধ্যে প্রযুক্তির দিকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কথায় নয়, তাঁর অনন্ত দেব-জীবনটিকে একটি জলন্ত জীবন্ত প্রত্যক্ষ আদর্শরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। ধর্মকে প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে আমরা কিভাবে রূপায়িত করব, তারও নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠাকুর। যাঁরা উচ্চ অধিকারী, তাঁরা তপস্যা করে চাপরাস লাভ করে ধর্মদান লোক-শিক্ষা প্রদান করবেন। সেইজন্য তিনি চিহ্নিত সাঙ্গোপাঙ্গকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। তাঁরা দেবমানুষ। আমরা সে-পর্যায়ের নই—আমরা সাধারণ মানুষ, মাটির কাছাকাছি যাদের বাস। আমাদের জন্য ঠাকুরের নির্দেশ সেবাধর্ম গ্রহণ করা। অনুকম্পা, দয়া নয়, দাতা দুঃখী জনকে দান করছে, এই বোধে নয়—শিব বোধে জীব সেবা করা। মানুষের মধ্যে নারায়ণ বহুরূপে প্রকাশিত এই বোধ নিয়ে জীব-সেবায় অগ্রসর হওয়া। উত্তরকালে স্বামীজী বলেছিলেন, 'দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা'। এই সেবায় অকপটে অগ্রসর হলে ধীরে ধীরে চিত্তশুদ্ধি হবে, আমরা নিঃস্বার্থ হব ও আত্মসংযমের অধিকারী হব। ধর্মের যা আসল কাজ—পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতা ও আত্মসংযম তা আমাদের হবে। স্বামীজী বলতেন : পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতা ও আত্মসংযমই ধর্মের সব। এর সঙ্গে একটি সাবধানবাণী উচ্চারিত হত,—কপটতার আশ্রয় নিও না, সরল হও—ভগবান তোমার সহায় হবেন। 'মন মুখ এক কর'. 'ভাবের ঘরে চুরি করো না'—ঠাকুরের এই সাধারণ উপদেশ সহজ বলে প্রতীত হয়। কিন্তু সহজ কথা এটি নয়—আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান এই সহজ উপদেশ এত সহজে জীবনে রূপায়িত হয় না। সেইজন্য ঠাকুর পুনঃ পুনঃ বলেছিলেন—অকপট নিষ্ঠা এবং সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

হয়ে জীব-সেবায় অগ্রসর হতে। তবেই ব্যষ্টির ও সমষ্টির কল্যাণ হবে।

"সত্যের কি বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছিল ঠাকুরের জীবনে। অত্যন্ত স্পর্শকাতর তাঁর দেহ-মনের যন্ত্রটিতে মিথ্যার ক্ষীণতম আভাস পর্যন্ত ধরা পড়ত। যোগীন মহারাজের আনা লেবু সম্পর্কিত ঘটনাটি তার প্রমাণ। সত্যস্বরূপ তিনি, তাঁর সমস্ত দেহমনে সত্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই সত্যকে আমাদের সাধ্যমত অনুসরণ করার নির্দেশ ঠাকুর দিতেন। আরো একটি নির্দেশ ছিল যে, সত্য অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সেবাধর্ম-পালন আর তার সঙ্গে হীন সঙ্কীর্ণ মনোভাব ত্যাগ, বিদ্বেষবুদ্ধি ত্যাগ। নিজের ধর্মকে নিষ্ঠাসহকারে অনুসরণ করার সমকালে অপরের মতকে অশ্রদ্ধা না করা বিদ্বেষ না করা।

"এই কয়টি নির্দেশ যুগের প্রয়োজনে যুগগুরু আমাদের দিয়েছেন। আজকে তাঁর জন্মতিথিতে জমাখরচ করা যেতে পারে, এই নির্দেশ ব্যক্তি ও সমষ্টি-জীবনে আমরা কতটা অনুসরণ করেছি আর কতটা করিনি। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে প্রতীত হয় এই শতাব্দীর তৃতীয় পাদে নানা চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাতে আমরা একে একে তাঁর নির্দেশকে উপেক্ষা করেছি—ভগবান্ লাভকে আদিম যুগের বর্বরতা বলে তুচ্ছ করেছি। মনীষী স্থামারশিল্ড বলেছেন: 'যেদিন আমরা ভগবানে বিশ্বাস হারাই সেদিন ভগবানের মৃত্যু ঘটে না—মৃত্যু ঘটে আমাদেরই।' বহির্ভারতের মনীষীরা ধর্মের যথার্থ সম্মান দিচ্ছেন, আর রামকৃষ্ণদেবের উত্তর-পুরুষ আমরা, যারা ধর্মপ্রাণতার গর্ব করে থাকি. তারাই ধর্মকে বিদ্রূপ করি, ব্যঙ্গ করি, তাচ্ছিল্য করি। জীবসেবার নামে আত্মসেবায় অগ্রসর হই নির্লজ্জভাবে।

"আশার অফুরন্ত প্রস্রবণস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মতিথিতে নৈরাশ্যের কথা বলছি না—শুধু আত্মবিশ্লেষণ করছি। আজকে বিশেষ করে তাঁর পদপ্রান্তে বসে আমাদের চিন্তা করতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেশের মানুষ যদি আমরা হয়ে থাকি, সত্যি যদি তাঁকে ভালবেসে থাকি, সত্যি যদি তাঁর পথ অনুসরণ করতে থাকি, তাহলে সোনার দেশ গড়ে তুলতে পারি না কেন? এ কৈফিয়ৎ ঠাকুরের কাছে আমাদের দিতে হবে। একথা বলছি এই জন্যে যে, আমরা যেন আত্ম-বিস্মৃত না হই।"

স্বামী চিদাত্মানন্দ বলেন:

"শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আমাদের কাছে এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্বরূপ। নিজ জীবনদৃষ্টান্তে মানুষকে পথ দেখাতে ভগবান অবতীর্ণ হন। অবতার কেবল রাক্ষস অসুরদের দমন করার জন্যই আবির্ভূত হন না, মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে চলার পথের এক দৃষ্টান্ত—এক আদর্শ-স্থাপন করতেও আসেন। সাধারণ মানুষ তাঁর জীবনদৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পথ চলে লক্ষ্য লাভ করে থাকে। স্বামীজী বলে-ছিলেন, তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল আমরা কি করব আর কি করব না, তা দেখাতে।

"ঠাকুর এসেছিলেন এক দুর্যোগের মুহূর্তে, যখন বিশ্বাসের সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন: 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন-কাহিনী ব্যবহারে প্রযুক্ত ধর্মের এক কাহিনী। তাঁর জীবন আমাদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বর দর্শন করায়। যে কেউ তাঁর জীবনী পাঠ করবেন, তিনি 'ভগবানই একমাত্র সত্য, বাকি অন্য সব মিথ্যা' এই বোধে বিশ্বস্ত না হয়ে পারবেন না। রামকৃষ্ণ ছিলেন ভগবন্ময়তার এক জীবন্ত বিগ্রহ স্বরূপ। এই সংশয়ের যুগে তাঁর জীবন জীবন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসের এক প্রোজ্জ্বল উদাহরণ, যা না পেলে সহস্র সহস্র নরনারী অধ্যাত্ম-আলোক বিবর্জিত হয়ে জীবন কাটাতো।'

"ঠাকুরের জীবন পণ্ডিতদের মতন নয়, তিনি

যা বলতেন তা আচরণ ধ্যান উপলব্ধির মাধ্যমে নিজের করে নিয়ে তৎস্বরূপ হয়ে গিয়ে বলতেন। ঠাকুর তাঁর ৫০ বৎসরের জীবনে সমগ্র মানব-জাতির ধর্মজীবন যাপন করে গেছেন। কেবল সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন ধর্মজীবনই যাপন করেননি, সংসারের মধ্যে থেকে সাংসারিক জীবনযাপনও করেছেন। তিনি যখন যা কিছু করতেন তা অকপট সারল্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন। নিষ্ঠা, অকপটতা কেবল ধর্মজীবনেই নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সাফল্যলাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন। যে সত্য তিনি বলতেন তা তিনি জীবনে আচরণ করতেন আর কোনরূপ লৌকি-কতার আবরণ দিয়ে সে সত্যকে ভূষিত করতেন না। সরল অনাড়ম্বরভাবে সত্য তাঁর জীবনে ফুটে উঠত। আনুষ্ঠানিক রীতি নীতি বাদ দিয়ে তিনি গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে 'দেখা দে মা' বলে কেঁদেছিলেন; তাঁর ঈশ্বর-ব্যাকুলতা এত গভীর ছিল যে তিনি মাটিতে মুখ ঘষড়ে কাঁদতেন, লোকে মনে করত, তিনি বুঝি শূল বেদনায় কষ্ট পাচ্ছেন। এই ব্যাকুলতাই তাঁকে জগন্মাতার দর্শনলাভে সাহায্য করেছিল।

"শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের মুক্তির জন্য সাধনা করেননি—নিজের জন্য তাঁর দেহধারণ নয়। এত বিভিন্ন সাধন, বিভিন্ন ধর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশাসন মানা—এসবই তাঁর লোক-শিক্ষার জন্য। ধর্মের প্রকৃত অর্থ বোঝাবার জন্যই তাঁর আগমন যুগ যুগ ধরে হয়ে থাকে। একারণেই এত গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সকল ধর্মের সার্বিকরূপকে তিনি বরণ করে-ছিলেন। ভাল-লাগা গাছ থেকে ভাল ফুল চয়ন করে তোড়া বাঁধার মতন বিভিন্ন ধর্মবৃক্ষের সুন্দর পুষ্পরাজি চয়ন করে ধর্ম-সমন্বয় তিনি করেননি। তিনি সকল ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছেন—তাদের ভিতর দিয়ে সত্যকে স্বয়ং উপলব্ধি করেছেন। দেখিয়েছেন, ভগবান এক, তাঁকে দেখা যায়, উপলব্ধি করা যায়, ছোঁয়া যায়—জীবনের ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্যও পাওয়া যায়। এক ভগবান, কেবল নাম ভেদ, আকার ভেদ—ভিন্ন ভিন্ন পথে এক সত্যে পৌঁছানো যায়। কেবল হিন্দুধর্ম নয়, সকল ধর্মই সত্য আর তিনি ছিলেন এই সত্যের প্রমাণ-পুরুষ।

"ধর্মান্তরিত হওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। সকল ধর্ম সত্য, কেবল মানুষকে নিজ নিজ বিশ্বাসে আচরণে অকপট হতে হবে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর হয়ে যাবে, সকল মানবের প্রতি সৌভ্রাত্র কল্যাণবোধ ও সকল ধর্মের প্রতি ভাল-বাসার রূপটি দেখাবার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। আর আমাদের পবিত্র কর্তব্য তাঁকে জানা বোঝা, তাঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করা।

"ঠাকুরের বিশেষ শিক্ষা ছিল ঈশ্বরই সত্য, কিন্তু তাই বলে জগতকে উপেক্ষা নয়। নিজে ষোল টাং করে তা দেখিয়েছেন আর আমাদের অন্ততঃ এক টাং করতে বলছেন—কিছু করতে হবে। এই করার প্রতি জোর দিয়েছেন তিনি। ঈশ্বরকে একমাত্র সত্য জেনে সকল কর্ম সম্পাদন করতে হবে। জগতের, সমাজের উন্নয়নের মূল্য কি? ঈশ্বরকে বাদ দিলে তাদের মূল্য হয় শূন্য। আর সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে ধরলে—সেই পূর্ণ এককে ধারণ করে শূন্যগুলি সাজালে তার মূল্য হয় অনেক। তেমনি ঈশ্বরকে ধারণ করে সমাজ-উন্নয়ন ইত্যাদি কর্ম করার নির্দেশ তাঁর। স্বামীজীকে তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। যখন নির্বিকল্প সমাধিতে স্বামীজী ডুবে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, ঠাকুর তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, আরো উচ্চ অবস্থা আছে, যেখানে সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে বহুরূপে, বহুভাবের মধ্যে প্রকাশমান দেখা যায়। সেই পরব্রহ্ম এই বিশ্বের সমস্ত ব্যাপ্ত করে বিরাজিত আছেন: সর্বত্র তাঁর হস্ত ও পদ, সর্বত্র তাঁহার চক্ষু ও কর্ণ

এবং সর্বত্র তাঁর মস্তক ও মুখ। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সকল মানুষে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করে তাঁর সেবা। এই কার্যকর বেদান্তের বিঘোষণা তিনিই স্বামীজীর মাধ্যমে করেছেন। ভগবানকে ধারণ করে পথ চলা। ভগবান্ লাভই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরবুদ্ধিতে মানুষকে ভাল-বাসা—বলেছিলেন, আমরা নিজেদের যেভাবে ভালবাসি, প্রতিবেশী আর সবাইকে যেন সেই-ভাবেই ভালবাসতে পারি। এই ভাবধারাতেই সার্থক হয়ে উঠবে সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির প্রয়াস—আর এই ভাবধারাই সকল উন্নতির একমাত্র ভিত্তিভূমি। সমাজকল্যাণ-দিয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের ধারণাকে ঠাকুর নূতন ভাবধারায় সার্থক করেছেন—কার্যকর বেদান্তের ভাবধারায় তাকে অভিষিক্ত করেছেন।

"এখানে উল্লেখযোগ্য তাঁর একটি কথা—চাপরাস আদায় করে কর্ম করা। তিনি তাঁর ভক্ত অনুগামীদের বলেছিলেন, 'জগতের কল্যাণ করার তুমি কে? আগে ঈশ্বরের দর্শনলাভ কর, চাপ-রাস পাও তারপর করো জগতের মঙ্গল। জগতের মঙ্গল তিনিই করেন, যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন।' কাজের পিছনে থাকে আমাদের বাসনা-পূরণের গোপন ইচ্ছা তাতে জগতের কল্যাণ হয় না। তাই নারায়ণবুদ্ধিতে জীবের সেবার কথা তিনি বলতেন। পরোপকার নয়—নরের মাধ্যমে নারায়ণের সেবা—এই ছিল তাঁর বাণী।"

সভাপতির অভিভাষণে স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন:

"ঠাকুর বলেছিলেন, নুনের পুতুল গিয়েছিল সমুদ্র মাপতে, তার গভীরতা কতটুকু প্রসারতা কতটুকু জানতে। কিন্তু মাপতে গিয়ে সে মিশে গেল তার সঙ্গে, ফিরে এসে আর খবর দিতে পারল না। আমরা যখন ভগবানের সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাই, তখন নিজের ক্ষুদ্রতা ভেবে আকুল হই। কি বলতে কি বলবো, শিব গড়তে বানর গড়ে ফেলবো না তো? তথাপি যেমন বলা হয়েছে শিবমহিম্নস্তোত্রে—"যদিও তাঁর মহিমা বাক্য-মনের অতীত, শ্রুতি যদিও সসঙ্কোচে একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে ঘুরিয়ে তাঁর মহিমার কথা বলেছেন, তবু—'পদে ত্বর্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ' —মায়াকে অবলম্বন করে ভগবানের যে রূপ তার প্রতি কার না মন ধাবিত হয়? কে না দুটো কথা বলতে চায়?" সেই ভাবে দুটো কথা বলতে চাই, যদিও সে-বলার অধিকারীও নিজেকে মনে করি না।

"শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবগাম্ভীর্য এবং ভাবপ্রসারতা, তাঁর নিষ্ঠা, উদারতা ভাবলে অবাক্ হতে হয়। তিনি নিজে বলেছেন, তাঁর অনুভূতি বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। তিন দিন মাত্র সাধনায় বসে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করে তিনি তোতাপুরীকে নির্বাক্ করেছিলেন। মানুষের পক্ষে এও কি সম্ভব? বটতলায় ধ্যান করছেন, দেখলেন একজন দেড়ে মুসলমান সান্‌কি করে ভাত নিয়ে সামনে এলো। সান্‌কি থেকে ভাত সকলকে খাইয়ে তাঁকেও দুটি দিয়ে গেল। প্রত্যক্ষ অনুভূতি হল, এক বই দুই নাই। বসে আছেন পঞ্চবটীতে—দেখতে পেলেন জন্ম-দুঃখিনী সীতাদেবীকে, যিনি মিশে গেলেন তাঁরই শরীরে। আরো কত কি! কত যে তাঁর দিব্য অনুভূতি ঘটেছে তার সীমা নেই। তাঁর অনুভূতি নেমে এসেছিল মনের ক্ষেত্রে—আত্মার গোপনস্তরেই তা লুকিয়ে থাকেনি, আবার মনকে অবলম্বন করে তা বিভিন্নক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে-ছিল। যেমন লেবু খাবার বা আফিং নেওয়ার দৃষ্টান্তে পাওয়া যায়। তাঁর দেহেতে প্রকাশ ঘটেছিল আত্মার মহিমার। মহাবীরের ভাবে সাধনা করার কালে লাঙ্গুলের মত কি যেন একটা গজিয়েছিল পশ্চাদ্ভাগে। মহাভাবের বিকাশে

শরীরের উত্তাপ এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাপ উপশমের জন্য যে গঙ্গামাটি গায়ে দিতেন তা উত্তাপে পুড়ে যেত। আরো কতো ভাবেই না মনের ভাবরাশি শরীরে প্রকাশ পেত! ভগবানকে পাননি বলে মাটিতে মুখ ঘষছেন—লোকে ভাবত শূল বেদনা হয়েছে—ভগবানের জন্য এত তাঁর ব্যাকুলতা সাধারণে বুঝবে কেমন করে? আকুলতা এমন বেড়েছিল, যে তিনি বলেছিলেন—মা দেখা দাও, তা না হলে আমি মাথা কেটে ফেলব। মাকে দর্শন দিতে হয়েছিল। ভগবানকে তিনি বিভিন্ন ভাবে সাদা চোখে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন, মা কালী ছোট্ট মেয়েটির মত ওপরে উঠে যাচ্ছেন নূপুর পায়ে ঝুমঝুম্ করে—মন্দিরের ওপরে এলোচুলে দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন করছেন। দেখেছিলেন তিনি মায়ের নাকে তুলো ধরে, মায়ের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সে তুলো নড়ে। তাঁর অনুভূতি আত্মা, মন, শরীরের ক্ষেত্রে কত রকমে বিকশিত হয়েছিল। আর তার প্রকাশ ছিল কিরূপ! কাশীপুরে যখন তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হউক'—তখন চৈতন্য হয়ে গিয়েছিল প্রত্যেকের—যে যে ভাবের, যে যে পথের, সে সে ভাবে অনুভূতি লাভ করে বিভোর হয়ে গিয়েছিল।

"স্বামীজীকে তিনি স্পর্শ করে তাঁর ভিতর শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। গিরিশবাবুকে তিনি নিজের মনের মত করে গড়ে নিয়েছিলেন। এমনি ছিল তাঁর আত্মিক শক্তি, এমনি ছিল তাঁর অনুভূতির প্রভাব। মানুষকে তিনি কাদার তালের মত হাতে করে গড়ে তুলতে পারতেন, যেমনটি তিনি চাইতেন তেমনটি।

"কোন ধর্মকে তিনি উপেক্ষা তো করেনইনি বরং সকল ধর্মকে সহজ সরল ভাবে গ্রহণ করেছিলেন,—সম্মান করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়ের বার্তার একটি মূল তথ্য এই যে, তিনি বুদ্ধি দিয়ে তা গড়ে তোলেননি। পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী বলেছিলেন ঠাকুর মতলব করে কোন কাজ করেননি। দার্শনিকরা হয়ত এখান থেকে খানিকটা ওখান থেকে খানিকটা কুড়িয়ে আনতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এ-ধরণের সমন্বয় করেননি। সমন্বয়ের বার্তা নূতন নয়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবদান এই যে, সমন্বয়কে তিনি প্রাণবন্ত, জীবন্ত করে তুলেছেন—নিজ জীবনে তাকে বরণ করে, মানুষের পক্ষে তাকে অবশ্য গ্রহণীয় এক আনন্দপ্রদ জিনিসরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

"তিনি যখন যে-সাধনা গ্রহণ করতেন, গভীর নিষ্ঠায় তখন তাতেই বিভোর থাকতেন। মুসলমান ধর্ম সাধনকালে ভুলে গেলেন জগন্মাতাকে পর্যন্ত। মুসলমানদের আচরণ রীতি নীতি গ্রহণ করে তাদের সাধনে তিনি নিমজ্জিত হয়েছিলেন, লাভ করেছিলেন তাদের সাম্য, দর্শন পেয়েছিলেন হয়ত বা মহম্মদের। তেমনি দর্শন পেয়েছিলেন যীশুখৃষ্টের। এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়, যেমন স্বামীজী বলেছিলেন—আমরা যে শুধু পরধর্মসহিষ্ণু তা নই, আমরা পরধর্মকে গ্রহণ করি স্বীকার করি তাদের সত্যতা। আমরা ধর্মকে ধর্ম বলেই জানি, সর্বত্র। আমি ধার্মিক হতে পারি, কিন্তু আমার জীবনে সে উদারতা নাও থাকতে পারে। যেমন সেই সেনাপতি বলেছিল, এই গ্রন্থাগারে যে পুস্তক আছে তাতে আমার ধর্মপুস্তকের অতিরিক্ত কোন কথা আছে কি? যদি তা না থাকে, তবে আমার ধর্ম-পুস্তকই যথেষ্ট। আর যদি বেশী কথা থাকে, তবে তা নিশ্চয় অবান্তর। সুতরাং পুস্তকাগার পুড়িয়ে দেওয়া হোক্। এও একপ্রকার ধর্মকে গ্রহণ করা, একপ্রকার ইষ্টনিষ্ঠা। এ থেকে আসে গোঁড়ামি, 'মতুয়ার বুদ্ধি'। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন সমস্ত মানবের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য, সেটা এই ধরণের ধর্মের ভিতর দিয়ে হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে ধর্মকে উপস্থাপিত করেছিলেন, তা যদি আমরা সহজ-সরলভাবে দেখি তাহলে তাকে তো অস্বীকার করা চলে না। স্বামীজী তাঁকে প্রণাম করেছিলেন 'স্থাপকায় চ ধর্মস্য' বলে—ধর্মের স্থাপন করতে তিনি এসেছিলেন। যা নাকি কতকগুলি রীতিনীতি লৌকিকতাতে পর্যবসিত হয়েছিল, তার ভেতরে একটা প্রাণ এনে দেওয়া, চলবার শক্তি এনে দেওয়া, একটা অগ্রগতির পথ দেখিয়ে দেওয়াই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান। মানুষকে—মানুষের ধর্মকে তিনি সজীব করে দিয়ে গেছেন।

"যে, যে-পথে চলেছে, যার যেমন রুচি সে সে-পথে চলুক, এ হচ্ছে সমন্বয়ের একটি মৌলিক কথা। সকলকে একটি ধর্মের ভেতর, একটা সুরে টেনে আনা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব নয়। মানুষের মন আলাদা, রুচি আলাদা ক্ষমতা আলাদা—সে তার নিজের পথে রুচি ক্ষমতা অনুযায়ী চলবে—তাকে চলতে দিতে হবে। সমাজ ও জগতের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে মেনে নিতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সমাজের জীবনের ধারা আছে, চলবার ভঙ্গি আছে, তাকে স্বীকার করে সকলকে নিয়ে চলতে হবে, তবেই হবে সত্যিকারের সমন্বয়। সকলে আমার মতে চলবে নাচবে গাইবে এ-সমন্বয়ের বার্তা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আসেননি। সকলে নিজ নিজ পুঁজি অনুযায়ী রুচি, অধিকার, ক্ষমতা অনুযায়ী চলবে, এই যে উদারতা ভালবাসা, সকলকে নিজের মত চলতে দেওয়া এবং নিজের মত করে নিজের মত গাড়তে দেওয়া, এই বার্তা নিয়েই এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রাচীন যুগে সমন্বয়ের বার্তা ছিল না, একথা আমি বলব না, ছিল। আকবর শাহ্ সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন—সেটা কিছুটা রাজনীতিকে আশ্রয় করে, যুক্তিকে অবলম্বন করে হয়েছিল, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যে সমন্বয় চান তা সত্যভিত্তিক, তা তাঁর অনুভূতি-ভিত্তিক। আর যেহেতু তা অনুভূতি-ভিত্তিক সেহেতু তা সত্যকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছিল, আর সেই কারণেই তা আজ হোক বা শতবর্ষ পরে হোক লোকে বুঝতে পারছে ও পারবে, গ্রহণ করছে ও করবে—শুধু ভারতে নয়, সর্বত্র। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের গ্রন্থে এই সমন্বয় ফুটে উঠছে। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের মিলন ঘটতে পারে, প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে বজায় রেখে—এই চিন্তাতেই মানুষ হয়েছে নিমগ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এবং বাণীর ভেতর দিয়ে ভগবানকে অবলম্বন করে, ব্রহ্ম ও সত্যকে অবলম্বন করে এই যে বাণী ফুটে উঠেছিল আজকের যুগে এইটিই হল আমাদের পথ—এই পথেতেই আমাদের চলতে হবে, তবেই হবে আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা।"

রাত্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা ও হোম হয় এবং রাত্রি শেষে সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ১৪ জনকে সন্ন্যাস ও ২৫ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

১৯শে ফাল্গুন, রবিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ মহোৎসব নানাবিধ মনোজ্ঞ কর্মসূচীর মাধ্যমে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগমে অনুষ্ঠিত হয়। বেদপাঠ, ভজন, বিভিন্ন স্থানের প্রসিদ্ধ কীর্তনদলের কীর্তন গান, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গপাঠ ও ব্যাখ্যা, সকল ধর্মের মূল গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। মধ্যাহ্নে প্রায় ৩০,০০০ ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ ধারণ করেন।

মঠ-প্রাঙ্গণে গঙ্গাতীরবর্তী বিরাট সুসজ্জিত মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয় ও তাঁহার সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে কীর্তনাদি হয়। অপরাহ্ণে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রদের অভিনীত 'নদের পাগল' পালাটি সকলের আনন্দবর্ধন করিয়াছিল।

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য : জানুআরি ১৯৭৩-এর শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সেবাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে মোট ৩১,৯৩,৬৩২৲ টাকা খরচ করা হইয়াছে। বিতরিত দ্রব্যের মূল্য উল্লিখিত হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নহে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯৭৩-এ কৃত সেবাকার্য নিম্নরূপ। উক্ত দুই মাসের হিসাব একত্রে দেওয়া হইল।

ঢাকা কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৩,৮২৩। বিতরিত হয় : বিস্কুট ২২৫.৫ কেজি, 'আস্ত্রা' ৭১'৫৫ কেজি, সি. এস্. কে. শিশুখাদ্য ১,৫৫০ পাঃ, গ্লাক্সো ৬৪০ পাঃ, গুড়ো দুধ ৪৫ পাঃ, ধুতি ১২৮, শাড়ী ২,৯৯২, লুঙ্গি ১,০৬৯, কম্বল ৪৮৯, সোয়েটার ১০,৫২১, শার্ট ৬, মশারি ২২, গামছা ১৪, পুরাতন বস্ত্রাদি ১,৫৬৪, সাবান ৯৮ খণ্ড, জুতা ১০ জোড়া ও বাসন-পত্র ১৭টি।

বাগেরহাট কেন্দ্র দুইটি বাড়ী নির্মাণ করে। চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১৬,৮১৮। বিতরিত হয় : বিস্কুট ১৬২ কেজি, গুড়ো দুধ ৭৫৪ পাঃ, ধুতি ৫৫, শাড়ী ১,৪৭২, লুঙ্গি ১৬৯, কম্বল ৭৯ ও শিশুদের পোশাক ১৫৩টি।

দিনাজপুর কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ২,৪৮৪। বিতরিত হয় : বিস্কুট ১৮ কেজি, ভিটামিন ট্যাবলেট ২,৪৩০ ও সাবান ১৯৫ খণ্ড।

শ্রীহট্ট কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৯,২৪২। বিতরিত হয় : ধুতি ১৬, শাড়ী ১৫, কম্বল ৭৪, সোয়েটার ১০৫, মশারি ৫, পুরাণো কাপড় ২৮৮, বাসনপত্র ৪১ ও ছাতা ৩০টি।

বরিশাল কেন্দ্রে ১,০৬১ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণকার্য : মেদিনীপুর জেলার **ঘাটাল** কেন্দ্রের মাধ্যমে গত ডিসেম্বর মাসে চাউল ৭ কুই., শাড়ী ১,৯৩০, কম্বল ২,১৭২, লুঙ্গি ২৭৬, শিশুদের পোশাক ৭২ ও পুরাতন বস্ত্রাদি ৪৯টি বিতরিত হয়। এই বন্যাত্রাণ কার্যটি গত ২০শে ডিসেম্বর সমাপ্ত হইয়াছে।

গুজরাতে বন্যাত্রাণকার্য : পালানপুর জেলার ভয়ানে **রাজকোট** আশ্রম বন্যাপীড়িতদের পুনর্বাসনের যে কাজটি আরম্ভ করিয়াছিল তাহা এখনও চলিতেছে। বনস্কণ্ঠ জেলার বন্যাপীড়িতদের মধ্যে ৬০০টি পশমের কম্বল বিতরিত হয়।

কার্যবিবরণী

জামশেদপুর : রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির ৪৫তম কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে এপ্রিল ১৯৬৫ হইতে মার্চ ১৯৭৩ পর্যন্ত আট বৎসরের হিসাব-পত্র ও আনুষঙ্গিক বহু তথ্য সন্নিবেশিত আছে। উহার সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কতিপয় উৎসাহী যুবক ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জামশেদপুরে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' নাম দিয়া একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত করে এবং বস্তি-অঞ্চলে নানাবিধ সেবাকার্য চালাইতে থাকে। টাটা ইস্পাত কারখানার কর্তৃপক্ষ এই প্রতিষ্ঠানের নিঃস্বার্থ সেবায় মুগ্ধ হইয়া ইহাকে একটি স্থায়ী কেন্দ্রে পরিণত করিবার জন্য এক খণ্ড ভূমি দান করেন। ২০শে নভেম্বর ১৯২৩, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী অভেদানন্দজী ঐ কেন্দ্রের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটি বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয় এবং উহার নাম হয়

'রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি'। ১৯২০ হইতে ১৯২৪ খ্রীঃ পর্যন্ত উহার কর্মধারা ভিক্ষুক-আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা, বস্তি-উন্নয়ন, ত্রাণকার্য পরিচালনা, রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা ও মৃতদেহের সংকার ইত্যাদি ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাধীন হওয়ার পর অনুন্নত ও দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উপরই অধিক জোর দেওয়া হইতে থাকে। মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন আন্দোলনে'র বহু পূর্বেই এই প্রতিষ্ঠানটি নিম্নজাতীয় বালকবালিকাদের জন্য অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় এবং শিশুদের জন্য দিবাভাগেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়াছিল।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রতিষ্ঠানটির কর্মধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। উপর্যুক্ত কারখানাটির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উহার কর্মচারীদের পুত্রকন্যাদের জন্য ও অন্যান্য বালকবালিকাদের জন্য নানাবিধ শিক্ষাগার স্থাপনের সনির্বন্ধ অনুরোধ আসিতে থাকে। ফলে মিশনের শিক্ষাদানকার্য বিপুলাকার ধারণ করে। ১৯৪২-৪৩ সালে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত বালকদের জন্য একটি ছাত্রাবাস খোলা হয়। উহা বর্তমানে বৃহদায়তন হইয়াছে এবং বিহারের গ্রামাঞ্চল হইতে আসিয়া ৮০ জন ছাত্র এখানে থাকিয়া বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। এ যাবৎ ৩০০ জনেরও অধিক ছাত্র এই ছাত্রাবাসে থাকিয়া মিশনের নানা বিদ্যালয়ে অথবা স্থানীয় কলেজসমূহে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ছাত্রেরা এখানে অত্যল্প খরচে থাকিতে পারে। হরিজন ও উপজাতীয় ছাত্রদের সর্বাগ্রে ভর্তি করা হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে সোসাইটির কাজকর্ম সর্বদিকে প্রসারিত হইয়াছে। জামশেদপুরের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহার অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব, দুর্গাপূজা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সোসাইটির বর্তমান কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ :

১। এগারটি বিদ্যালয় পরিচালনা—৫টি উচ্চ-মাধ্যমিক, ৪টি মধ্য-ইংরেজী এবং ২টি উচ্চ-প্রাথমিক। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ২টি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় বালিকাদেরই জন্য, ১টি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় লেখাপড়ায় অনগ্রসর বালকদের জন্য। বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাপ্রদ চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যার্থে কয়েকটি বিদ্যালয়ে 'বুক ব্যাঙ্ক' আছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক ও অশিক্ষক সকলেরই বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা, শিক্ষিকাদিগের জন্য মিনি-বাসে পরিবহনের ব্যবস্থা করা, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে আপৎকালে বিনাসুদে টাকা ধার দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কর্মিকল্যাণমূলক কার্য সোসাইটি করিয়া থাকে। ফলে সকল দিক দিয়াই বিদ্যালয়গুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

২। দুইটি ছাত্রাবাস পরিচালনা—একটি বিষ্টুপুরে, অপরটি সাকৃচিতে। গ্রামাঞ্চল হইতে যে-সকল ছাত্র জামশেদপুরে পড়িতে আসে, ছাত্রাবাস দুইটি তাহাদেরই জন্য। মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদিগকে থাকা-খাওয়ার জন্য কিছুই দিতে হয় না। কোনও ছাত্রের নিকট হইতে থাকা বা বিজলীর খরচ বাবদ কিছু লওয়া হয় না।

৩। জনসাধারণের জন্য একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালনা। বিষ্টুপুরে স্থাপিত এই

গ্রন্থাগার ও পাঠাগারে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ আছে। মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকাও রাখা হয়। বলা বাহুল্য, উপর্যুক্ত ১১টি স্কুলের প্রত্যেকটিতে তাহাদের নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে।

৪। স্থানীয় রোটারী ক্লাবের দানে একটি 'বুক ব্যাঙ্ক' পরিচালনা। কয়েকটি বিদ্যালয়ে যে পৃথক্ 'বুক ব্যাঙ্ক' আছে তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

৫। সোসাইটি নিয়মিত সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা এবং মাঝে মাঝে সমাজকল্যাণ ও ধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতাদির আয়োজন করে। প্রতি একাদশী তিথিতে রামনাম-সংকীর্তন করা হয়। মহাপুরুষ-দিগের আবির্ভাব-উৎসব, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালী-পূজা ইত্যাদিও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর দরিদ্রনারায়ণসেবা এবং স্থানীয় সরকারী হাসপাতালগুলির রোগীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

সোসাইটির উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি নিম্নরূপ:

১। গ্রামাঞ্চলের ৫০ জন মেধাবী দরিদ্র ছাত্রের বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থার জন্য একটি স্থায়ী তহবিল গঠন।

২। সাকৃচি ছাত্রাবাসের দ্বিতল-নির্মাণ, এবং এক শত ছাত্রের জন্য রন্ধন- ও ভোজন-শালা নির্মাণ। ইহার জন্য মোট ৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

৩। গ্রামাঞ্চলবাসীদের জন্য একটি হোমিও-প্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন।

৪। আশ্রমের বহির্ভাগে একটি অতিথিভবন নির্মাণ।

৫। পূর্বে উল্লিখিত ১১টি বিদ্যালয়ের মধ্যে দুইটি বিদ্যালয় বর্তমানে একই ভবনে বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু বিদ্যালয় দুইটির ছাত্র সংখ্যা বর্ধিত হওয়ায় দুইটি পৃথক্ ভবনের প্রয়োজন। 'টিস্কো'-কর্তৃপক্ষ ইহার জন্য এক খণ্ড ভূমি দান করিয়াছেন। এক্ষণে উক্তভূমিতে একটি নূতন ভবন নির্মাণ অত্যাবশ্যক।

৬। বিদ্যালয়গুলির প্রভূত উন্নতি সাধিত হইলেও, অভীপ্সিত রূপ দান প্রয়োজন।

কার্যবিবরণীর শেষে প্রদত্ত আট বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাবেও রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখা-কেন্দ্রটির শ্রীমণ্ডিত সুষ্ঠু পরিচালনার প্রতি-ফলন পরিলক্ষিত হয় এবং কার্যবিবরণীটি হিসাব-পত্রসহ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে প্রতিষ্ঠানটি যে রমা-বাণীর মিলনমন্দির, ইহা অনায়াসেই উপলব্ধ হয়।

উৎসব

পুরী: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৪ই জানুআরি হইতে ২০শে জানুআরি পর্যন্ত সাত দিন ধরিয়া স্বামী বিবেকানন্দের ১১২তম জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়।

১৪ই পূর্বাহ্নে জন্মতিথিকৃত্য বিশেষ পূজা হোম ও ভজনাদির মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয় ও তিন শতাধিক ভক্ত প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ জ্ঞানযোগ বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৫ই ওড়িশার বিশিষ্ট লেখক শ্রীগণেশ প্রসাদ পরিজা "শ্রীক্ষেত্র ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ"-সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। ১৬ই সন্ধ্যায় ওড়িশার বিশিষ্ট সংগীত-শিল্পিগণ ওড়িশি-সঙ্গীত ও ভজন গান করেন। ১৭ই সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে 'জাতি-সংগঠক বিবেকানন্দ' বিষয়ে একটি ছাত্র-সংসদীয় বিতর্কানুষ্ঠান হয়। উহাতে পুরী শহরের সমস্ত স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ অংশ গ্রহণ করে।

১৮ই সন্ধ্যায় পুরী পৌর প্রতিষ্ঠানের চেয়ার-

ম্যান শ্রীবামদেব মিশ্র মহাশয়ের পরিচালনায় 'বর্তমান সমাজে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসংগিকতা' বিষয়ে এক আলোচনাচক্রে অধ্যাপক শ্রীবাসুদেব পাঠী, অধ্যাপক মহাজিতেশ্বর দাস, অধ্যাপক শ্রীরাম পাণ্ডা, অধ্যাপক নারায়ণ শতপথী, পুরী. স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রীমহেশ প্রসাদ দস বেহেরা এবং পুরী আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীধনঞ্জয় দাস অংশ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১৯শে ওড়িশার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীরাজকিশোর রায়ের পৌরোহিত্যে একটি সভায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 'স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন ও 'স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার মানব-গঠন যোজনা' বিষয়ে ভাষণ দেন। সভাপতি মহোদয় স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করেন।

২০শে উৎসব-সমাপ্তির দিনে আহুত সাধারণ সভায় সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক শ্রীহৃদয়ানন্দ রায়। সভার প্রারম্ভে আশ্রম ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শ্রীকিশোরী মোহন দ্বিবেদী সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে স্বাগত জানান এবং আশ্রমের সহকারী সম্পাদক শ্রীদিবাকর ত্রিপাঠী আশ্রমের ১৯৭২-৭৩ সালের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। ভাষণ দেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও সভাপতি শ্রীহৃদয়ানন্দ রায়। সভান্তে স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভা-সমাপ্তির পর 'পুরী লোক-সম্পর্ক বিভাগ' কর্তৃক 'স্বামী বিবেকানন্দ'-শীর্ষক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

বিবিধ

বাগেরহাট: গত ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও তার-বিভাগের মন্ত্রী জনাব শেখ আব্দুল আজিজ সাহেব বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয় এবং গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত জনতার সম্মুখে মন্ত্রী মহোদয় তাঁহার ভাষণে মিশনের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহনির্মাণকল্পে পাঁচ শত টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। আশ্রমাধ্যক্ষ শুভেচ্ছার নিদর্শন-স্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বলিত কিছু পুস্তক মন্ত্রী মহোদয়কে উপহার দেন।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগের সংবাদ জানাইতেছি:

স্বামী আত্মরূপানন্দ গত ১৭ই ফেব্রুআরি সকাল ৭-৩০মি:-এ বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত নানাবিধ ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতাহেতু তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘের কনখল কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার সঙ্ঘ-জীবনের অধিকাংশ কালই বারাণসী সেবাশ্রমে কর্মী হিসাবে অতিবাহিত হয় এবং শেষ কয়েক বৎসর তিনি সেখানেই অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন।

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ গত ১৯শে ফেব্রুআরি, বেলা ১০টার সময় বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৬৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কিছুকাল ধরিয়া তিনি চেষ্টীয় স্নায়ুসমূহের অবক্ষয় ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। তাহাতে অঙ্গসকল ক্রমশঃ পঙ্গু হইয়া পড়িতে থাকে ও সর্বশেষে

শ্বাসযন্ত্রও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ায় তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট দীক্ষালাভ করিয়া ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাঁথি আশ্রমে তিনি সংঘে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। বরিশাল, রেঙ্গুণ, কলিকাতা (বাগবাজার), দিল্লি ও মাদ্রাজ মঠের তিনি কর্মী ছিলেন এবং দেওঘর বিদ্যাপীঠ ও সারদাপীঠের (বেলুড়) অধ্যক্ষ ছিলেন। মাদ্রাজ মঠের পুস্তক-প্রকাশন-বিভাগের বিস্তারে ও দেওঘর বিদ্যাপীঠের সমুন্নতিতে তাঁহার অবদান প্রচুর।

কাশীপ্রাপ্তিতে ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

ভূপাল (মধ্যপ্রদেশ): শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৩, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১২১তম জন্মতিথি বিশেষ পূজা হোম ভজন কীর্তন এবং তাঁহার পুণ্য জীবনকথা-পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ১০০ জন ভক্ত প্রসাদ ধারণ করেন।

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের ১১২তম জন্ম-তিথি-উৎসবও অনুরূপভাবে গত ১৪ই জানুআরি ১৯৭৪, উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষ্যে সাধারণ উৎসব হয় পরবর্তী রবিবার ২০.১.৭৪ তারিখে। প্রায় ৬০০ জন ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণ বসিয়া প্রসাদ পান এবং 'জনগণের নৈতিক মান-উন্নয়নে স্বামীজীর আদর্শ ও শিক্ষা' বিষয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় ভাষণ দেন স্বামী সত্যকামানন্দ, স্বামী পরানন্দ, ভূপাল ডিভিশনের কমিশনার শ্রী এন্ ভি. কৃষ্ণন্, শ্রীমতী এস্. চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী-প্রচার সংঘের সম্পাদক শ্রী বি. ভি. পাণ্ডে এবং শ্রীঅশোক চৌধুরী।

হুগলী: বিবেকানন্দ সংঘ গত ১৪ই ও ২০শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের ১১২তম পুণ্য জন্মতিথি পালন করেন। হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সংঘের ৮টি কেন্দ্রে স্বামীজীর ভাবধারার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়:

(১) বৈঁচিকেন্দ্র প্রাতে স্বামীজীর পত্র-সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন।

(২) বাঁশবেড়িয়া কেন্দ্র সন্ধ্যায় শ্রীজয়দেব চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'বেদান্ত' সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

(৩) দেবীপুর কেন্দ্র মধ্যাহ্নে শ্রীরোহিণী-কান্ত ঘোষের সভাপতিত্বে 'স্বামীজীর সমরনীতি' বিষয়ে আলোচনা করেন।

(৪) পাহাড়হাটী কেন্দ্র অপরাহ্নে শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে স্বামীজীর পত্র-সাহিত্যের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করেন।

(৫) চাঁপাহাটী কেন্দ্র অপরাহ্নে 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি ছিলেন শ্রীতিনকড়ি মুখো-পাধ্যায়।

(৬) ত্রিবেণী কেন্দ্র অপরাহ্নে 'সর্বাবয়ব বেদান্ত' বিষয়ে আলোচনা করেন।

(৭) চারাগ্রাম কেন্দ্র রবিবার ২০শে জানুআরি

অপরাহ্নে 'স্বামীজীর সমরনীতি' বিষয়ে আলোচনা করেন।

(৮) চুঁচুড়া ময়নাডাঙ্গা কেন্দ্রেও ২০শে জানুআরি অপরাহ্নে 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রীপবিত্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিকড়া-কুলীন গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে গত ১১ই মাঘ শুক্রবার (২৫।১।৭৪), ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের পুণ্যাবির্ভাব-উৎসব শত শত ভক্ত নরনারীর উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের সন্ন্যাসিবৃন্দ কর্তৃক পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়। সকাল ছয় ঘটিকা হইতে স্থানীয় গায়কগণের কীর্তন ও ভজন গান হয় ও পরে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজী ও মহারাজের পুষ্পসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ একটি বিরাট শোভাযাত্রা খোল, করতালাদি বিবিধ বাদ্যভাণ্ড এবং কীর্তন সহযোগে সমগ্র পল্লী পরিক্রমা করে। বেলা ১০ ঘটিকা হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত রহড়া বালকাশ্রমের ছাত্রবৃন্দ কীর্তন, ভজন ও বাউল সংগীত পরিবেশন করে। মধ্যাহ্নে বিভিন্ন স্থান হইতে আগত চারি সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী ও দরিদ্রনারায়ণকে বসাইয়া খিচুড়ি ও পায়েস প্রসাদ দিয়া পরিতৃপ্ত করা হয়। অপরাহ্নে উপর্যুক্ত বালকাশ্রমের ছাত্রবৃন্দ "শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন" করে ও পরে ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্তবিভাগ কর্তৃক বসিরহাট মহকুমায় ইছামতী নদীর উপর এক নবনির্মিত সেতু "স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেতু" নামে অভিহিত করা হউক—এই মর্মে এক প্রস্তাব সভায় উত্থাপিত হইলে সর্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়। সন্ধ্যারতির পর রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা-মন্দির কর্তৃক "রানী রাসমণি" ছায়াচিত্র শত শত নরনারীর উপস্থিতিতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত হয়। রাত্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ সারারাত্রি কালীকীর্তন পরিবেশন করিয়া সকলের আনন্দবর্ধন করেন।

খিদিরপুর : গত ২৪শে ফেব্রুআরি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ও সংগীত সংস্থা 'স্বরবিতান' ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা'-শীর্ষক এক ভক্তি-মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সংস্থার শিল্পিবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে রচিত বিশেষ সংগীত পরিবেশন করেন। প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন।

পরলোকে খগেন্দ্রনাথ মিত্র

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩, ভোর ৪টার সময় ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মিত্র কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৮১ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসরোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

তিনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার দিন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সস্ত্রীক দীক্ষালাভ করেন। যৌবনে তিনি কথামৃতকার মাষ্টার মহাশয়ের পূত সংস্পর্শে আসেন।

রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল যখন বকুল বাগানে ছিল, তখন তিনি উহার 'প্যাথোলজিস্ট' ছিলেন। তাঁহার রচিত 'ল্যাবরেটরি গাইড্' নামে একটি পুস্তক আছে। গত ৩৪ বৎসর তিনি কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে 'প্যাথোলজিস্ট'রূপে সেবাকার্যে নিরত ছিলেন।

এই নির্ভীক ও হৃদয়বান পুরুষের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে সমাগত হন। তাঁহার প্রয়াণে আমরা একজন ঈশ্বরপরায়ণ সেবানিষ্ঠ ভক্তকে হারাইলাম। কাশী-বিশ্বনাথ তাঁহাকে দেহত্রয়ের বন্ধন হইতে চিরতরে মুক্তি দিয়াছেন।

পরলোকে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য, নিষ্ঠাবান দেশকর্মী, সাহিত্যিক ও চারণ কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় গত ১৭ই ফেব্রুআরি মধ্যরাত্রে কল্যাণীর গান্ধী স্মৃতি হাসপাতালে ৭৬ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন; পিতার নাম কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়। অতি অল্প বয়স হইতেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত তিনি যুক্ত হন; ১৯২২ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এজন্য তাঁহাকে চারিবার কারাবরণ করিতে হয়। ১৯৫২ হইতে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ছিলেন। শেষ বয়সে নদীয়া জেলার বড়-আন্দুলিয়ায় লোকসেবা শিবির ও 'গদাধরের' (শ্রীরামকৃষ্ণের) মন্দির স্থাপন করিয়া সেখানেই বাস করিতেছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-প্রচারার্থে সেখানে প্রতি বৎসর একটি 'গদাধরের মেলা'-র ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।

কিছুদিন তিনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। 'দেশ', 'দৈনিক কৃষক', 'লোক-সেবক' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। 'উদ্বোধন'-পত্রিকার একজন নিষ্ঠাবান লেখক ছিলেন তিনি। ৪০ খানি কবিতা- ও প্রবন্ধ-পুস্তক তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

নিরহঙ্কার, সদালাপী, সদাপ্রফুল্ল বিজয়লাল সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

[পুনর্মুদ্রণ]

বাঙ্গাল।

(কবিবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

হরেন্দ্র ও রাধাকান্ত স্কুলে এক ক্লাশে পড়িত। রাধাকান্ত পাড়াগেঁয়ে ভালমানুষ,—স্কুলে বাঙ্গাল বলিত। হরেন্দ্র দাঙ্গাবাজ, চট্‌পটে, বড় মানুষের ছেলে। জুড়ি গাড়ী চড়িয়া আসে, স্কুলে সকলে ভয় করে, এমন কি মাষ্টার পর্য্যন্ত তটস্থ। রাধাকান্তের চক্ষে হরেন্দ্র দেবতা। রাধাকান্ত মনে করিত যে, হরেন্দ্রের মত হইলে জীবনে আর কিছু বাকী রহিল না।

স্কুলের দিন ফুরাইল, এখন উভয়েই সংসারে। হরেন্দ্র রাধাকান্তকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাধাকান্ত হরেন্দ্রকে ভুলে নাই। পথে ছাতা ঘাড়ে করিয়া যাইতেছে, দেখে- হরেন্দ্র তীরবেগে টম্‌ টম্‌ হাঁকাইয়া চলিল। চৌঘুড়ির ভেপু শুনিয়া ফিরিয়া দেখে—হরেন্দ্র হাঁকাইতেছে। ঘোড়-দওয়ারে ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইতেছে। যেখান দিয়া হরেন্দ্র যায়,—এসেন্সের গন্ধে আমোদ করিয়া যায়। বেশের পারিপাট্য সৌখিন লোকের আদর্শ। হরেন্দ্র যেখানে যায়, সেইখানেই পাঁচ জন চাহিয়া দেখে।

একদিন রাধাকান্ত একটী থিয়েটারে আট আনার টিকিট কিনিয়াছে, থিয়েটারের দোর খুলে না—সেজন্য সাম্‌নে বেড়াইতেছে। এমন সময়ে হরেন্দ্রের জুড়ী আসিয়া লাগিল। হঠাৎ রাধাকান্তের প্রতি নজর পড়িল,—অমনি পূর্ব্ব পরিচিত স্বরে, "কিরে বাঙ্গাল" বলিয়া হাত ধরিল। রাধাকান্তের একেবারে মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। তখন সে স্বর্গে কি মর্ত্তে, তাহার হুঁশ রহিল না। হরেন্দ্র বলিল, "কিরে বাঙ্গাল, থিয়েটার দেখ্‌বি ?" রাধাকান্তের উত্তর সরিতেছে না। "চল্‌" বলিয়া উপরে লইয়া গেল। দ্বাররক্ষকেরা সসম্ভ্রমে হরেন্দ্রকে সেলাম দিল। ম্যানেজার তটস্থ হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। স্বয়ং বক্সের চাবি খুলিয়া দিয়া হরেন্দ্রকে বসিতে অনুরোধ করিল। থিয়েটারে ধূমপান নিষেধ, কিন্তু হরেন্দ্র থিয়েটারের ম্যানেজারের সাম্‌নে সুন্দর সিগারকেস হইতে সিগার বাহির করিয়া, রূপার কৌটা হইতে মোমের দেশলাই জ্বালিয়া চুরুট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিল। যাহারা হরেন্দ্রের সঙ্গে ইয়ার বক্‌সি ছিল তাহারাও হরেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া লাটের মত চুরুট মুখে দিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাধাকান্ত অবাক্‌! হরেন্দ্র রাধাকান্তকে চুরুট দিল, কিন্তু রাধাকান্ত পান করিতে সাহস করিল না। একটী সুন্দর ছোট শিশি বাহির করিয়া হরেন্দ্র রাধাকান্তের গায়ে এসেন্স ছড়াইয়া দিল। রাধাকান্ত ভাবিল,—এ আরেবিয়ান নাইটের গল্প চলিতেছে। রাধাকান্ত থিয়েটার দেখিবে কি হরেন্দ্রকেই দেখে! "ড্রপসিন" পড়িল। বিশেষ খাতির করিয়া ম্যানেজার হরেন্দ্রকে "গ্রিন রুমে" লইয়া গেল। রাধাকান্তের হাত বগলে লইয়া, হরেন্দ্র "গ্রিন রুমে" গেল। সঙ্গীরাও সঙ্গে রহিয়াছে। "গ্রিন রুমে" রাধাকান্ত দেখে যে, 'একট্রেস' সকলেই হরেন্দ্রকে চেনে ও বড় খাতির করে। 'একটার' সকলেও বিশেষ অনুগত। একজন হরকরার কাছে কতকগুলি

ফুলের তোড়া, ফুলের মালা ছিল,—হরেন্দ্র 'এক্ট্রেস' মহলে বিতরণ করিল। খড়ি মাথা, চোখ আঁকা, পরচুলপরা সুন্দরীরাও বিশেষ যত্নের সহিত হরেন্দ্রের দান গ্রহণ করিল। রাধাকান্ত অবাক্। হরেন্দ্র রাধাকান্তকে বলিল, "চল্ বাঙ্গাল, এখানে আর নয়। তুই কোথায় থাকিস্? চল্ তোর বাসা দেখে যাই।" রাধাকান্তের ঘোর বিপদ হইল,—একটা ছোট হোটেলে থাকে, বাপ্‌রে কি করে হরেন্দ্রকে লইয়া সেথা যায়! মাথা চুলকাইতেছে,—হরেন্দ্র বলিল, "কেনরে, তুইত মেসে থাকিস্। চল্‌না, কোথা থাকিস্ দেখে যাই।" রাধাকান্ত মাথা চুলকাইয়া বলিতে লাগিল, "সে বড ভাল জায়গা নয়,—সে বড ভাল জায়গা নয়।" হরেন্দ্র ব[illegible] "তবে আয়, আমার বাড়ীতে আয়।" সঙ্গীদের পশ্চাৎ রাখিয়া, "তোমরা সেকেনক্লাস গাড়ী ভা[illegible] করিয়া আসিও" বলিয়া, রাধাকান্তকে জুড়ীতে লইয়া, হরেন্দ্র নিজ বাড়ীতে আসিল। রাধাকান্ত দেখে,—ইন্দ্রালয়। বৈঠকখানায় সুন্দর কার্পেট পাতা দেখিয়া রাধাকান্ত জুতা খুলিতে যা[illegible] হরেন্দ্র বলিল, "দূর বাঙ্গাল! চল্ জুতা পায়ে দিয়াই চল্।" "ভিক্টোরিয়া কোচে" রাধাকান্তকে বসাইয়া হরেন্দ্রও বসিল। গোলাপ জলে ফেরান গুড়গুড়িতে অম্বুরী তামাক সাজিয়া, শুভ্র প[illegible] খানসামায় আনিয়া দিল। রূপার পাত মোড়া পানের খিলি, পরিপুষ্ট ছোট এলাচ, স্বর্ণপাত্রে [illegible] টিপাই সরাইয়া, ভৃত্য তাহার উপর রাখিল। স্বর্ণ গ্লাসে বরফ দেওয়া সরবত আনিয়া দিল। হরেন্দ্র বলিল, "বাঙ্গাল খা।" রাধাকান্ত এক চুমুক পান করিয়াই ভাবিল—"ইহাই অমৃত!" পরে,— 'কেমন আছিস্?' 'কি করিস্?'—এই সমস্ত খপর হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল। রাধাকান্ত সদাগরের বাড়ীতে বিল সরকারী করে, মেসে হোটেলে থাকে, ২৫৲ টাকা বেতন পায়—কোনরূপ কায়ক্লেশে চলে। এ কথা ও কথার পর হরেন্দ্র হুকুম দিল, "বাবুকে গাড়ী করিয়া বাড়ীতে রাখিয়া আয়।" রাধাকান্ত পথের মাঝেই নামিতে চায়—কেননা রাজসদৃশ পরিচ্ছদ ভূষিত সহিস কোচম্যানকে তাহার হোটেল দেখাইতে নারাজ। নামিতে চাহিল,—সহিস দোর খুলিয়া দিল। কিন্তু উৎপাত থামিল না! পেছনে পেছনে চোপদার রাধাকান্তের বাসা দেখিতে চলিল। নিত্য রাধাকান্ত নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যায়—সে দিন আর নিদ্রা নাই।

পরদিন প্রাতে রাধাকান্তকে একজন চোপদার খুঁজিতেছে। হোটেলের দোরে মস্ত জুড়ী। চোপদার রাধাকান্তকে সেলাম করিয়া, বাবু সেলাম দিয়াছে—জানাইল। রাধাকান্ত মুখে জল দিয়া, পূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধানে জুড়ীতে হরেন্দ্রের বাটী আসিল। যে ঘরে হরেন্দ্র শুইয়া আছে, সে ঘরে টেবিল চেয়ার নাই, গদী পাতা ঢালা বিছানা। হরেন্দ্র শুইয়া আলবোলায় তামাক টানিতেছে। রাধাকান্ত যাইবামাত্র, হরেন্দ্র বলিল,—"চল্, নাইবি চল্।" রাধাকান্ত ভাবিতেছিল যে, চৌবাচ্চায় নাইতে যাইব। তাহা নহে দো'তালা ঘরের ভিতর দিয়া চলিল। দো'তালা ঘরের ভিতর নাইবার ঘর! চারিদিকে সাসি আঁটা। টব সুবাসিত জলে পরিপূর্ণ, সুগন্ধতৈল ও সাবান। আল্‌নায় পরিচ্ছদ, তোয়ালে, ও গামছা রহিয়াছে। দুইটি জলের নল। একটীতে গরম জল,—একটীতে শীতল জল। দুইজন চাকরে রাধাকান্তকে স্নান করাইল। স্নান সমাপ্ত হইল। সুন্দর বসন, সুন্দর জামা,—তাহার ছেঁড়া জুতার পরিবর্ত্তে একটি সুন্দর কার্পেটের স্লিপার রহিয়াছে। নানাবিধ ফল, মিষ্টান্ন, সরবৎ।—জলযোগের পর রাধাকান্ত আফিষে যাইতে ব্যস্ত হইল। হরেন্দ্র বলিল, "আজ আর আফিষে যাস্‌নি।" সর্ব্বনাশ—মাহিনা কাটিবে!—কিন্তু

কিছু বলিতে পারিল না। আহারাদি সমাপ্ত হইল। উত্তমশয্যায় রাধাকান্ত নিদ্রা গেল। নিদ্রাভঙ্গে হরেন্দ্র বলিল, "তুই আর সে বাসায় যাস্‌নি। তোর হিসাব পত্তর চুকাইয়া দিয়েছি। আমার বাড়ীর সাম্‌নে বৈঠকখানা বাড়ীতে তুই থাক্।—আর খরচার জন্য এই টাকা নে।"—দশ টাকার করিয়া পাঁচশো টাকার নোট দিল। নোট হাতে দিয়া বলিল, "আপাততঃ খরচ কর্, আর আফিষে যাস্‌নি।" রাধাকান্তের পিতাও এত টাকা একসঙ্গে দেখেন নাই। ভাবিতে লাগিল, একি স্বপ্ন দেখিতেছি! একসপ্তাহ এইরূপে যাইবার পর, একদিন হরেন্দ্র বলিল, "চল্—তোদের দেশে যাব।" রাধাকান্তের হৃদ্‌কম্প হইল, কিন্তু হরেন্দ্র ছাড়িল না। রাধাকান্তকে অগত্যা হরেন্দ্রকে দেশে লইয়া যাইতে হইল। হরেন্দ্র একাই রাধাকান্তের সহিত চলিল। চাকর বাকর সঙ্গে লইল না। পথে রাধাকান্ত কতই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু হরেন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে যখন মাদুরে বসিয়া দাকাটা তামাক পরম তৃপ্তির সহিত টানিতে লাগিল,—রাধাকান্তর কতক চিন্তা দূর হইল। রাধাকান্তর মা, ছেলের বন্ধুকে ছেলের মত যত্ন করিয়া চিঁড়েভাজা, চালভাজা, তিলভাজা তেলনুন মাখিয়া জল খাইতে দিল। তখন রাধাকান্ত আড়ষ্ট। কিন্তু হরেন্দ্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত ভাজাভুজি, গুড়পাটালী খাইল, অতি উপাদেয়দ্রব্য তাহাকে এরূপভাবে খাইতে রাধাকান্ত দেখে নাই। তাহার পর অন্ন, কলাইএর ডাল, সজিনা খাড়া চচ্চড়ি, আধপোড়া পোনা মাছ ভাজা, উত্তম ঘৃত দুগ্ধ,—পুত্রবৎ যত্নের সহিত রাধাকান্তের মা, হরেন্দ্রকে খাইতে দিল। হরেন্দ্র বাটীতে যাহা খাইত—তাহার দ্বিগুণ খাইল। তথাপি মা মাগী ঘোমটা টানিয়া কথা কহিয়া বলিল, "বাবা, আর দুইটী ভাত ভাঙ্গিয়া নাও। আহা বাবা,—ঐ খেয়ে জোয়ান বয়সে কি করে থাক্‌বে?" এই সকল স্নেহবাক্যে হরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। রাধাকান্ত সাবান সঙ্গে লইয়াছিল। বালিসের ওড় বিছানা প্রভৃতি কাচিয়া রাখিয়াছিল। শয্যা প্রস্তুত করিয়া ভাবিতেছিল, হরেন্দ্রের নিকট শয়ন করিবে। হরেন্দ্র জেদ করিয়া বাড়ীর ভিতর শুইতে পাঠাইল। পরদিন প্রাতে রাধাকান্তের চাকর—"রাখাল" "মাহিন্দর" ও অন্যান্য কৃষি চাকরেরা, হাতে কলিকা টানিতে টানিতে হরেন্দ্রকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "হ্যাগা বাবু, তোমার বাড়ী কি নিজ কোল্‌কাতায়?" চোখ টিপিয়া রাধাকান্ত বারণ করে, তাহারাও মানে না, হরেন্দ্রও শোনে না। রাধাকান্তর বাপ বাড়ী ছিল না। মাঠে কৃষাণদের জলখাবার লইয়া যাইতে লোকের অভাব হইতেছিল। রাধাকান্ত সভয়ে শুনিল, হরেন্দ্র বাড়ীর ভিতর গিয়া বলিতেছে "মা, আমাকে দাও আমি জলখাবার লইয়া যাই।" মা মাগীরও আক্কেল নাই!—একধামা মুড়ি ও খানিকটা গুড় দিয়া বলিল,—"হ্যাঁ বাবা যাও, কর্ত্তা বাড়ী নাই, দু'জনে গিয়ে দিয়ে এস।" মাগীর একদিনেই হরেন্দ্রকে ঘরের ছেলে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। রাধাকান্তের বাপ ফিরিয়া আসিয়া হরেন্দ্রকে যথেষ্ট যত্ন করিল। আপনি তামাক সাজিয়া, দু'এক টান টানিয়া হুঁকা রাখিয়া যায়। হরেন্দ্রের ব্যবহারেও রাধাকান্তের পিতা পরম পরিতৃপ্ত হইল। হরেন্দ্র প্রায়ই কৃষিদিগকে খাওয়ায় ও তাহাদের সহিত খায়। সন্ধ্যার পর তাহাদের সহিত নৃত্যগীত করে। সাঁতার দেয়,—এক সঙ্গে ছোটে,—কখনও বা তাহাদিগকে তামাক সাজিয়া খাওয়ায়। এই সকল দেখিয়া রাধাকান্তের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল।—"এ কে!—এ কি আমার সত্যকার আপনার ভাই?"

এইরূপ কয়েক দিন যায়। এক দিন কলিকাতা হইতে হঠাৎ পত্র আসিল,—হরেন্দ্রের

নামে পুলিশ হইতে ওয়ারিণ বাহির হইয়াছে। রাধাকান্তকে হরেন্দ্র বলিল, "কে ওয়ারিণ বাহির করিয়াছে জানিস্? আমার মা!" রাধাকান্ত কিছুই বুঝিতে পারিল না। কলিকাতায় আসিয়া দেখিল সত্যই তাহার মা ওয়ারিণ বাহির করিয়াছে। দিন দিন রাধাকান্ত বুঝিতে লাগিল,—যে, হরেন্দ্রের এ কি সংসার! মার সহিত নানান্ মকদ্দমা চলিতেছে। মাগী, পুত্রের কথা না শুনিয়া দাওয়ানের কথায় ওঠে বসে।—সে যা বলে, তাই শোনে। শুনিতে পাইল, স্ত্রীও খোরাকের নালিশ করিয়া পুলিশ হইতে খোরাকির বন্দোবস্ত করিয়াছে। সমান চালই চলে। রাধাকান্ত হরেন্দ্রের বাজার সরকার, হরেন্দ্রের কার্য্যাধ্যক্ষ। যে সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন সকলই আনে,—তাহার কমিশনে বিশেষ লাভ। সাহেব সুবো, উকীল মোক্তার দোকানদার, দালাল সকলে সভয়ে বশীভূত—রাধাকান্তের বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল।

রাধাকান্ত হরেন্দ্রের প্রিয় বন্ধু, সকলেই জানিয়াছে; কিন্তু বাগানপার্টিতে রাধাকান্তকে দেখে না। একদিন মহাসমারোহের বাগানপার্টি। হরেন্দ্র যাইতেছে। রাধাকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে?" হরেন্দ্র বলিল, "বাগানে।" রাধাকান্তের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিল, তাহার যাইতে নেহাৎ ইচ্ছা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "যাইবি?" রাধাকান্ত কিছু বলে না। হরেন্দ্র আপনিই বলিল, "চল্, ঘরের সুখ দেখিয়াছিস্,—বাহিরের সুখ দেখিবি।" বাগান যেন অমরাবতী,—তাহে মহাসমারোহের নিমিত্ত সুসজ্জিত। চারিদিকে নাচ, গান, বাদ্য, স্যাম্পেনের ফোয়ারা চলিতেছে। ক্রমে যেন দৈত্যের কৌশলে আনন্দস্থান নিরানন্দময় হইল। ঝগড়া, মারামারি, কান্না, কলহ! মুদ্দারের ন্যায় গড়াগড়ি, মল, মূত্র, বমন, স্থান অতি কুৎসিৎ হইল। রাধাকান্তকে হরেন্দ্র বলিল, "দেখ্‌লি? এখন আর এক কীর্ত্তি দেখ্‌বি চল্।" হরেন্দ্রের জুড়ী সোনাগাছির এক বড় বাড়ীর দোরে আসিয়া লাগিল।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ একখানি পাল্কীগাড়ী আসিয়াও পৌছিল। এ গাড়ীর সোয়ারী চারিটি স্ত্রীলোক। তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিয়া, বাটীর ভিতর গিয়া, সিঁড়ীতে উঠিতে না উঠিতে হরেন্দ্রকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিল। হরেন্দ্র কিছু না বলিয়া রাধাকান্তকে বলিল, "দেখছিস্ বাঙ্গাল, দেখছিস্।" এ কথায় স্ত্রীলোকটির আরও তর্জ্জন গর্জ্জন বাড়িল। কিল, চড় চলিতে লাগিল। হটাৎ কর্ণকুহর ভেদিয়া একটি শিসের ধ্বনি হইল। রমণী চমকিল, হরেন্দ্র বলিল, "রাধাকান্ত, শ্যামের বাঁশী বেজেছে শুনতে পেয়েছিস্?" এবং প্রিয় উপপতি শিস্ দিয়া ইসারা করিতেছেন। যুবতী উত্তরে কত কথা বলিতে লাগিল, সে সকলে কর্ণপাত না করিয়া রাধাকান্তের সহিত হরেন্দ্র জুড়িতে উঠিল। গাড়ীতে রাধাকান্ত পরিচয় পাইল যে, স্ত্রীলোকটী থিয়েটারের "একট্রেস"। হরেন্দ্র তাহার রূপমোহে আবদ্ধ হইয়াছে। ইহার একজন প্রিয় উপপতি, অতি কদর্য্য, হীন ব্যক্তি। হরেন্দ্র যে সময় না থাকে, সে সময়ে তাহার অধিকার। জানিয়া শুনিয়াও হরেন্দ্র তাহার রূপমোহ কাটাইতে পারে না। হরেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কথা সমাপ্ত করিল। কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "কেমন সুখে আছি দেখ্‌ছিস্? তোর সখ হয়েছিল দেখাইলাম। আর এরূপ স্থানে আস্‌বার ইচ্ছা করিস্ নি!"

হরেন্দ্র উপদেশ দিল বটে, কিন্তু রাধাকান্তের বক্ষে একজন তয়ফাওয়ালীর নয়নবাণ বিদ্ধ হইয়াছে। পাপচিত্র দর্শন করিয়া যিনি মনে করেন,—পাপ লিপ্সা দূর হয়, তিনি তাঁহার সৌভাগ্য-

ক্রমে কখনও পাপের ছবি দেখেন নাই। পাপের অতি অদ্ভুত আকর্ষণ! যিনি পাপদৃশ্য কাল-সর্পের ন্যায় না পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি জীবনে পাপসহচর হইবেন—সন্দেহ নাই। এ দাসত্বমুক্তির সদ্গুরুর চরণ ব্যতীত অনন্যোপায়! দুঃখের তাড়নাতেও বাসনা-সাগর নিবৃত্ত হয় না। রোগে শোকে মনোমোহনকারী চিত্র, হৃদয় হইতে ছিন্ন করিতে পারে না। যদি কাহারও কখন হয়, তিনি অতি ভাগ্যধর।

পাপ বাসনা উদ্দীপ্ত। হাতে যথেষ্ট অর্থ,—সময়, সুযোগও সহকারী, রাধাকান্তের শীঘ্রই অধঃপতন হইল। রোজকারে কুলায় না. চারিদিকে দেনা, ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। রাধাকান্ত ঋণজালে জড়িত হইল। হরেন্দ্রের বাড়ী যাতায়াত করে, কিন্তু প্রায়ই দেখা হয় না। হরেন্দ্র নির্জনেই থাকে। বাজারে রাষ্ট্র, হরেন্দ্রের সর্ব্বস্ব গিয়াছে। কিন্তু গাড়ী. জুড়ি, লোক, লস্কর, আসবাব, পোষাক, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। রাধাকান্ত কিছু বুঝিতে পারে না। রাধাকান্তের দেন্দারেরা বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। হরেন্দ্রের খাতিরে যে সকল স্থানে তাহার খাতির ছিল ও যথায় যথায় অর্থোপায় হইত, তাহা সমস্তই বন্ধ হইয়াছে। দেনা প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। এ অবস্থায় কি করে। একদিন কোনও ক্রমে হরেন্দ্রের সহিত দেখা করিল ও আপনার অবস্থা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া সাহায্য চাহিল। হরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, বলিল,— "এখন যা।"

দিন দুই পরে সহরে রাষ্ট্র হয় হরেন্দ্রের এক খুড়ীর কাশীলাভ হইয়াছে। বিস্তর বিষয়,—হরেন্দ্র তাহার অধিকারী। ইহার দুই চারিদিন পরেই এক দিন রাত্রে হরেন্দ্র রাধাকান্তকে ডাকাইল। রাধাকান্ত বাড়ী ঢুকিবে, এমন সময়ে পূর্ব্ববঙ্গীয় একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাটী হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিল। রাধাকান্ত তাহাকে চেনে এবং অনেকবার তাহার নিকট টাকাও কর্জ্জ করিয়াছে। হরেন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া আছে—এমন সময়ে রাধাকান্ত পৌঁছিল। হরেন্দ্র বলিল,—"বাঙ্গাল, আমার কথা শুনিস্ নাই, আপনার সর্ব্বনাশ করেছিস্! যা, এবার তোর ঋণ মুক্ত করিয়া দিতেছি।—এই ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ শোধ করিস্, আর এই দশ হাজার টাকা নে,—ইহা লইয়া দেশে গিয়া থাক্। যদি ভাল হইয়া না চলিস্, তা'হলে তোর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। তোকে আমি এখনও ভালবাসি। এবার যদি বুঝিয়া না চলিস্, তা'হলে আমার মন হ'তে দূর হবি!" হরেন্দ্র আবার বলিতে লাগিল, "তোরে কেন ভালবাসি জানিস্? বোধ হয় জানিস্ না? মা, আমার নয় জানিস্,—স্ত্রী আমার নয় জানিস্,—যে কাঠকুড়ানীকে রাজরাণী করিয়াছি, সে আমার নয় জানিস্,—যে সকল পথের ভিখারীরা আমার ধনে, অট্টালিকায় "বাবু" হইয়া বসিয়াছে—তাহারা আমায় উপহাস করে জানিস্, পারিষদেরা, যাহারা আমার অর্থে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহারা পশ্চাতে আমাকে গালি দেয় তাহাও জানিস্!—দাস-দাসীরা অর্থের উপাসনা করে—আমার নয়! কিন্তু সত্যই হউক,—আমার ধারণা, তুই সেই স্কুল হইতে আমাকে, আমার নিমিত্ত ভালবাসিতিস্। স্কুলে তোর মাথায় চাঁটি মারিয়াছি, "বাঙ্গাল" বলিয়া উপহাস করিয়াছি;—কিন্তু তত্রাচ তুই আমার অতি ক্ষুদ্র উপকার করিতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতিস্। চুরী করিবার যত সুযোগ দিতে হয়, দিয়াছিলাম, ইহাতে তুই ধনকুবের হতে পারতিস্, কিন্তু আমার টাকা তোর দেহের শোণিত জ্ঞান করিয়াছিস্।

কাহাকে কখনও বলি নাই, আজ তোকে বলি,—আমার জীবন দুঃখময়। কবে সুখী হইয়াছি জানিস্ ?—যে কয়দিন তোদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তোর মাকে 'মা' বলিয়া, তোর বাপের চরণ বন্দনা করিয়া, তোর চাকরদের সঙ্গে খেলিয়া, প্রিয়তমা ভগ্নী অপেক্ষা তোর পরিবারের আদর পাইয়া, মরুময় উত্তপ্ত জীবনে, কএকদিন শীতল বারি পড়িয়াছিল। যা এখন যা—আমি শোব।"

রাধাকান্ত টাকা লইয়া, বাটী হইতে বাহির না হইতে হইতে গাড়ী তৈয়ার করিবার হুকুম শুনিল। এক জন ভৃত্য ছুটিতেছে, তাহার নিকট সংবাদ পাইল,—বোটমাঝিকে তলপ। রাধাকান্ত কিছু বুঝিতে পারিল না। হরেন্দ্রের কথা শুনিয়া, হরেন্দ্রের নিমিত্ত তাহার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল। ভাবিতেছিল, আবার তাহাকে দেশে লইয়া যাইবে, যেরূপে তাহাকে সুখী করিতে পারি—সেইরূপে করিব।

পরদিন প্রাতে রাধাকান্ত একখানি চিঠি পাইল,—হরেন্দ্রের হস্তাক্ষর—পড়িয়া রাধাকান্তের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। পত্রের মর্ম্ম এই,—"আমার খুড়ী কোন কালে কেহ ছিল না। জাল করিয়া তোকে টাকা দিয়াছি। আমার যদি কোন উপকার করিতে চাস্ তাহা হইলে শোদ্‌রা! কুসঙ্গ ছাড়িয়া, আমার সংসর্গে মিশিবার অগ্রে যেরূপ ছিলি, সেইরূপ থাকিবি। তা'হলে জান্‌বি, আমি পরম শান্তিতে থাকিব। পৃথিবীতে আর কেহ কখনও আমার দেখা পাইবে না। কখন কখনও আমায় মনে করিস্।" পত্র পাঠ করিয়া রাধাকান্ত উন্মত্তের ন্যায় হরেন্দ্রের বাটী ছুটিল। শুনিল, বাবু বোটে করিয়া কোথায় যাইতেছিল। মাঝগঙ্গায় জালি বোট করিয়া মাঝি মাল্লাদিগকে কূলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কূলে উঠিয়া মাঝিরা সভয়ে দেখিতে পাইল, বোট খানি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার পর আর হরেন্দ্রের কোনও সংবাদ নাই। রাধাকান্ত বাসায় ফিরিয়া আসিয়া যে টাকা হরেন্দ্রের নিকট পাইয়াছিল,—সঙ্গে লইল। দ্রুত গমনে যে পূর্ব্বদেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে গত রাত্রিতে হরেন্দ্রের বাটী হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়াছিল, তাহার নিকট চলিল। ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট দলিল দেখিয়া বুঝিল যে, হরেন্দ্র খুড়ীর বিষয় মর্টগেজ করিয়া টাকা লইয়াছে। সমস্ত টাকা ফেরত দিয়া ও পত্রখানি দেখাইয়া দলিল পুড়াইয়া ফেলিল। ধনী আশ্চর্য্য হইল। রাধাকান্তের সততায় ভাবিল, ইহার ন্যায় কর্ম্মচারী পাইলে, আমার কার্য্য উত্তমরূপে চলিবে। রাধাকান্তের দেনদারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহার বৃহৎ পাটের কারবারের বখরাদার করিল। কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত ঋণ রাধাকান্তের হিস্যা হইতে পরিশোধ হইল এবং অল্প দিনে কিছু ধন সঞ্চয় করিয়া, কার্য্যে অবসর লইয়া রাধাকান্ত স্বদেশে গেল। নিত্য সন্ধ্যার সময় বন্ধুর জন্য ভাবে। এক দিন ভোরে স্বপ্ন দেখিল,—হরেন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা ধূমধামে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। মধুর হাসিয়া বলিতেছে, "বাঙ্গাল, তুই আমার জন্য আর ভাবিস্‌নি, আমি তোর ভালবাসায় পরম শান্তি লাভ করিয়াছি।"

—:*:—

পরমহংসদেবের উপদেশ

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

(১) নিষ্ঠা ভক্তি না হ'লে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। যেমন এক পতিতে নিষ্ঠা থাকলে সতী হয়, তেমনি আপনার ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা হলে ইষ্ট দর্শন হয়।

(২) হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাটি জ্বাললে তখনই আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম জন্মান্তরের পাপও তাঁর একবার কৃপা দৃষ্টিতে দূর হয়।

(৩) মলয়ের হাওয়া লাগলে, যে সব গাছের সার আছে, সেই সব গাছে চন্দন হয়, কিন্তু অসার যেমন বাঁশ, কলা ইত্যাদি গাছে কিছু হয় না। ভগবৎকৃপা পাইলে যাঁদের সার আছে তাঁরাই মুহূর্ত্তের মধ্যে মহা সাধুভাবে পূর্ণ হন, কিন্তু বিষয়াসক্ত অসার মানুষের সহজে কিছু হয় না।

(৪) মানুষ—যেমন বালিসের খোল, বালিসের খোল উপরে দেখতে কোনটা লাল, কোনটা কাল; কিন্তু সকলের ভিতরে সেই একই তুলো। মানুষ দেখতে কেউ সুন্দর, কেউ কাল, কেউ সাধু, কেউ অসাধু, কিন্তু সকলের ভিতর সেই এক ঈশ্বরই বিরাজ করছেন।

(৫) যেমন জালার ভিতর কোনখানে একটি ছোট ছিদ্র থাকিলে ক্রমে ক্রমে সব জল বেরিয়ে যায়, তেমনি সাধকের ভিতরও একটু সংসারাসক্তি থাকিলে সব সাধনা বিফল হইয়া থাকে।

(৬) পরমহংসদেব কোন এক তার্কিক লোককে বলেছিলেন, যদি এক কথায় বুঝতে পার ত আমার কাছে এস; আর খুব তর্ক যুক্তি করে যদি বুঝতে চাও, তো কেশবের (কেশবচন্দ্র সেন) কাছে যেও।

(৭) আর এক ব্যক্তি তাঁকে বলেছিলেন "আমার এক কথায় জ্ঞান হয় এমত উপদেশ দিন।" তিনি বলিলেন,—'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা।' এইটী ধারণা কর বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

ভাব্‌বার কথা।

ঠাকুর দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। দর্শন লাভে তাহার যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে—বুঝি আদান প্রদান সামঞ্জস্য করিবার জন্য—গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোণে থাম হেলান দিয়া চোবেজি ঝিমাইতেছিলেন। চোবেজি মন্দিরের পূজারী, পাহলওয়ান, সেতারী—দুই লোটা ভাঙ্‌ দুবেলা উদরস্থ করিতে বিশেষপটু এবং অন্যান্য আরও অনেক সদ্‌গুণশালী। সহসা একটা বিকট নিনাদ চোবেজির কর্ণপটহ প্রবলবেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায় সম্বিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজির বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষস্থলে "উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে"—হইল। তরুণ অরুণ কিরণ বর্ণ ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ন ইতস্তত: বিক্ষেপ করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধায়ী চোবেজি আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজির সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া কর্ম্মবাড়ির কড়া মাজার ন্যায় মর্ম্মস্পর্শীস্বরে নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক, কলাবত গুষ্টির সপিণ্ডিকরণ করিতেছে। সম্বিদানন্দ উপভোগের প্রত্যক্ষ বিঘ্নস্বরূপ পুরুষকে মর্ম্মাহত চোবেজি তীব্র বিরক্তি-ব্যঞ্জক-স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "বলি বাপুহে ও বেসুর বেতাল কি চীৎকার করছ?" ক্ষিপ্র উত্তর এলো "সুর তানের আমার আবশ্যক কিহে? আমি ঠাকুরজির মন ভিজুচ্চি।" চোবেজি—"হুঁ. ঠাকুরজি এমনই আহাম্মক কি না? পাগল তুই—আমাকেই ভিজুতে পারিস্‌নি ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?"

ভগবান অর্জ্জুনকে বলেছেন—তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু করবার দরকার নাই, আমি তোমায় উদ্ধার করিব। ভোলাচাঁদ তাই লোকের কাছে শুনে মহাখুসী; থেকে থেকে বিকট চীৎকার—আমি প্রভুর শরণাগত আমার আবার ভয় কি? আমায় কি আর কিছু কর্ত্তে হবে? ভোলাচাঁদের ধারণা—ঐ কথাগুলা খুব বিট্‌কেল আওয়াজে বারম্বার বল্‌তে পারলেই যথেষ্ট ভক্তি হয়, আবার তার উপর মাঝে মাঝে পূর্ব্বোক্ত স্বরে জানানও আছে যে, তিনি সদাই প্রভুর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত! এভক্তির ডোরে যদি প্রভু স্বয়ং না বাঁধা পড়েন তবে সবই মিথ্যা। পার্শ্বচর দু চারটা আহাম্মকও তাই ঠাওরায়। কিন্তু ভোলাচাঁদ প্রভুর জন্য একটিও দুষ্টামি ছাড়্‌তে প্রস্তুত নন। বলি ঠাকুরজি কি এমনই আহাম্মক? এতে যে আমরাই ভুলিনি!!

---

* মূল পত্রিকায় এই স্থলে কোনও নাম না থাকিলেও, রচনাটি স্বামী বিবেকানন্দের। প্রথম বর্ষের সূচীপত্রে এই প্রবন্ধের লেখক হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের নাম মুদ্রিত আছে।

—বর্ত্তমান সম্পাদক

দিব্য বাণী

নিষেধে কৃতে নেতিনেতীতি বাক্যৈঃ
সমাধিস্থিতানাং যদাভাতি পূর্ণম্।
অবস্থাত্রয়াতীতমদ্বৈতমেকং
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি॥

—শংকরাচার্য : বিজ্ঞাননৌকা, ৫

শ্রুতিবাক্য-অনুসারে
'ইহা নহে', 'ইহা নহে' ক'রে
বিচারের অবসানে
সমাধিতে হলে অবস্থিত,
জাগ্রদাদি-অতিরিক্ত
হৃদয়েতে পূর্ণ প্রতিভাত
হন যিনি, অদ্বিতীয়
সেই নিত্য পরব্রহ্ম আমি।

কথাপ্রসঙ্গে

'কথামৃতে' শংকরপ্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগে উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন :

'শংকরাচার্য এদিকে ব্রহ্মজ্ঞানী; আবার প্রথম প্রথম ভেদবুদ্ধিও ছিল। তেমন বিশ্বাস ছিল না। চণ্ডাল মাংসের ভার লয়ে আসছে, উনি গঙ্গাস্নান ক'রে উঠেছেন। চণ্ডালের গায়ে গা লেগে গেছে। ব'লে উঠ্‌লেন, এই তুই আমায় ছুঁলি! চণ্ডাল বল্‌লে, ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই। যিনি শুদ্ধ আত্মা, তিনি শরীর ন'ন, পঞ্চভূত ন'ন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ন'ন। তখন শংকরের জ্ঞান হয়ে গেল।'

ঘটনাটি কথামৃতের বিভিন্ন ভাগে একাধিকবার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্বরচিত 'মনীষাপঞ্চকম্'-স্তবে শংকর এই জ্ঞানদাতা চণ্ডালকে শ্রীগুরুর যোগ্য সম্মান দিয়া অপূর্ব ভাবায় অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। কিংবদন্তী আছে, সাক্ষাৎ কাশী-বিশ্বনাথই জ্ঞাননিষ্ঠ শংকরকে পূর্ণ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্ত্যজবেশে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন। শংকর তখন দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বালকমাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির কথা বহুবার বলিয়াছেন। কথামৃতের তৃতীয় ভাগে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন :

'অবতার বা অবতারের অংশ, এদের বলে ঈশ্বরকোটি; আর সাধারণ লোকদের বলে জীব বা জীবকোটি। যারা জীবকোটি তারা সাধনা ক'রে ঈশ্বর লাভ করতে পারে; তারা সমাধিস্থ হয়ে আর ফেরে না। যারা ঈশ্বর-কোটি তারা যেন রাজার বেটা; সাত তলার চাবি তাদের হাতে। তারা সাত তলায় উঠে যায়, আবার ইচ্ছামত নেমে আসতে পারে। জীবকোটি যেমন ছোট কর্মচারী, সাততলা বাড়ীর খানিকটা যেতে পারে; ঐ পর্যন্ত।'

শংকর নির্বিকল্প সমাধি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং লোকশিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' লইয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন—একথাও আমরা কথামৃতের বহুস্থলেই উল্লিখিত দেখিতে পাই। সুতরাং শংকর যে অবতার বা অবতারের অংশ, ইহা আমরা কথামৃত হইতে নিঃসন্দেহে জানিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন :

"ঈশ্বর যখন অবতীর্ণ হন, তিনি সমাধিস্থ হয়েও আবার ফিরতে পারেন। জীবের থাক্—এরা যেন রাজার কর্মচারী। রাজার বারবাড়ী পর্যন্ত এদের গতায়াত। রাজার বাড়ী সাততলা, কিন্তু রাজার ছেলে সাত তলায় আনাগোনা করতে পারে, আবার বাইরেও আসতে পারে। ফেরে না, ফেরে না, সব বলে। তবে শংকরাচার্য, রামানুজ এরা সব কি? এরা 'বিদ্যার আমি' রেখেছিল।"

"মহাপুরুষরা জীবের দুঃখে কাতর হয়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে দেন। শংকরাচায জীব-শিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।"

"জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হয়ে চুপ ক'রে থাকে, তা হলে লোকশিক্ষা হয় না। তাই শংকরাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।"

"সমাধির পর অবতারাদির 'আমি' আবার ফিরে আসে—'বিদ্যার আমি', 'ভক্তের আমি'। এই 'বিদ্যার আমি' দিয়ে লোক-শিক্ষা হয়। শংকরাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিল।"

আচার্য শংকরের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি—'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'। অনেকের ধারণা, ইহা শংকরেরই মত—শ্রীরামকৃষ্ণের মত নহে। তাঁহারা সভাসমিতিতে ভাষণপ্রসঙ্গে এবং প্রবন্ধাদির মাধ্যমে, তাঁহাদের এই প্রাতিস্বিক ধারণা নানাযুক্তিসহায়ে ব্যক্ত করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। কথামৃতের প্রথম ভাগে আছে, 'শ্রীম'র স্বগতোক্তি :

"ঠাকুর এই জগৎ স্বপ্নবৎ বলছেন না। বলেন, 'তা হলে ওজনে কম পড়ে।' মায়াবাদ নয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কেন না, জীবজগৎ অলীক বলছেন না, মনের ভুল বলছেন না। ঈশ্বর সত্য, আবার মানুষ সত্য, জগৎ সত্য। জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। বীচি খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ সম্বন্ধে যে সকল কথা বারংবার বলিয়াছেন, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে 'শ্রীম'র ঐরূপ স্বগতোক্তি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা' শংকরের এই কথাটি যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অননুমোদিত নহে, ইহা কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ ইত্যাদি আকর-গ্রন্থসমূহ হইতে অসংখ্য উদ্ধৃতিসহায়ে অনায়াসেই প্রমাণিত করা যায়। তবে আমরা কথামৃতের মধ্যেই আমাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখিব। কথামৃতে আছে :

"বেদান্তবিচারের কাছে রূপ-টুপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে, ভক্তের 'আমি' অভিমান, ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।"

"যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে, আমি একটি জিনিস, জগৎ একটি জিনিস। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর 'ব্যক্তি' হয়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল নেতি নেতি বিচার করে। বিচার ক'রে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, 'আমি মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।' জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে বলতে পারে না।"

'সত্য বলছি, আমি বেদান্ত আদি শাস্ত্র পড়ি নাই ব'লে একটু দুঃখ হয় না। আমি জানি, বেদান্তের সার, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।'

'আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন, বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।'

'হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম! মাকে বল্লাম, আমি মুখ্যু—তুমি আমায় জানিয়ে দাও—বেদপুরাণ তন্ত্রে—নানা শাস্ত্রে কি আছে। মা বল্লেন, বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।'

'বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আমি আলাদা কিছু নই, আমি সেই ব্রহ্ম।'

যাঁহারা বলেন, 'জগৎ মিথ্যা'—কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিপ্রেত নহে, তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে-সকল উক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাদের দুই একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

'জগৎ মিথ্যা কেন হবে? ওসব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হ'লে তখন বোঝা যায় যে, তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন।'

'জগৎ মিথ্যা হ'লে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলছেন, তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ।'

এই সকল উক্তির প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করিতে হইলে উপক্রম, উপসংহার, 'অভ্যাস' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উক্তি ইত্যাদি প্রসিদ্ধ তাৎপর্য-নির্ণায়ক লক্ষণ-গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, অন্যথা যথার্থ তাৎপর্য নির্ণীত হইতে পারে না। প্রথম উদ্ধৃতিটির অন্তর্গত 'ওসব বিচারের কথা'—এই

বাক্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যাঁহারা জ্ঞানপথ অবলম্বন করিয়া বেদান্তবিচার করিবেন, তাঁহারাই 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'—এই বিচার করিবেন। 'শ্রীম'র জন্য উহা নহে। ঐ উক্তিটির কিছু পরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন: "তবে যদি তিনি 'আমি' একেবারে পুঁছে দেন তখন যে কি হয় মুখে বলা যায় না ··· সে অবস্থাও আমার এক একবার হয়।" উপসংহারের এই কথাগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটির অব্যবহিত পূর্বে আছে: "এরা নির্বাণের চেষ্টা করছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—বড় কঠিন পথ" এবং অব্যবহিত পরে আছে: "বড় দূরের কথা। কি রকম জানো? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষে বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি', 'তুমি', 'জগৎ' এ সবের খবর থাকে না।" 'বড় দূরের কথা' আর 'অসমীচীন কথা' সমানার্থক নহে। এই সকল উপক্রম, উপসংহারাদি অগ্রাহ্য করিয়া কোনও উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য কখনও নির্ণীত হইতে পারে না।

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—ইহা যে অতি কঠিন বিচারমার্গের কথা, ইহা কথামৃতে বারংবার পাওয়া যায়। তাহার অর্থ এই নহে যে, ঐ উক্তিটিই অসার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তো পরিষ্কার বলিয়াছেন: 'বেদান্ত—শংকর যা বুঝিয়েছে তাও আছে; আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।' ইহার অর্থ কি এই শংকরের মত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত নহে?

যুগপৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ'—এর মহিমাকীর্তন করা এবং শংকরের 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'-উক্তিটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত নহে বলা সামঞ্জস্যবিহীন। কাহারও চিন্তার স্বাধীনতা বা বাক্স্বাধীনতায় বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ না করি। বিনম্রভাবেই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধিকারীবিশেষের অধিকার অনুযায়ীই উপদেশ দিতেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন: 'আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি'। 'শ্রীম' লিখিয়াছেন: 'পাখী যেমন শাবকদের পক্ষাচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করে, দয়াময় গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপে ভক্তদের রক্ষা করিতেছেন।' হাজরা মহাশয়কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন: 'ওরা (লাটু প্রভৃতি) এমনি আছে - এখনও অতো উচ্চ অবস্থা হয় নাই। ওরা ভক্তি নিয়ে আছে। আর ওদের (সোঽহং ইত্যাদি) কিছু বোলো না।' অনুরূপভাবেই তিনি বলিতেন: 'নিরাকার সাধনা, জ্ঞানযোগের সাধনা, ভক্তদের কাছে বলতে নাই। অনেক কষ্টে একটু ভক্তি হচ্ছে, সব স্বপ্নবৎ বললে ভক্তির হানি হয়।' "এ যা বললুম সব বিচারের কথা। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বিচার। সব স্বপ্নবৎ! বড় কঠিন পথ। এ পথে তাঁর লীলা স্বপ্নবৎ মিথ্যা হয়ে যায়। আবার 'আমি'টাও উড়ে যায়। এ পথে অবতারও মানে না। বড় কঠিন। এ সব বিচারের কথা ভক্তদের বেশী শুনতে নাই।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন: 'সাধারণতঃ তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) দ্বৈতবাদই শিক্ষা দিতেন, অদ্বৈতবাদ শিক্ষা না দেওয়াই ছিল তাঁর নিয়ম। তবে তিনি আমাকে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন—এর আগে আমি ছিলাম দ্বৈতবাদী।' এখানে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ ইত্যাদি প্রায় সমজাতীয় সকল বাদগুলিই দ্বৈতবাদের অন্তর্ভুক্তি বুঝিয়া লইতে হইবে।[১]

শংকরের মায়াবাদকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'শুকনো' বলিয়াছেন, 'মিথ্যা' বলেন নাই। মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ একই কথা।[২]

---

১ এবিষয়ে কলিকাতা স্টার থিয়েটারে প্রদত্ত স্বামীজীর 'সর্বাবয়ব বেদান্ত'-নামক বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

২ স্মরণীয় স্বামীজীর উক্তি: 'মায়াবাদ ব্যতীত অদ্বৈতবাদের কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়।'

'শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্'

স্বামী ধীরেশানন্দ

ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসরচিত 'ব্রহ্মসূত্রে' অপশূদ্র অধিকরণের অন্তিম সূত্রের (১।৩।৩৮) ভাষ্যে ভগবান্ শ্রীশংকরাচার্য লিখিয়াছেন :

" 'শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্' ইতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্বর্ণ্যস্যাধিকারস্মরণাৎ। বেদপূর্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতম্।"

—ইতিহাস-পুরাণাদির অধ্যয়ন-সহায়ে তত্ত্বজ্ঞানলাভের অধিকার চতুর্বর্ণেরই রহিয়াছে। অতএব ঐ অধিকার শূদ্রেরও আছে, ইহাই বক্তব্য। বেদপূর্বক অর্থাৎ বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা জ্ঞানলাভের অধিকার জাতি শূদ্রের নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্তের পরিপোষকরূপে ভাষ্যকার মহাভারত শান্তিপর্বের

শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্যং মহৎ স্মৃতম্॥

মহাঃ শাঃ ৩২৭।৪৯

এই শ্লোকটি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকটির অর্থ : ব্রাহ্মণকে অগ্রভাগে রাখিয়া চারি বর্ণকেই বেদ শুনাইবে, এই বেদাধ্যয়ন অতীব মহৎ কর্ম। এখানে কিন্তু শূদ্রের বেদশ্রবণের কথা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। কিন্তু আচার্য তাঁহার ভাষ্যে শূদ্রের বেদাধিকার নিষেধ করিয়া মহাভারতের এই বচন-সহায়েই শূদ্রের কেবল ইতিহাস-পুরাণাদি শ্রবণেই অধিকার রহিয়াছে, ইহা বলিলেন। ইহাতে শ্লোকটির অর্থবিষয়ে বিরোধ প্রতিভাত হইতেছে না কি? শ্লোকে রহিয়াছে—'বেদস্যাধ্যয়নং হীদং'—বেদাধ্যয়নের কথা, কিন্তু ভাষ্যকার ইহাকে ইতিহাস-পুরাণ-অধ্যয়ন বিষয়ক বলিলেন। মহাভারত ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসের রচনা, ব্রহ্মসূত্রও তাঁহারই রচনা। মহাভারতে যে শ্লোকে পরমগুরু শ্রীবেদব্যাস শূদ্রের বেদাধিকারের কথা বলিতেছেন, তদ্রচিত সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শ্রীশংকর সেই শ্লোকের দ্বারাই শূদ্রের বেদাধিকার নিষেধ করিয়া শূদ্রের ইতিহাস-পুরাণ-অধ্যয়নে অধিকার স্থাপন করিতেছেন; ইহাই সূত্রকার ও ভাষ্যকারের মধ্যে সুস্পষ্ট বিরোধ। ইহার মীমাংসা কি?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ভাষ্যকার শ্লোকটিকে প্রকরণবিরুদ্ধ অর্থেই লাগাইয়াছেন, কারণ মহাভারতের শান্তিপর্বের সর্বত্র বেদ-অধ্যয়নের প্রসঙ্গই রহিয়াছে। তবে কি ভাষ্যকার সূত্রকারের সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না? ইহার মীমাংসা খুঁজিতে গিয়া আচার্য পদ্মপাদের সহিত সুর মিলাইয়া ইহাই বলিতে ইচ্ছা হয়,—

শংকরঃ শংকরঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
তয়োর্বিবাদে সম্প্রাপ্তে ন জানে কিং করোম্যহম্॥

—শংকর সাক্ষাৎ শিবাবতার ও ব্যাসদেব স্বয়ং নারায়ণ। এই উভয়ের বিবাদে আমি কি করি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

পূর্বোক্ত বিষয়ে আমরা একটু বিচার করিয়া অর্থ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। শূদ্রের বেদাধিকার আছে কিনা তাহা আমরা বিচার করিব না। আমরা কেবল মহাভারতের ঐ শ্লোকটির যথার্থ তাৎপর্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করিব, যাহাতে সূত্রকার ও ভাষ্যকারের মধ্যে এই প্রতীয়মান বিরোধের একটা সমাধান পাওয়া যাইতে পারে।

শূদ্রের বেদশ্রবণের বিষয়ে কোন কোন বিদ্বান্ বলেন যে সংস্কারবিহীন বলিয়া শূদ্র ব্রাহ্মণের পিছনে বসিয়া বেদ শুনিবে। ব্রাহ্মণাদি বালকের

ন্যায় বিধিপূর্বক শ্রবণে তাহার অধিকার নাই, ইত্যাদি। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে বেদব্যাসের স্ববচন সহ বিরোধ হইবে। কারণ তিনিই শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন :

'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা'

—ভাঃ ১।৪।২৫

—স্ত্রী শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুগণ অর্থাৎ পতিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বেদ শ্রবণ করিবে না। ব্রহ্মসূত্রের পূর্বোক্ত (১।৩।৩৮) সূত্রের ভাষ্যে স্মৃতিবলে ইহাও বলা হইয়াছে যে, শূদ্র সমীপে বেদ অধ্যয়ন করিবে না, শূদ্র বেদ শুনিলে তাহার কাণে গলিত সীসা ও লাক্ষা ঢালিয়া দিবে, ইত্যাদি। যেখানে এরূপ কঠোর ব্যবস্থা, সেখানে ব্রাহ্মণের পিছনে বসিয়াও শূদ্রের বেদ শ্রবণের সুযোগ দিতে ইহারা রাজি হইবেন বলিয়া মনে তো হয় না। ইহার উত্তরে পূর্বোক্ত বিদ্বান্‌গণ বলেন বিধিপূর্বক গুরুমুখে স্বর-লয়াদিসহ বেদপাঠের নামই যথার্থ বেদাধ্যয়ন। এমনি শোনা উহা ইতিহাস পুরাণ শ্রবণেরই তুল্য। উহা যথার্থ বেদশ্রবণ বা অধ্যয়নই নহে, ইত্যাদি।

একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে জন্মগত বর্ণবিভাগ মানিলেই এই সব অধিকার-বিচারের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। গুণগত বর্ণবিভাগ স্বীকার করিলে এই সব কথাই উঠে না। ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৮-এর ভাষ্যে কিন্তু ভাষ্যকার 'বেদপূর্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণাম্'—এখানে কেবল 'শূদ্র' এই পদ ব্যবহার করিয়াছেন। টীকাকার আনন্দগিরি উহার উপরে লিখিয়াছেন—'ন জাতিশূদ্রস্য বেদদ্বারাধিকারো বিদ্যায়াম্'—অর্থাৎ জন্মগত শূদ্র যাহারা, তাহাদের বেদদ্বারা জ্ঞানে অধিকার নাই। মনে হয় ইহারা সকলেই জন্মগত বর্ণবিভাগেরই পক্ষপাতী। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'—

(গীতা ৪।১৩)

অর্থাৎ গুণ- ও কর্ম-বিভাগ অনুসারে চতুর্বর্ণ-বিভাগ আমিই করিয়াছি। তবে গুণকর্মানুসারেই বা বর্ণ-বিভাগ মানা যাইবে না কেন ? পূর্বে হয়তো এরূপই ছিল, ক্রমশঃ বিভিন্নকালীন বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাবে দীর্ঘকাল যাবৎ জন্মগত বর্ণবিভাগই সমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহাই হউক, ইহার বিচার না করিয়া আমরা পূর্ব কথায় ফিরিয়া যাই।

মহাভারতের 'শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্'—এই শ্লোকটির তাৎপর্য-নির্ণয়ই আমাদের বিষয়। মহাভারতের ঐ প্রকরণ দেখিলে মনে হয় ব্যাসদেব শূদ্রের বেদ শ্রবণের কথাই বলিতেছেন, কিন্তু সূত্রভাষ্য (১।৩।৩৮) দেখিলে মনে হয় উহা ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণের কথা, বেদশ্রবণের কথা নহে। ব্যাসদেবের সূত্রের তাৎপর্য নির্ণয় করিবার জন্যই ভাষ্যকার সূত্রভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভাষ্য ব্যাসদেবের স্ববচনবিরোধী হওয়া উচিত নহে। তাহা হইলে মূলেই কুঠারাঘাত করা হইবে। যদি মহাভারত পড়িলে মনে হয় যে ব্যাসদেব শূদ্রদের বেদশ্রবণের অধিকার দিয়াছেন, তাহা হইলে বলিতে হয় ভাষ্যকার জানিয়া শুনিয়া ঐ শ্লোকের কদর্থ করিয়াছেন। তাহা বলাও ঠিক নহে। বিধিরহিতভাবে শূদ্র বেদ শ্রবণ করিতে পারে ইহাই যদি ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে তিনি তাহাই লিখিতেন। তাহা না বলিয়া তিনি ঐ শ্লোকার্থ ইতিহাস-পুরাণ-শ্রবণ বিষয়ে লাগাইলেন কেন ? যে শ্লোক বেদপাঠ বিষয়ক তাহা ইতিহাস-পুরাণ-পাঠ বিষয়ক বলাতে ক্লিষ্টকল্পনা এবং প্রকরণবিরুদ্ধ অর্থান্তর কল্পনা হইল না কি ?

এই শংকার এক সমাধান :—ভাষ্যকার কঠোর সনাতনপন্থী ছিলেন। দক্ষিণ দেশে বিশিষ্ট নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম। সুতরাং ঐ সমাজের কঠোর রীতিনীতির প্রভাবে তাঁহার চিন্তাধারা

অনেকাংশে প্রভাবিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যেমন ভাষ্যকার ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকার স্বীকার করেন নাই (মু: উপ: ১।২।-২ ভাষ্য; বৃহ: উপ: ৩।৫।১; ৪।৫।১৫ ভাষ্য দ্র:) কিন্তু তৎশিষ্য আচার্য সুরেশ্বর তাহা মানিলেন না। তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে ত্রৈবর্ণিক সন্ন্যাসের বিধান দিয়াছেন এবং উহাই দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে অদ্যাবধি প্রচলিত। সেইজন্য মনে হয় ভাষ্যকার শূদ্রের কোন প্রকার বেদশ্রবণ-অধিকার বিষয়েই রাজি হইবেন না। মহাভারতের ঐ শ্লোকে বেদব্যাস শূদ্রের বেদশ্রবণাধিকার দিয়াছেন, ইহা যদি স্বীকার করাও যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে শ্রুতি ও স্মৃতি সহ বিরোধ হয় বলিয়া ভাষ্যকার ব্যাসবচন মানিতেছেন না। নিজের সামর্থ্যে শ্লোকের অন্য অর্থ করিয়াছেন। সমর্থ পুরুষ সব করিতে পারেন।

'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা'
—(ভা: ১০।৩৩।৩০)

—বহ্নি সর্বভোজী হইলেও উহা যেমন তাহার দোষ বলিয়া ধরা হয় না, তদ্রূপ সমর্থ পুরুষগণের ব্যবহারও দোষাবহ নহে।

কিন্তু পূর্বোক্ত সমাধানে আচার্য শংকরকে ব্যাসবিরোধী মতের প্রচারক স্বীকার করিতে হয় বলিয়া উহা আমাদের মনঃপূত নহে। এখন আমরা দেখিব উহার অন্য কোন সমাধান হইতে পারে কিনা। প্রথমেই বিচার করা যাউক, মহাভারতের ঐ প্রকরণে (শান্তিপর্ব, ৩২৭ অধ্যায়) ব্যাসদেব কি বলিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়ে মোট ৫৩টি শ্লোক আছে তন্মধ্যে ২৬ নং হইতে ৫৩ নং শ্লোকের মধ্যেই বিচার্য বিষয়টি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। প্রথমেই দেখিতে পাই মহাতপা পরাশরনন্দন শ্রীবেদব্যাস হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে সুমন্তু, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও পৈল এই চারিটি শিষ্যকে বেদ পাঠ করাইতেছেন ও সুখপূর্বক সেই আশ্রমে বাস করিতেছেন। (এখানে ২৬নং শ্লোকের 'বেদান্ অধ্যাপয়ামাস', এই বেদ শব্দ লক্ষণীয়)। এমন সময় আকাশ-মার্গে মহাযোগী সূর্যসম বিশুদ্ধাত্মা ব্যাসপুত্র শুকদেবের আবির্ভাব। তিনি নিকটে আগমন করিয়া পিতার চরণ বন্দনাপূর্বক সুমন্তু-আদি সতীর্থচতুষ্টয় সহ যথাবিধি মিলিত হইলেন। পুত্রসহ শিষ্যচতুষ্টয়কে ব্যাসদেব সেই আশ্রমে বেদ-পাঠ করাইতেছিলেন। ('এবমধ্যাপয়ন্'… ৩৩নং শ্লোক)। অনন্তর কোন সময়ে বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ঐ শিষ্যগণ সাঙ্গ বেদপাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরু ব্যাসদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন—চার শিষ্য ও গুরুপুত্র শুকদেব, এই পাঁচ জনের মধ্যেই যেন বেদ প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং ষষ্ঠ অন্য কোন শিষ্য যেন খ্যাতি লাভ না করে। (এখানে 'বেদাধ্যয়নসম্পন্নাঃ…' ৩৪নং শ্লোক; 'বেদেষু নিষ্ঠাং সংপ্রাপ্য সাঙ্গেষু…' ৩৫নং শ্লোক; 'ইহ বেদাঃ প্রতিষ্ঠেরন্ …' ৪১নং শ্লোক লক্ষণীয়)। অতঃপর ব্যাসদেব প্রীত হইয়া বরপ্রদান করিয়া শিষ্যগণকে বিদ্যাসম্প্রদান-বিধি বলিলেন। প্রায় অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত এই বিদ্যাসম্প্রদান-বিধিই বলা হইয়াছে। যথা—তোমরা ব্রহ্মলোক-বাসাকাংক্ষী বেদশ্রবণেচ্ছু ব্রাহ্মণকে বেদ পড়াইবে, তোমাদের দ্বারা এই বেদের খুব প্রচার হউক, ইত্যাদি। ('ব্রাহ্মণায় সদা দেয়ং ব্রহ্মশুশ্রূষবে তথা।' ৪৩ নং শ্লোক; 'ব্রহ্মলোকে নিবাসং যো ধ্রুবং সমভিকাংক্ষতে। ভবন্তো বহুলাঃ সন্তু বেদো বিস্তার্যতাময়ম্॥' ৪৪নং শ্লোক লক্ষণীয়)। অতঃপর ৪৮ নং শ্লোক পর্যন্ত কাহাকে কাহাকে বিদ্যাপ্রদান করিবে না সেই অনধিকারীদের বিষয় বর্ণন করিয়া ৪৯নং শ্লোকে ভগবান্ বেদব্যাস সেই শ্লোকটি বলিতেছেন যাহা ভাষ্যকার (১।৩।৩৮) সূত্রভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন:—

শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্যং মহৎ স্মৃতম্॥
(মহাঃ শাঃ ৩২৭।৪৯)

এখানেও বেদ শব্দটি লক্ষণীয়। ব্যাসদেব বলিতেছেন ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে রাখিয়া চারি বর্ণকেই বেদ শুনাইবে। বেদাধ্যয়ন সুমহৎ কর্ম। অতঃপর দেবতাগণের স্তুতির জন্য স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বেদ প্রকট করিয়াছেন ইহা উল্লেখ করিয়া ('স্তুত্যর্থমিহ দেবানাং বেদাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।' ৫০নং শ্লোক লক্ষণীয়) স্বাধ্যায়বিধি কথনপূর্বক ভগবান্ বেদব্যাস এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিলেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহাভারতের এই অধ্যায়ে সর্বত্র বেদের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। ভাষ্যকারকর্তৃক উদ্ধৃত পূর্বোক্ত শ্লোকের তৃতীয় চরণেও বেদের কথাই আছে, ইতিহাস-পুরাণের কথা কোথাও নাই। মহাভারতের এই অধ্যায়ে বিভিন্ন স্থলে আমরা বেদ শব্দের প্রয়োগ এইরূপ দেখিতে পাই, যথা—

(ক) 'বেদান্ অধ্যাপয়ামাস ...' (৩২৭।২৬) : বেদান্ বহুবচন, অতএব ব্যাসদেব শিষ্যগণকে বেদসকল পড়াইয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। এখানে বেদ শব্দ চতুর্বেদ-বিষয়ক। ইতিহাস-পুরাণ বিষয়ক নহে।

(খ) 'স্তুত্যর্থমিহ দেবানাং বেদাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা' (৩২৭।৫০) : 'বেদাঃ' বহুবচন, সুতরাং ইহাও চতুর্বেদবিষয়ক, ইতিহাস-পুরাণবিষয়ক নহে। কল্পারম্ভে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকর্তৃক প্রকটিত বেদ কখনও বেদব্যাসরচিত পুরাণাদি হইতে পারে না, তখন বেদব্যাসের জন্মও হয় নাই।

(গ) 'বেদেষু ... সাঙ্গেষু' (৩২৭।৩৫) : সাঙ্গ বেদসকল অবশ্যই মুখ্য বেদ। বেদের ন্যায় ইতিহাস পুরাণের অঙ্গসকল প্রসিদ্ধ নহে।

(ঘ) 'ইহ বেদাঃ প্রতিষ্ঠেরন্' (৩২৭।৪১) : এখানেও বেদাঃ বহুবচন, চতুর্বেদবিষয়ক; ইতিহাস-পুরাণবিষয়ক নহে।

(ঙ) 'ব্রাহ্মণায় সদা দেয়ং ব্রহ্ম-শুশ্রূষবে তথা' (৩২৭।৪৩) : অর্থাৎ বেদশ্রবণেচ্ছুকেই এই বিদ্যা দিবে। এখানেও ব্রহ্ম অর্থ মুখ্যবেদ, উহা ইতিহাস পুরাণ-বিষয়ক নহে। ('বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম'—অমরকোশ)।

(চ) 'ব্রহ্মলোকে নিবাসং যো ধ্রুবং সমভিকাঙ্ক্ষতে। ভবন্তো বহুলাঃ সন্তু বেদো বিস্তার্যতাময়ম্॥' (৩২৭।৪৪) : মুখ্য বেদ অধ্যয়নেরই ফল ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যথা—ছাঃ উপঃ ৮।১৫।১ দ্রঃ। অতএব মুখ্যবেদ অধ্যয়নেরই ফল শ্লোকের পূর্বার্ধে বলা হইয়াছে, ইতিহাস-পুরাণাদি পাঠের ফল নহে। ইতিহাস-পুরাণ পাঠের ফল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইতে পারে না এবং এই বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই। এই শ্লোকের উত্তরার্ধে ব্যাসদেব শিষ্যদের বলিলেন যে, তোমরা শিষ্যপরম্পরাক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও এবং এই বেদ অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি সহায়ে বিস্তার কর। এখানে 'বেদো বিস্তার্যতাময়ম্'—'বেদঃ' ও 'অয়ম্'—এই একবচনান্ত প্রয়োগ বিশেষরূপে লক্ষণীয়। ইহার গূঢ় রহস্য পরে বলা হইতেছে।

(ছ) '... স্বাধ্যায়স্য বিধিং প্রতি' (৩২৭।৫২) : স্বাধ্যায় শব্দটির মুখ্য অর্থ—বেদ অধ্যয়ন, ইতিহাস-পুরাণ পাঠ নহে। এখানে স্বাধ্যায়বিধি বলা হইয়াছে, এজন্যও এই প্রকরণ মুখ্যবেদ-বিষয়ক, ইতিহাস-পুরাণবিষয়ক নহে।

এই প্রকারে বলা যাইতে পারে যে শান্তিপর্বের এই অধ্যায়টি মুখ্যবেদবিষয়ক, ভাষ্যকার-কথিত ইতিহাস-পুরাণবিষয়ক কখনই নহে।

আর একটি বিষয়ও এখানে চিন্তনীয়। ৩২৭।৪০,৪১ শ্লোকে—'ষষ্ঠঃ শিষ্যো ন তে খ্যাতিং গচ্ছেৎ...' ৪০; 'ইহ বেদাঃ প্রতিষ্ঠেরন্ এষ নঃ কাঙ্ক্ষিতো বরঃ' ৪১—শিষ্যগণ প্রার্থনা করিলেন যে বেদসকল আমাদের পাঁচজনের মধ্যেই

(৪ শিষ্য ও গুরুপুত্র শুকদেব, এই পাঁচ) প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, ষষ্ঠ আর কোন শিষ্য যেন বেদবিদ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ না করেন। ব্যাসদেবও সেই বর দিলেন এবং বিদ্যাসম্প্রদানবিধি ও স্বাধ্যায়বিধি বলিলেন। এখানেও যদি 'বেদ' অর্থে ইতিহাস-পুরাণ গৃহীত হয় তবে ব্যাসদেবকে মিথ্যাবাদী বলিতে হইবে, কারণ তিনি এই পাঁচজন হইতে অতিরিক্ত সূতপিতা রোমহর্ষণকেও ইতিহাস-পুরাণবিদ্যা (অর্থাৎ বেদবিদ্যা) দিয়াছেন এবং রোমহর্ষণ ও তৎপুত্র সূত ইতিহাস-পুরাণ-বক্তারূপে খ্যাতিও লাভ করিয়াছেন। 'ইতিহাস-পুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ' (ভাগঃ ১।৪।২২ দ্রঃ)। সুতরাং ঐ শ্লোক দুইটিও মুখ্যবেদবিষয়ক, ইতিহাস-পুরাণবিষয়ক নহে। এই অধ্যায়ের পূর্বে ও পরেও বহুস্থলে মুখ্যবেদই প্রস্তাবিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়, মহাভারত শান্তিপর্বের ৩২৭ নং অধ্যায়টিতে ব্যাসদেব মুখ্যবেদের বিষয়ই বলিয়াছেন, ইতিহাস-পুরাণের বিষয় বলেন নাই। তাহা হইলে ভাষ্যকার 'শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্' ৩২৭।৪৯ এই শ্লোকে ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণ করাইবার কথা বলিয়া ব্যাসসিদ্ধান্ত সহ স্পষ্ট বিরোধ করিলেন না কি ?—এই পর্যন্ত শংকাটির বিস্তার করিয়া এখন উহার সমাধান বর্ণিত হইতেছে :

শান্তিপর্বের ৩২৭ অধ্যায়ের ২৬,৩৫,৪১,৪৩, ৫০ পূর্বে উদ্ধৃত এই শ্লোকগুলি সবই মুখ্য চতুর্বেদবিষয়ক, ইহা নিঃসন্দেহরূপে বিচারপূর্বক দেখান হইয়াছে। কিন্তু ব্যাসদেব তাঁহার শিষ্য-চতুষ্টয় ও পুত্র শুকদেব, এই পাঁচজনকে কেবল মুখ্য-বেদবিদ্যাই পড়ান নাই, মহাভারতও (ইতিহাস) পড়াইয়াছেন যথা—বৈশম্পায়ন বলিতেছেন—'সুমন্ত জৈমিনি, পৈল, আমি আর শুকদেব এই পাঁচ শিষ্যকে আচার্য ব্যাসদেব চারিবেদ তথা পঞ্চমবেদ মহাভারত পড়াইয়াছিলেন।'—

'...বেদান্ অধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্'॥
(শান্তিপর্ব ৩৪০।১৯-২১ শ্লোক দ্রঃ)

বেদে অনধিকারী স্ত্রীশূদ্রাদির জন্যই ব্যাসদেব মহাভারত ও পুরাণ রচনা করিয়াছেন একথাও শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রসিদ্ধ আছে (ভাগঃ ১।৪।২৫ দ্রঃ)। শিষ্যগণ বর প্রার্থনা করিলেন, মুখ্যবেদসকলের আচার্যত্ব এবং আর কেহ যেন খ্যাতি লাভ না করে ইত্যাদি (৩২৭।৩৮-৪১)। বালক যেমন অনেক কিছুই খাইতে চায়, কিন্তু হিতৈষিণী মাতা প্রিয়পুত্রকে তার অনুকূল খাদ্যই পরিবেশন করেন, গুরু ব্যাসদেবও তদ্রূপ বরপ্রদান করিয়া তৎপশ্চাৎ তাহাদের বর্তমান কর্তব্যও নির্ধারণ করিলেন। তিনি শিষ্যদের কল্যাণকর, ধর্মানুকূল বচন বলিলেন,

'উবাচ শিষ্যান্ ধর্মাত্মা ধর্ম্যং নৈঃশ্রেয়সং বচঃ'
(৩২৭।৪৩-৪৪)

—"তোমরা এই বেদবিদ্যা ব্রহ্মলোকবাসাকাংক্ষী, বেদশ্রবণেচ্ছু ব্রাহ্মণকে দিবে, তোমরা শিষ্য-পরম্পরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, ইত্যাদি ; (এখন তোমাদের যাহা কর্তব্য তাহাওশোন—) এখন তোমরা 'বেদোবিস্তার্যতাময়ম্', অর্থাৎ এখন তোমরা এই বেদ অর্থাৎ পঞ্চমবেদ মহাভারত অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদিদ্বারা বিস্তার কর।" এখানে বেদ শব্দ একবচনান্ত। মুখ্য চারি বেদ বিবক্ষিত হইলে উহা অন্যান্য স্থলের ন্যায় বহুবচনান্ত হইত। মহাভারতকে (ইতিহাস) পঞ্চমবেদ বলা হয়। যথা 'ইতিহাসপুরাণং চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে'—(ভাগঃ ১।৪।২০) ; 'ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং' (ছাঃ উপঃ ৭।১,২)। এই পঞ্চমবেদ মহাভারতকেই এই স্থলে ব্যাসদেব বিশেষরূপে প্রচার করিতে বলিতেছেন। কেন বলিতেছেন তাহার উত্তরও পাওয়া যাইবে ব্যাসদেবের নিজেরই বচন হইতে। মহাভারতকার বলিতেছেন :—

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাৎ বেদো মাময়ং প্রতরেদিতি ॥
মহাঃ ভাঃ ১।১।২২৯

—ইতিহাস-পুরাণ দ্বারাই বেদার্থ বিস্তার ও সমর্থন করিবে। ইতিহাস-পুরাণে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বেদ এই মনে করিয়া ভয় পান যে, এই ব্যক্তি আমায় প্রতারণা অর্থাৎ আমার কদর্থ করিবে।...যিনি এই মহাভারতরূপ বেদ অপরকে শ্রবণ করান তাহার মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি।—

ইতিহাস-পুরাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ না হইলে বেদার্থ ঠিক ঠিক করা যাইবে না, এই জন্য পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যাসদেব শিষ্যদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন—'অপ্রমাদশ্চ বঃ কার্যো ব্রহ্ম হি প্রচুরচ্ছলম্।' (শান্তিপর্ব ৩২৮।৬)—'ব্রহ্ম হি প্রচুরচ্ছলম্' এই বাক্যে ব্যাসদেব বলিতেছেন যে, বেদার্থ-নির্ণয় করা বড় কঠিন ব্যাপার। অতএব তোমরা মৎপ্রণীত পঞ্চমবেদ এই মহাভারতের বিস্তার প্রথম কর। (৩২৭।৪৪)। ইহার পর ৩২৭।৪৫-৪৮ শ্লোকসমূহে বিদ্যাসম্প্রদানবিধি বর্ণন করিয়া ব্যাসদেব আমাদের বিচার্য সেই শ্লোকটি বলিলেন :

শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্যং মহৎ স্মৃতম্ ॥
শাঃ ৩২৭।৪৯

এখানেও বেদ শব্দটি একবচনান্ত, কারণ ইহা পঞ্চমবেদ মহাভারত-বিষয়ক। এইরূপে দেখা যায় যে **এই অধ্যায়ে বহুবচনান্ত 'বেদ' শব্দগুলি** (শ্লোক নং ২৬, ৩৫, ৪১, ৪৩, ৫০) **মুখ্য চতুর্বেদ-বিষয়ক এবং একবচনান্ত 'বেদ'শব্দ** (শ্লোক নং ৪৪, ৪৯) **মহাভারত-বিষয়ক।**

এইভাবে বিচার করিয়া সিদ্ধান্তগ্রহণ করিলে ব্যাসদেব ও ভাষ্যকারের মধ্যে কোন মতবিরোধ প্রতীত হইবে না, কারণ প্রকৃত 'শ্রাবয়েৎ...' স্থলে তাহা হইলে ব্যাসদেবেরও অভিপ্রায় ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণ করানোই হয়। এবং ভাষ্যকারও গ্রন্থকারের প্রকরণগত মর্মার্থই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সর্ববিরোধের পরিহার হয়।

সূত্রকার ও ভাষ্যকারের মধ্যে যে মতবিরোধ প্রতীত হইতেছিল, তাহার পরিহার করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আশা করি পূর্বোক্ত বিচারসহায়ে উহা সুসাধ্য হইবে। কিন্তু এই মতে জাতিশূদ্রের আর স্বতন্ত্র কোন অধিকারই রহিল না। বেদপাঠ বা বেদশ্রবণ তো দূরের কথা, ইতিহাস (মহাভারত) পুরাণাদিও তাহাকে ব্রাহ্মণের পিছনে বসিয়াই শুনিতে হইবে। কি দুরদৃষ্ট! কিন্তু কি করা যাইবে, কঠোর সনাতনী-দের রীতিই যে এইরূপ!

কিন্তু একটি প্রশ্ন মনে জাগে। পুরাণ-বক্তা তো স্বয়ং সূত। জাতি হিসাবে তিনি বর্ণসংকর। ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা হইতে উৎপন্ন পুত্রই সূত নামে প্রসিদ্ধ। তিনি তাহা হইলে পুরাণ-ইতিহাসবক্তা হইলেন কি করিয়া? তাঁহার তো প্রাচীন পন্থীগণের বিধান অনুযায়ী ব্রাহ্মণের পিছনে দূরে বসিয়াই পুরাণ-ইতিহাস শ্রবণ করিবার কথা। এক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সনাতনীগণ কি বলিবেন?*

* হরিদ্বার (কনখল) নিবাসী অধুনা ব্রহ্মলীন বুধাগ্রণী ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ-কথিত বিচারের আলোকে প্রবন্ধটি লিখিত। মহাভারতের শ্লোকসংখ্যাগুলি 'পুণা চিত্রশালা প্রেস' সংস্করণের।

নির্গুণব্রহ্ম ও ঈশ্বর

শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়

শাস্ত্রে অনেক স্থলে নির্গুণব্রহ্ম বা শুদ্ধচৈতন্যের এবং সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের পরস্পরের মধ্যে অন্যোন্যাধ্যাস করিয়া উক্ত হওয়ায় অনেকে নির্গুণব্রহ্ম ও ঈশ্বরের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া উভয়কে মিশাইয়া ফেলেন। সেইজন্য এই প্রবন্ধে আমরা এ বিষয়ে কিছু বলিতেছি। অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে নির্গুণব্রহ্ম বা শুদ্ধচৈতন্যে শক্তি বা উহা হইতে সৃষ্টি আদৌ স্বীকৃত নয়—ইহার নাম অজাতবাদ। অদ্বৈত-বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত মাণ্ডূক্য-কারিকা, যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ এবং শান্তি-গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়। মাণ্ডূক্য-কারিকায় বলা হইয়াছে—"ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে। এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে" (৩।৪৮)। অর্থাৎ 'কোন জীবই জন্মে নাই, উহার সম্ভাবনাও নাই; ইহাই উত্তম সত্য যে, কোন কিছুরই জন্ম হয় না।' গৌড়পাদ মাণ্ডূক্য-কারিকায় অজাতবাদের এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার গ্রন্থে বস্তুর পারমার্থিক সত্তা ও প্রাতিভাসিক সত্তা, এই দুই সত্তা স্বীকার করিয়াছেন; ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ব্যবহারিক সত্তার প্রাতিভাসিক সত্তা হইতে বৈলক্ষণ্য নাই। আচার্য শঙ্করের চরম সিদ্ধান্তে গৌড়পাদের সিদ্ধান্তের সহিত কিছু পার্থক্য নাই। তথাপি তিনি সাধারণ অজ্ঞ জীবের জন্য জগতের একটা ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন, যাহাতে সে কর্ম, উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া ক্রমশঃ অজাতবাদের চরম-সিদ্ধান্তের ধারণা করিতে পারে।

সৃষ্টি-ব্যাপারটা জীবের অনাদি অজ্ঞান-প্রসূত অর্থাৎ অনাদি অজ্ঞানবশতঃ জীব এই সৃষ্টির স্বপ্ন দেখিতেছে, জ্ঞানের উদয়ে উহার নিবৃত্তি হইবে এবং জীব, জগৎ, ঈশ্বর বলিয়া কিছু থাকিবে না, নির্গুণব্রহ্মমাত্রই অবশিষ্ট থাকিবেন। জীবের বুদ্ধি যাহাতে নির্গুণস্বরূপের অবধারণ করিতে পারে, তজ্জন্য শাস্ত্রে প্রথমে ব্রহ্মে সৃষ্টির অধ্যারোপ করিয়া এবং পরে সেই সৃষ্টির অপবাদ করিয়া অধ্যারোপ ও অপবাদের অধিকরণ-স্বরূপ নির্গুণব্রহ্মের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মে যে সৃষ্টির আরোপ করা হয়, সৃষ্টির সত্যত্ব-প্রতিপাদনে উহার তাৎপর্য নাই—সৃষ্টির মাধ্যমে নির্গুণব্রহ্মের প্রতিপাদনেই সৃষ্টি-শ্রুতির তাৎপর্য। যেমন 'তালপুকুর' এই শব্দে তালগাছের মাধ্যমে পুকুরকে লক্ষ্য করা হয়, তালগাছকে লক্ষ্য করা হয় না, এইরূপ - "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্মেতি" (তৈত্তিরীয় ৩।১)। "যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জন্মিয়াছে, যাঁহা দ্বারা ভূতগণ জীবিত থাকে এবং প্রয়াণকালে যাঁহাতে প্রবেশ করে, উহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর—উহাই ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মাধ্যমে উহার অধিষ্ঠান-স্বরূপ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, সৃষ্টিকে লক্ষ্য করা হয় নাই। এইরূপ অপবাদেও 'নেতি' 'নেতি' রীতিতে সমস্ত দ্বৈতের নিষেধ করিয়া সেই নিষেধের অবধি-স্বরূপ নির্গুণব্রহ্মে জগতের পর্যবসান করা হয়। অধ্যারোপ বা অপবাদ কোনটিই সত্য নয়, যে অধিকরণে ঐ অধ্যারোপ বা অপবাদ করা হয়, উহাই সত্য।

যখনই আমরা সৃষ্টি স্বীকার করি, তখনই নির্গুণব্রহ্মে মায়াশক্তি স্বীকৃত হইয়া পড়ে। মায়াশক্তি স্বীকৃত হইলে সেই মায়ার অপেক্ষায় নির্গুণব্রহ্ম ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হন। এই ঈশ্বরই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা ও সর্বশক্তিমান্। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা স্বীকৃত হইলে স্বতই উহার অবতারত্বও

স্বীকৃত হইয়া পড়ে। এই ঈশ্বর মায়াধীশ, মায়াধীন নহেন। যাদুকর যেমন যাদুবিদ্যা দেখাইয়াও উহা দ্বারা মুগ্ধ হয় না, এইরূপ ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিয়াও উহা দ্বারা মুগ্ধ হন না বা স্বীয় নির্গুণ-স্বরূপ হইতে চ্যুত হন না। সেইজন্য ঈশ্বর নিত্যমুক্ত ও নিত্যজ্ঞানী। এই ঈশ্বর-প্রসাদেই জীবের জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানই (বৃত্তিজ্ঞানই) অজ্ঞানের নাশ করিয়া জীবের স্বীয় ব্রহ্ম-স্বরূপের পরিচয় করাইয়া দেয়—"উদেতি শুদ্ধচিত্তানাং বৃত্তিজ্ঞানং ততঃ পরম্" (অপরোক্ষানুভূতি ১৩৭ শ্লোক—শ্রীশঙ্করাচার্য)। অর্থাৎ 'বৃত্তি ব্রহ্মাকারা হইলে উহার পর শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের (অহং ব্রহ্মাস্মিরূপ) বৃত্তিজ্ঞানের উদয় হয়।' পরে প্রারব্ধক্ষয়ে জীব স্বীয় নির্গুণ-স্বরূপের সহিত একীভূত হইয়া যান—ইহাকে বিদেহমুক্তি বলা হয়। বিদেহমুক্তির পূর্বে যে জীবন্মুক্ত অবস্থা, উহা ঈশ্বরকোটিতে স্থিত। বৃত্তিজ্ঞানই (বিদ্যাই) অজ্ঞানের (অবিদ্যার) বিরোধী বলিয়া উহার নাশক। নির্গুণব্রহ্ম বা নির্গুণজ্ঞান অজ্ঞানের নাশক নহে—কারণ বিদ্যা বা অবিদ্যা কাহারও সহিত নির্গুণ-ব্রহ্মের বিরোধ নাই, বরং নির্গুণব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই ভাসে বা প্রকাশ পায়। সেই নির্গুণজ্ঞান বা শুদ্ধচৈতন্য যখন অখণ্ডাকারা বা ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে স্থিত হন, তখন সেই জ্ঞানের অজ্ঞাননাশের সামর্থ্য আসে। ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে আরূঢ় চৈতন্যের নাম ব্রহ্মজ্ঞান—শক্তির দিক্ দিয়া দেখিলে উহার নাম ব্রহ্মবিদ্যা—ইনিই জগন্মাতা সরস্বতী, গায়ত্রী, দুর্গা প্রভৃতি। মায়ের কৃপা ভিন্ন বাবার (নির্গুণ-ব্রহ্মের) পরিচয় হয় না—"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী" (চণ্ডী ১ম মাহাত্ম্য)। অর্থাৎ 'তিনিই মুক্তির হেতুভূতা সনাতনী পরমা ব্রহ্মবিদ্যা'। বন্ধ, মুক্তি, জ্ঞান (বৃত্তিজ্ঞান), অজ্ঞান, দেশ, কাল, কার্যকারণভাব সবই ঈশ্বরের মায়াশক্তির অন্তর্গত। নির্গুণব্রহ্মে ঐ সকল নাই। "ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্নবদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা" (মাণ্ডুক্য-কারিকা ২।৩২)। অর্থাৎ অজাতবাদের চরম সিদ্ধান্ত 'নিরোধ, উৎপত্তি, বদ্ধ, সাধক, মুমুক্ষু, মুক্ত প্রভৃতি কিছুই নাই—ইহাই পরমার্থতা।'

দ্বৈতের সাহায্যেই অদ্বৈতের জ্ঞান হয়। বাক্যমনের অগোচর নির্গুণব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য শ্রুতি সর্বদা জীব, ঈশ্বর ও জগতকে আশ্রয় করিয়াই বুঝাইয়া থাকেন—"অবাঙ্‌মনসগম্যং তং শ্রুতির্বোধয়িতুং সদা। জীবমীশং জগদ্বাপি সমাশ্রিত্য প্রবোধয়েৎ" (পঞ্চদশী—কূটস্থদীপ ৭২ শ্লোক)। নির্গুণব্রহ্মে দেশ ও কাল না থাকায় তাঁহাকে সর্বব্যাপক বলা যায় না এবং কারণ-কার্য বিভাগ না থাকায় তাঁহাকে জগৎকারণও বলা যায় না। এই সর্বব্যাপকত্ব ও জগৎকারণত্ব ঈশ্বররাজ্যে স্থিত। ঈশ্বরের ঐ ধর্ম নির্গুণব্রহ্মে আরোপিত করিয়া উঁহাকে সর্বব্যাপক বা জগৎকারণ বলা হয় মাত্র। "সংবিদ্ধি মাং সর্ববিসর্বমুক্তম্" (অবধূত গীতা ৪।১৮)। অর্থাৎ 'আমাকে সর্ব ও বিসর্ব হইতে মুক্ত জানিবে।' "নহি কারণকার্যবিভাগ ইতি" (অবধূত গীতা ৫।৬)। অর্থাৎ 'আত্মাতে কার্যকারণ বিভাগ নাই।' গৌড়পাদ বলিলেন—"যাবদ্ধেতুফলাবেশঃ সংসারস্তাবদায়তঃ। ক্ষীণে হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে" (মাণ্ডুক্য-কারিকা ৪।৫৬)। অর্থাৎ 'যাবৎ হেতু ও ফলে (কারণ ও কার্যে) আগ্রহ থাকে, সংসারও তাবৎ বিস্তৃত থাকে। হেতু ও ফলের আগ্রহ ক্ষীণ হইলে আর সংসার-প্রাপ্তি ঘটে না।' পঞ্চদশী বলিলেন—"সর্বদেশপ্রক্লৃপ্ত্যৈব সর্বগত্বং ন তু স্বতঃ" (নাটক-দীপ ১১ শ্লোক)। অর্থাৎ 'সর্বদেশের কল্পনা হইতে নির্গুণব্রহ্মকে সর্বব্যাপক বলা হয়, স্বতঃ তাঁহাতে সর্বব্যাপকত্ব নাই।' ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব-সম্বন্ধে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী তাঁহার গীতাভাষ্যের ৯।১০

শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"অস্ত দ্বৈতেন্দ্রজালস্য যদুপাদানকারণমজ্ঞানং তদুপাশ্রিত্য ব্রহ্মকারণমুচ্যতে" অর্থাৎ 'এই দ্বৈতরূপ ইন্দ্রজালের উপাদানকারণ যে অজ্ঞান, উহাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মকে (নিগু'ণব্রহ্মকে) জগতের কারণ বলা হয়।' সুতরাং ঈশ্বররাজ্যে সব বস্তু স্থিত বলিয়া ঈশ্বর সর্বব্যাপক এবং ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া জগতের কারণ। ঈশ্বরের সর্বব্যাপকত্ব এবং জগৎকারণত্ব যেমন নিগু'ণব্রহ্মে আরোপিত হয়, এইরূপ নিগু'ণব্রহ্মের সত্যত্ব ঈশ্বরে আরোপিত হইলে ঈশ্বরত্বকেও সত্য বলিয়া আমাদের ভ্রম হয়। এই যে নিগু'ণব্রহ্মের ও ঈশ্বরের পরস্পরের মধ্যে অধ্যাস—ইহাকে অন্যোন্যাধ্যাস বলে।

প্রঃ—নিগু'ণব্রহ্মে যখন মন, বুদ্ধি, দেশ, কাল প্রভৃতি নাই, তখন আমরা উহার ধারণা করিব কিরূপে ?

উঃ - নিগু'ণব্রহ্ম সকলের স্বরূপ এবং স্বয়ং-প্রকাশ বলিয়া আমরা দ্বৈতের মিথ্যাত্ব অবধারণপূর্বক দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিতরূপে আমাদের নিগু'ণ-স্বরূপের অবধারণ করিতে পারি। আমরা আকাশকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও আকাশ-স্থিত বস্তু সকলের নিষেধপূর্বক আমাদের বুদ্ধিতে আকাশের অবধারণ করি। যদি বল, আকাশ আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, তদুত্তরে বলি, আলোক ও অন্ধকার ব্যতীত আকাশ বলিয়া কোন পৃথক্ বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। সেই আলোক ও অন্ধকারের নিষেধ করিয়া আমরা যদি আমাদের বুদ্ধিতে আকাশের অবধারণ করিতে পারি, তবে আকাশেরও নিষেধপূর্বক আমরা আমাদের নিগু'ণ-স্বরূপের অবধারণ করিতে পারিব না কেন? পূর্বেই বলিয়াছি যে দ্বৈতের সাহায্যে অদ্বৈতের জ্ঞান হয়—যদি বেদ, ঈশ্বর, গুরু, শুদ্ধবুদ্ধি প্রভৃতি ঈশ্বর-দ্বৈত না থাকিত, তবে আমাদের নিগু'ণ-স্বরূপের জ্ঞান হইত না। যেমন সমুদ্র দর্শন করিতে গেলে সমুদ্রের নিকটস্থ স্থলভাগে দাঁড়াইয়া লোকে সমুদ্র দর্শন করে, এইরূপ বিচার দ্বারা অধিষ্ঠানের প্রধানতা হইলে সগুণের প্রান্তভাগে সেই শুদ্ধবুদ্ধিতে স্থিত হইয়াই জীব স্বীয় নিগু'ণ-স্বরূপের অবধারণ করিতে পারে—শুদ্ধবুদ্ধি না থাকিলে জীবের ব্রহ্মানুভূতি হইত না। পঞ্চদশী বলিয়াছেন—"ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাদধিষ্ঠান-প্রধানতা। যদা তদা চিদাত্মাহমসঙ্গোঽস্মীতি বুধ্যতে" (তৃপ্তিদীপ ৮ শ্লোক)। অর্থাৎ "যখন ভ্রমাংশের তিরস্কার দ্বারা অধিষ্ঠানের প্রধানতা হয়, তখন জীব 'আমি চিদাত্মা অসঙ্গই,' ইহা বুঝিতে পারে।" যেমন আমরা আখের রস খাই ও ছিব্‌ড়া ফেলিয়া দিই, কিন্তু রসকে পাইবার জন্য ছিব্‌ড়ার প্রয়োজন আছে, এইরূপ নিগু'ণব্রহ্মের অবধারণের জন্য সগুণের বা দ্বৈতের প্রয়োজন আছে। জ্ঞানলাভ হইলে সেই সগুণভাব স্বতই পরিত্যক্ত হইয়া নিগু'ণব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকিয়া যান। পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বর সর্বব্যাপক ; সর্ব বলিতে জগৎকে বুঝায়। যেমন নাট্যকার জানেন যে, নাটকের প্রতিটি জীব বা বস্তু তাঁহারই বিস্তার, এইরূপ ঈশ্বরও জানেন যে জগতের সকল বস্তুই তাঁহারই বিস্তার। সবই তিনি হওয়ায় দ্বিতীয় বস্তু হইতে ঈশ্বরের ভয় নাই এবং তিনি নিত্যমুক্ত। কিন্তু জীব আপনার সর্বব্যাপক ভাবটি জানে না বলিয়া দ্বিতীয় বস্তু হইতে জীবের ভয় হয় এবং জীব বদ্ধ। ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারাই তদনুগ্রহে জীব স্বীয় নিগু'ণ-স্বরূপের অবধারণ করিতে পারে এবং পরে প্রারব্ধক্ষয়ে কৈবল্যমুক্তি লাভ করে, অর্থাৎ স্বীয় নিগু'ণ-স্বরূপে স্থিত হয়। মনে রাখিতে হইবে, মায়া ঈশ্বরের বশ বলিয়া ঈশ্বর মায়া দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, লয়াদি করিয়াও স্বয়ং অকর্তা-স্বরূপ এবং স্বীয় নিগু'ণ-স্বরূপ হইতে চ্যুত নহেন। পঞ্চদশী বলিয়াছেন—"মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ। যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্ব-

দ্বৈতমেব হি ॥' (চিত্রদীপ ২৩৬ শ্লোক)। অর্থাৎ 'মায়া নামক কামধেনুর জীব ও ঈশ্বর এই দুইটি বৎস। ইহারা যথেচ্ছ দ্বৈত পান করুক; তত্ত্ব কিন্তু অদ্বৈত বস্তু (নির্গুণব্রহ্ম)'—ঈশ্বরমুক্ত ভাবে এবং জীব বদ্ধভাবে দ্বৈত পান করেন। কিন্তু বন্ধন বা মুক্তি সবই মায়ার মধ্যে ও ঈশ্বররাজ্যে স্থিত নির্গুণব্রহ্মে বন্ধন, মুক্তি প্রভৃতির প্রসঙ্গ নাই।

নির্গুণব্রহ্ম অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু ঈশ্বর, মায়া, জীব প্রভৃতি অনাদি হইলেও অনন্ত নয়। জ্ঞান হইলে ঈশ্বরভাব, জীবভাব ও মায়ার অন্ত হইয়া যায়। জীবন্মুক্ত পুরুষ ঈশ্বরকোটি অতিক্রম করিতে পারেন না। জগৎ তাঁহার নিকট প্রতীত হয়, কিন্তু তাঁহার উহাতে সত্যবুদ্ধি হয় না। যে বৃত্তিদ্বারা জগৎ তাঁহার নিকট মিথ্যাভাবে প্রতীত হয়, উহাকে বাধিতানুবৃত্তি বলে—উহাই অবিদ্যা-লেশ। কিন্তু বিদেহ মুক্তিতে ঐ বাধিতানুবৃত্তিও থাকে না। তখন জীব, জগৎ, ঈশ্বর প্রভৃতির প্রতীতিও থাকে না। জীব তখন স্বীয় নির্গুণ-স্বরূপের সহিত একীভূত হন। কিন্তু বাধ (যাহা জ্ঞানীর হয়) জগতের অপ্রতীতি নয়। জগতের মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়কে বাধ বলে—"নাপ্রতীতিস্তয়োর্বাধঃ কিন্তু মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ" (পঞ্চদশী—চিত্রদীপ ১৩ শ্লোক)। ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ বিচার করিলে দেখা যায় যে চৈতন্যাংশে জীব ও ব্রহ্ম এক। কিন্তু শক্তির দিক্ দিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে মহৎ পার্থক্য বিদ্যমান। জীবের কখনও ঈশ্বরের ন্যায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিবার সামর্থ্য হয় না। ঈশ্বর নিত্যমুক্ত বলিয়া তাঁহার অবিদ্যালেশ নাই। জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত বলিয়া জ্ঞানলাভের পরেও জীবের কদাচিৎ বিক্ষেপ আসিতে পারে, তজ্জন্য জ্ঞান নষ্ট হয় না—"ভোগকালে কদাচিত্তু মর্ত্যোঽহমিতি ভাসতে। নৈতাবতাপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি ॥ জীবন্মুক্তিব্রতং নেদং কিন্তু বস্তুস্থিতিঃ খলু।" (পঞ্চদশী—তৃপ্তিদীপ ২৪৫।২৪৬ শ্লোক) অর্থাৎ 'ভোগকালে কদাচিৎ যদি আমি মরণশীল মনুষ্য এই বিক্ষেপও আসে, তথাপি এইটুকু অপরাধের জন্য তত্ত্বজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কারণ, জীবন্মুক্তি কোন ব্রতপালনের ন্যায় নয়, যে উহার ভঙ্গ হইলে অনর্থ হইবে—ইহা বস্তুর স্বরূপস্থিতি মাত্র।' কিন্তু শুদ্ধচৈতন্য বা নির্গুণব্রহ্ম ঈশ্বর ও জীবের অধিষ্ঠান বলিয়া জ্ঞানী জীব সেদিকে লক্ষ্য করিয়া মনে করিতে বা বলিতে পারেন —'আমিই ঈশ্বররূপে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করি।' "ময়ি ঈশত্বং জীবত্বং কল্পিতো বস্তুতো ন হি" অর্থাৎ 'আমাতে (নির্গুণব্রহ্মে) ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব কল্পিত—বস্তুতঃ নহে।'

প্রঃ—আপনি জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিতে ভেদ দেখাইয়াছেন। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠাদি গ্রন্থে বলা হইয়াছে, উভয়ের মধ্যে ঈষন্মাত্রও ভেদ নাই।

উঃ—ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ঐ ভেদ অবশ্যই আছে, নতুবা শাস্ত্রে দুইটি পৃথক্ শব্দের ব্যবহার হইত না এবং আচার্যগণও জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তির পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করিতেন না। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে যোগবাশিষ্ঠাদির ঐ বাক্যের ভেদে তাৎপর্য নাই। শুদ্ধচৈতন্যে জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তি বলিয়া কিছুই নাই—উহারা মিথ্যা মায়ার রাজ্যেই স্থিত। যোগ-বাশিষ্ঠাদি গ্রন্থের উক্তপ্রকার বাক্যের তাৎপর্য জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তি বিষয়ে বিবাদ ত্যাগ করিয়া জীবের বুদ্ধিকে পারমার্থিক নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বে উন্নীত করান। পরমার্থতঃ উহাদের কোনটিই নাই। তাই মহর্ষি অষ্টাবক্র বলিয়াছেন—"ক্ব প্রারব্ধানি কর্মাণি জীবন্মুক্তিরপি ক্ব বা। ক্ব তৎ বিদেহ-কৈবল্যং নির্বিশেষস্য মে সর্বদা" (অষ্টাবক্র-সংহিতা ২০।৪)। অর্থাৎ 'সর্বদা নির্বিশেষ আমার প্রারব্ধ কর্মসকল, জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তি কোথায়!

"ওঁ তৎ সৎ"

'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ'

শ্রীসমরেন্দ্র নাথ মিত্র

বহুদিন থেকে 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' নামে একটি বই-এর কথা শুনে আসছি—বইটি নাকি অপূর্ব। কিন্তু বইটির নাম শুনে পড়বার তেমন কোনও আগ্রহ হতো না; মনে করতাম, হয়তো বা মামুলী ধর্মকথায় ভরা একটা গতানুগতিক বই মাত্র। কয়েক বছর আগে এক ভক্তিভাজন স্বামীজীর উপদেশে বইটি পড়তে শুরু করি। গোড়াতেই পাই স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর লেখা ভূমিকা—তাঁর হস্তাক্ষরের প্রতিরূপ। তিনি লিখেছেন—'দেবদেবীর বিষয়ে তিনি (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলিতেন যে তাঁহারা সত্যসত্যই আছেন। কল্পনার কথা নহে। তিনি তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেন ও তাঁহাদের সহিত কথা বলিতেন ও তাঁহাদের প্রত্যুত্তর শুনিতেন।' স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর লেখা ভূমিকার এই অংশটুকু পড়েই বেশ একটু আশ্চর্য হলাম। তবু দুশোর বেশী পৃষ্ঠা বইখানিতে! সমস্তটা পড়ার ধৈর্য কোথায়! পাতা ওল্টাতে লাগলাম—কি আছে দেখবার জন্য। এক জায়গায় চোখ পড়লো: কোন এক ভক্ত নৈরাশ্যের সুরে বলছে—'ধ্যান ভজন করছি কিন্তু ওদিকে একটা taste (রস) পাচ্ছি না, যেন জোর করে করছি। এর উপায় কি?' রাজা মহারাজ নানাপ্রকার উপদেশ ও আশ্বাস দিয়ে শেষে বললেন—'তোমাদের একটা self-reliance (আত্মবিশ্বাস) নেই; সাধন পথে পুরুষকার দরকার। কিছু কর—চার বৎসর অন্ততঃ করে দেখ দেখি। যদি কিছু না হয় তবে আমার গালে এক চড় মেরো।' শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্রের এই ধরণের উক্তিতে চমকে উঠলাম এবং মনে পড়লো শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই আক্ষেপবাণী—ঈশ্বর আছেন একথা কাকেই বা বলি, কেই বা শুনে। সমস্ত বইটা পড়বার বেশ আগ্রহ হলো এবং পর পর কয়েকবার পড়বার লোভ সামলাতে পারলাম না। দেখলাম, আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত সন্দেহ এবং ভগবানলাভ এজীবনে সম্ভব কি না, এ ধরণের নানা প্রশ্ন যা সহজেই মনে জাগে এবং সারা জীবন অমীমাংসিত থেকে যায়, সবই এখানে অতি সরল সহজ ভাষায় বোঝান হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এখনও আছেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন রাজা মহারাজ, 'তোর দেখচি মাথা-ফাতা খারাপ হয়ে গেছে। আমরা বাড়ী ঘরদোর ছেড়ে দিয়ে আজীবন এইভাবে পড়ে রয়েছি কিসের জন্য? তাঁকে জানবার জন্য দিন রাত তাঁর নিকট প্রার্থনা কর।' এই উত্তরেও বোধ হয় প্রশ্নকর্তার সন্দেহ পুরোপুরি নিরসন হল না, তাই আবার প্রশ্ন: 'আপনারা এখন ঠাকুরকে দেখতে পান?' উত্তর এলো: 'তিনি যখন দয়া করে দেখা দেন তখন দেখতে পাই। তাঁর দয়া হলে সবাই তাঁকে দেখতে পাবে। তবে তাঁকে দেখবার সে অনুরাগ সে আকাঙ্ক্ষা কয়জনের আছে?'

একজন বলছেন: 'মন ত কিছুতেই স্থির হয় না।' মহারাজ নির্দেশ দিচ্ছেন: 'প্রত্যহ কিছু কিছু ধ্যান জপ করবে। কোন দিন বাদ দেবে না! মন বালকের ন্যায় চঞ্চল, ক্রমাগত ছুটাছুটি করে। উহাকে পুনঃ পুনঃ টেনে এনে ইষ্টের ধ্যানে মগ্ন করবে। এইরূপ দুই তিন বৎসর করলেই দেখবে যে, প্রাণে অনির্বচনীয় আনন্দ আসচে, মনও স্থির হচ্চে। প্রথম প্রথম জপ ধ্যান নীরসই লাগে ···।' আরও আশ্বাস দিয়ে বলছেন: 'লোকে পরীক্ষা পাশ করতে কত

খাটে, কিন্তু ভগবানলাভ তা অপেক্ষা অনেক সহজ। প্রশান্ত অন্তঃকরণে সরলভাবে তাঁকে ডাকতে হয়।' এই আশার বাণী শুনলে কার না প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার হয়! উৎসাহ ভরে জিজ্ঞাসু আবার বলছেন: 'ইহা অত্যন্ত আশার কথা যে, পরীক্ষা যখন পাশ করতে পেরেছি, তখন চেষ্টা করলে ভগবানলাভও কেন করতে পারব না।'

'মন্ত্র নেবার কি দরকার?' এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন মহারাজ: 'মন্ত্র না নিলে একাগ্রতা আসে না। আজ হয়ত তোমার কালীরূপ ভাল লাগল, আবার কাল হরিরূপ ভাল লাগল, পরশু নিরাকারে মন হলো ফলে কোনটাতেই একাগ্রতা হবে না। মন স্থির না হলে ভগবান লাভ ত দূরের কথা, সাধারণ সাংসারিক কাজের মধ্যেও অনেক গোলমাল হবে। ভগবান লাভ করতে গুরুর একান্ত দরকার। গুরু শিষ্যের ভাবানুযায়ী মন্ত্র ও ইষ্ট ঠিক করে দেন।'

আধ্যাত্মিক জগতের এই অপূর্ব কাহিনী পড়ে শেষ করা যায় না। মনে হয়, আবার পড়ি কিছু বুঝি না, তবু পড়বার ইচ্ছা হয়। একবার পড়লেই যেন মহারাজের স্নেহমাখা কথাগুলি হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে ঝংকার দিতে থাকে। মনে হয়, সে রাজ্যে প্রবেশ করা অতি সহজ।

বলছেন মহারাজ—'এই জীবনের কিছুই ঠিক নেই। দশ বিশ বছর পরে শেষ হতে পারে বা আজই শেষ হতে পারে।··· পথের সম্বল যত শীঘ্র করা যায় ততই ভাল। কি জানি কখন ডাক আসে। শেষে কি খালি হাতে অজানা, অচেনা দেশে যেতে হবে? খালি হাতে অজানা দেশে গেলে বড় কষ্ট পেতে হয়। যখন জন্মেছ তখন মৃত্যু নিশ্চয়ই হবে। মৃত্যু হলে অন্য এক দেশে যেতে হবে এটাও ঠিক। যো সো করে পথের সম্বল নিয়ে বসে থাক। ডাক এলে হাসতে হাসতে চলে যাবে। কাজ গোছান থাকলে আর কোন ভয় থাকবে না। মনে ঠিক ঠিক জানা থাকে আমাদের পথের সম্বল আছে।' — কী সুন্দর কথা! সকলেরই জানা কিন্তু আমরা আত্মবিস্মৃত। পথের সম্বল যে যোগাড় করতেই হবে তা মনেও হয় না!

মহারাজের এই সব কথা যখন পড়ি তখন মন স্বতই সেই অজানা অচেনা রাজ্যের রহস্য ভেদ করতে চায়। নদী পার হতে হবে অপর কূলে যাবার জন্য। তার জন্য নৌকার মাঝি চাই নিশ্চয়ই। মনে করিয়ে দেয় মৃত্যু হল জীবনের সবচেয়ে নিশ্চিত ঘটনা। পৃথিবীর সব কিছুই যুক্তি বা তর্কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় কিন্তু মৃত্যু তর্কাতীত সত্য। আশ্চর্যের বিষয় মৃত্যু-প্রসঙ্গকে আমরা সব সময় এড়িয়ে চলতে চাই। নানা ছলে মৃত্যুর বিভীষিকা আমরা মন হতে পুঁছে ফেলতে চাই—আমাদের প্রাণের কথা:

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

জীবনের অপর পারে যেতে আমরা ভয় পাই, কারণ ঈশ্বর আছেন কিনা এবং তাঁকে পাওয়া যায় কিনা এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি না। জীবনের পারে যাবার পথের সম্বল কিছু করে রাখিনা। খালি হাতে অচেনা জায়গায় যেতে সকলেরই ভয়। কিন্তু রাজা মহারাজ বিষয়টিকে অনেক সোজা করে দিয়ে বলেছেন—'ঈশ্বরে খুব ভক্তি করবে। ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর নেই, কখনও মনে করো না। আমি বলছি, ঈশ্বর আছেন—নিশ্চয় আছেন জেনো।' আবার বলেছেন—'বাজে গল্প টল্প না করে সারাদিন তাঁর স্মরণ-মনন করবি। খেতে, শুতে বসতে—সর্বক্ষণ।·· মায়ার পর্দা একটার পর একটা খুলে যাবে। নিজের ভিতরে যে কি অদ্ভুত জিনিস আছে দেখতে পাবি—স্বপ্রকাশ হবি।'

তাঁর অমোঘ বাণী মৃত্যুর বিভীষিকা একেবারে উড়িয়ে দেয় এবং মনে পড়ে যায় সেই সনাতন আনন্দের বাণী :

'শোন শোন স্বরলোকবাসী
অমৃতের যে আছ সন্তান,
জানিয়াছি সেই অবিনাশী
জ্যোতির্ময় পুরুষ মহান্,
তপন-বরণ তিনি,
আঁধারের পারে যিনি,
তাঁহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায়,
নিস্তার লাভের আর নাহিরে উপায়।'

যাত্রা মোর শেষ করে দাও

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

আমার প্রিয়েরে খুঁজি এই বিশ্বময়,—
রূপে রসে শব্দে স্পর্শে—যথা ইচ্ছা হয়।
লভিয়া কল্পিতে মাত্র শুধু ব্যর্থতায়,
প্রিয়েরে খুঁজিতে মোর দিন চলে যায়।
যাহারে আঁকড়ি' ধরি দয়িত ভাবিয়া,—
সে নহে বাঞ্ছিত মোর, —বুঝিনু লভিয়া!
খোঁজার ব্যর্থতা মাঝে লাভের লালসা।
প্রিয়ের আভাস-মাত্র চলার ভরসা॥
চলিয়াছে যাত্রা মোর জন্মজন্মান্তরে,
আদিহীন কাল হতে অনন্তের পরে।
এ-যাত্রায় ক্লান্ত আমি চলিতে না পারি।
অক্ষমেরে লহ তুলে দু'হাত প্রসারি।
হে দয়িত! রাখ খেলা, স্বরূপ দেখাও।
এ-জন্মেই যাত্রা মোর শেষ করে দাও॥

শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত প্রমদাদাস মিত্র

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র কর

রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুর কাশীর জমিদার ছিলেন। প্রচুরবিত্তশালী, ধর্মপ্রাণ, শাস্ত্রজ্ঞ অথচ নিরভিমান এই পুরুষপ্রবরের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি গভীর ভক্তি-বিশ্বাস ছিল। তাঁহার রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণষট্‌কম্‌'-স্তবটিই এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই স্তবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতার-পুরুষ বলিয়া বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী শিবানন্দজী একদিন এই স্তবটি পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন— 'ঠাকুরের এত স্তব আছে, কিন্তু এইটেই সব চেয়ে চমৎকার। প্রমদাদাসবাবু একাধারে কবি, ভক্ত, লেখক ছিলেন'।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে ১২ই অগস্ট, ১৮৮৮ হইতে ৪ঠা জুন, ১৮৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত ৪৮টি পত্রের মধ্যে ৩২টি পত্রই প্রমদাদাস মহাশয়কে লিখিত। পত্রগুলিতে স্বামীজীর ('দাস নরেন্দ্র-নাথে'র) নানাবিধ সম্ভ্রমসূচক সম্ভাষণ লক্ষণীয়— 'পূজ্যপাদেষু', 'পূজ্যপাদ মহাশয়', 'পূজনীয় মহাশয়', 'নমস্য মহাশয়', 'মান্যবরেষু', 'ঈশ্বর-জ্যোতি মহাশয়েষু' ইত্যাদি। নানা প্রসঙ্গও পত্রগুলিতে থাকিত—শাস্ত্রার্থবোধে সন্দেহ নিরাকরণ হইতে ভক্তমণ্ডলীর প্রসঙ্গ পর্যন্ত। বাগবাজার হইতে ২৬।৫।১৮৯০-এ লিখেন: 'আপনি এক্ষণে রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের একমাত্র বন্ধু এবং আশ্রয়'। বরাহনগর মঠ হইতে ১৯।১১।১৮৮৮-এ লেখেন: 'মহাশয় আমার ন্যায় একজন ভিক্ষাজীবী উদাসীনের উপর এত অধিক স্নেহ প্রকাশ করেন, ইহা আমার প্রাক্তন সুকৃতিবশতঃ সন্দেহ নাই। 'বেদান্ত' প্রেরণদ্বারা মহাশয় কেবল আমাকে নয়, পরন্তু ভগবান রামকৃষ্ণের সমুদায় সন্ন্যাসিশিষ্যমণ্ডলীকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।... যাহা হউক, মহাশয় অতি পণ্ডিত ব্যক্তি এবং এ বিষয়ে আমাদের সদুপদেষ্টা, আপনি বিবেচনা করিয়া যদি এ বিষয়ে 'অষ্টাধ্যায়ী' সর্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহাই (যদি আপনার সুবিধা এবং ইচ্ছা হয়) দান করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন।··· মহাশয়কে আমার গুরুমহারাজের দুইখানি ফটোগ্রাফ এবং তাঁহার গ্রাম্য ভাষায় উপদেশের কিয়দংশ ··· প্রেরণ করিলাম। · ভরসা দুই-তিন মাসের মধ্যে মহাশয়ের চরণদর্শন করিয়া সার্থক হইব'। প্রয়াগধাম হইতে ৩১।১২।১৮৮৯-এ লেখেন: 'আপনার সঙ্গে কেমন প্রাণের টান আছে—অত ভাল আর কোথাও লাগে না'। কলিকাতা হইতে ৪।৭।১৮৮৯-এ লেখেন: "কে জানে মহাশয়ের সহিত জন্মান্তরীণ কি হৃদয়ের যোগ, নহিলে এই কলিকাতায় বহু ধনী মানী লোক আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাঁহাদের সঙ্গ আমার সাতিশয় বিরক্তিকর বোধ হয়, আর মহাশয়ের সহিত এক দিবসের আলাপেই প্রাণ এবম্প্রকার মুগ্ধ হইয়াছে যে আপনাকে হৃদয় পরমাত্মীয় এবং ধর্মবন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে। মহাশয় ভগবানের প্রিয় সেবক, এই একটি কারণ। আর একটি বোধ হয়—'তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধ-পূর্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি'। ভূয়োদর্শন এবং সাধনের ফলস্বরূপ মহাশয়ের যে উপদেশ, তজ্জন্য আপনার নিকট ঋণী রহিলাম"।

প্রমদাদাস রচিত দর্শনতত্ত্বমূলক পুস্তিকা পাইয়া স্বামীজী ১৩।১২।১৮৮৯ তারিখে লেখেন: 'আপনার রচিত **pamphlet** (পুস্তিকা) পাইয়াছি।··· আপনার উত্তর অতি **pointed** (তীক্ষ্ণ) এবং

thrashing (সম্পূর্ণরূপে বিপক্ষযুক্তি-খণ্ডনকারী)'। এইভাবে স্বামীজীর নানা পত্রে প্রমদাদাসের অগাধ সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞান ও অশেষ সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই ভাগ্যবান বিত্তবান সজ্জনের প্রসঙ্গ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর অনুষঙ্গ বলিয়া স্মরণীয়, মননীয়। তাঁহার পৌত্র, শ্রীশম্ভুপদ মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত তথ্য হইতে জানিতে পারিয়াছি যে প্রমদাদাস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হন। পরিব্রাজক-অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী সন্তানগণ অনেকেই প্রমদাবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

বারাণসীর চৌখাম্বার মিত্রবাড়ী বিখ্যাত। প্রমদাদাসের প্রপিতামহ দেওয়ান আনন্দময় কাশীতে বসবাস করিতেন। তিনি কলিকাতা কুমারটুলির স্বনামধন্য দেওয়ান গোবিন্দরামের কনিষ্ঠ পৌত্র। আনন্দময় রাজসাহী কলেক্টরের দেওয়ান ছিলেন। প্রমদাদাসের পিতামহ রাজা রাজেন্দ্রলাল দানশীল ও খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁহাদের প্রাসাদ-সংলগ্ন রাজপথ তাঁহারই নামে। দেওয়ান আনন্দময় সমগ্র উত্তর ভারতের মধ্যে দুর্গা ও কালী প্রতিমা পূজার প্রথম প্রবর্তক। অদ্যাবধি তাঁহার আবাসে উহা চলিয়াছে। প্রমদাদাসের পিতা বরদাদাসের মৃত্যুতে (১৮১৯ খ্রীঃ) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট জে. আর. কলভিন সমবেদনা-পত্র পাঠান। ভারতের গবর্নর জেনারেল-এর দরবারের 'পুরুষানুক্রমিক সম্ভ্রান্ত জনের' তালিকায় মিত্রবংশীয়েরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

নানা জনহিতকর কাজে বরাবর ইঁহাদের দান ছিল। রাজঘাট হইতে বারাণসী পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোডের জন্য রাজেন্দ্রলাল স্বীয় জমিদারীর মুকুন্দপুর মহলের সাড়ে আট বিঘা জমি দান করেন। বেনারস কলেজে তাঁহার দান ছিল। এইজন্য ইংরাজ শাসক সম্মানসূচক সাতপর্যায়ের খেলাৎ উপহার দেন—মুক্তার কণ্ঠহার, হীরক অঙ্গুরীয়, স্বর্ণ কটিবন্ধ, জরির জামা, পাজামা, পাগড়ী আর পাল্কী। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পরও দুই হাজার টাকার খেলাৎ আসিয়াছিল। ইঁহাদের উল্লেখযোগ্য দানের মধ্যে কাশীর অন্ধ ও কুষ্ঠাশ্রমে কূপ খননে ৬,০০০ টাকা, যুবরাজের ভারত ভ্রমণ স্মৃতি রক্ষায় ৬,০০০ টাকা, চক্ ডিস্‌পেন্সারিতে ৫,০০০ টাকা, এলাহাবাদ কলেজে ১,০০০ টাকা, রাজসাহীর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে ৫০০ টাকা, ১৮৭৮-এ দীনদরিদ্র-ত্রাণে ১,০০০ টাকা, ইউরোপীয় হাসপাতালে ৩,৬০০ টাকা। এই কুলের গুরুদাস ব্রিটিশ যুবরাজের বিবাহ উপলক্ষে বারাণসী হইতে যথাযোগ্য উপঢৌকন প্রেরণে অগ্রণী হন। সেক্রেটরি অফ্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া ইহাতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার সরকারী খেলাৎ লাভ হয়। বারাণসীর মান্যজনদের মধ্যে ক্যালকাটা ডাইরেক্টরীতে (১৮৬৫) তাঁহার নাম রহিয়াছে।

প্রমদাদাস এইরূপ ঐশ্বর্যে পালিত হইয়াও অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুল অমায়িকতা, নীরব দান-শীলতা, আন্তরিক ভক্তিনিষ্ঠা ইত্যাদি গুণের অধিকারী হন। সেকালে বহু পণ্ডিতসভায় তিনি নিয়মিত যোগদান করিতেন। সকলেই তাঁহার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইতেন। নিজগৃহেও এরূপ সভা হইত। একবার বৃটিশ সরকার তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিতে চাহিলে, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন; তাঁহার মত ছিল যে, ব্রাহ্মণ-গণই ইহার অধিকারী। অবশেষে তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। ভারতসম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে (১৮৫৮) তিনি ইংরাজের জাতীয় সঙ্গীতের এক মনোজ্ঞ সংস্কৃত অনুবাদ রচনা করিয়া পাঠান। সেখানে এক মহতী সভায় তাহা আদৃত হয়। ভগবদ্গীতার তিনি ইংরাজী অনুবাদ করিয়া-

ছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে বেদশাস্ত্রের অনুবাদক আর. জেড্. এইচ. গ্রিফীথ, এম এ., সি. আই. ই. নিজে সহযোগিতা করেন (১৮৬৭)। অনুবাদে শঙ্করাচার্য, শ্রীধর, আনন্দগিরির টীকা-ভাষ্যের উল্লেখ আছে এবং স্থানে স্থানে নিজ মন্তব্যও দিয়াছেন।

প্রমদাদাসের রচিত শ্রীশিবানন্দ সুধাধারা পুস্তিকা ৪৫ পৃষ্ঠায় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকায় প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধে যথাক্রমে ৯৬টি এবং ১৫টি শ্লোক আছে।

উপসংহারে তাঁহার জীবনের কয়েকটি ঘটনা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালীর উল্লেখ করিতেছি। একবার জমিদারীর খাজনা আসিল প্রায় লক্ষ টাকা। নায়েব গোমস্তা গণনায় ব্যস্ত। কুলগুরু একসঙ্গে এত টাকার থাক্ শেষ হইলে দেখিবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কর্মচারীর কাছে। এই কথা প্রমদাদাসের কানে উঠিলে সেইবারের সব টাকা তিনি গুরুদেবকে অর্পণ করিলেন। একবার স্থানীয় এক দুঃস্থ পরিবার অভাবের অসহ্য তাড়নায় প্রত্যূষে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করে। রাত্রে ভক্ত প্রমদাদাসের প্রতি বিশ্বনাথের স্বপ্নাদেশ হয়। যথাকালে সাহায্য পাঠাইলে পরিবারটি রক্ষা পায়। শুধু তাহাই নয়, উক্ত পরিবারের ভবিষ্যতের সংস্থানও তিনি করিয়া দিয়াছিলেন। ছোট বড় সকলেরই প্রতি তাঁহার তুল্যদৃষ্টি ছিল। প্রভাতী গীতে ভজনানন্দ গোঁসাই প্রত্যহ তাঁহাদের প্রীত করিত। মিত্র মহাশয় এক প্রভাতে তাঁহাকে জানাইলেন যে, যেদিন তাঁহার বংশধর ভূমিষ্ঠ হইবে, সেই শুভদিনে সে যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। সরল গোঁসাই তখনি চাহিয়া বসিল কোঁচড়ভর্তি টাকা। রাজা সানন্দে যথাকালে সেই প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া অন্ধকার থাকিতেই তিনি বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন করিতেন। গৃহে আসিয়া একেবারে টাট্‌কা কাঁচা গোদুগ্ধ পান করিতেন এবং ঈশ্বরারাধনায় বসিতেন—প্রায় দিবাবসান হইবার উপক্রম এমন সময় অন্নগ্রহণ করিতেন। নিত্য রাজভোগ তাঁহার সম্মুখে সাজাইয়া দেওয়া হইলেও নামমাত্র অন্নাদি গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। অবশিষ্ট অপরের জন্য থাকিয়া যাইত। একাধারে রাজা এবং ঋষির জীবন ছিল প্রমদাদাসের। ক্ষিতিমোহন সেন বলিয়া গিয়াছেন: ইহলোকের সাধনা হ'ল সংস্কৃতি, অনন্তলোক নিয়ে সাধনা হ'ল ধর্ম,—এ দুয়ের সমন্বয় যে জীবনে তাহাই পরম আদর্শ। নিরভিমান প্রমদাদাসের বেশভূষা দেখিলে তাঁহাকে অতি সাধারণ ভদ্রলোক বলিয়া মনে হইত। গৃহশ্রী-বর্ধনে তাঁহার প্রাসাদে দ্বারবান পরিচারকদের পরিচ্ছদে ওঁকার তকমা শোভা পাইত। কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ফেলো ছিলেন। বার্ধক্যে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতায় পঠন-পাঠনে অসুবিধা বোধ করিতেন এবং সেইজন্য সব সময়ে রৌপ্য-পাত্রে গোলাপ জল কাছেই ঢাকিয়া রাখিতেন। মধ্যে মধ্যে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তাহা দুই চোখে লাগাইতেন। পরিণত বয়সে তিনি সাধনোচিত অমরধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার রচনাতে তিনি ভাবতনু গ্রহণ করিয়া চিরদিন বিরাজ করিবেন।

চারণ কবি বিজয়লালের অপ্রকাশিত পত্র ও কবিতা*

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ

বড় আন্দুলিয়া (নদীয়া)

২১.১.১৯৭৪

প্রিয়বরেষু

অন্তরের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা গ্রহণ করুন। আমার বইগুলি সাহিত্যামোদীর রসাল চিত্তকে তৃপ্তি দিয়াছে—ইহাতে আত্মপ্রসাদের কারণ আছে। বয়সের দিক দিয়া আপনার অনুবর্তী আমি। দেহের দিক দিয়া জরাজীর্ণ। জীবনসন্ধ্যায় ভগ্ন-উরু।

পারিবারিক জীবনে সুখী—এমন কথা বলিলে সত্য বলা হইবে না। ইহা লইয়া মনের সহিত একটা আপোষের চেষ্টায় আছি। দুঃখ তো জগৎ জুড়িয়াই। বিশ্বনিয়ন্তা যিনি, আমাদের প্রত্যেকের পাশেই ক্রশের কাঁটাটি স্বহস্তে বিছাইয়া রাখিয়াছেন। একখানি কাঠের উপর আর একখানি কাঠ। কেবল কাঠগুলি মাপে এক নয়। যত রকমের মানুষ, দুঃখও তত প্রকারের। দুঃখ না থাকিলে আর্ত ভক্তেরা ভগবানের শরণাগত হইবে কেন ? জ্ঞানী ভক্ত আর কয়জন—যিনি ভগবানকে শুধু ভগবানের জন্যই ভালবাসেন ? দেহ জরায় জীর্ণ। দিগন্তে জীবন-সূর্য ডুবু ডুবু ; ষড়্‌গোঁসাই সম্পর্কে আমার একটি লেখা বহুকাল পূর্বে 'উদ্বোধন'-এ বাহির হইয়াছিল। বেতার-ভাষণ হইতে পুনর্মুদ্রিত। 'প্রবাসী' ও 'উদ্বোধনে' কত লেখাই ছড়াইয়া আছে। সেগুলি Edit করিয়া প্রকাশ করিবার মত উদ্যম দেহে মনে নাই। এখন তাঁহাকেই খুঁজিতেছি যাঁহার কখনও পরিবর্তন নাই। আবার পরজন্মে সেই খোঁজ আরম্ভ হইবে। এবারের দৌড় এই পর্যন্ত। আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ভবদীয়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

অবচেতনার কোন্ নেপথ্য হইতে
অতীত উঠিয়া এলো তোমার চিঠিতে
চেতনার দীপালোকে। সগোত্র আত্মার—
তোমারে ভুলিতে পারি সাধ্য কি আমার ?
তোমার লেখায় স্পর্শ পেয়েছি প্রাণের।
পেয়েছি বাণীর দিব্য কমলবনের
সুরভি নিঃশ্বাস বন্ধু ! জীবনসন্ধ্যায়
ভগ্নউরু বিপত্নীক ! সবই ভেসে যায়
কালস্রোতে। খুঁজিতেছি সেই অজানারে
চিরন্তন যিনি মৃত্যু-ঘেরা এ সংসারে !

বড় আন্দুলিয়া
২৭.১০.১৯০৩।

—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

* 'কবির স্বপ্ন'-প্রণেতা ও অধুনা-লুপ্ত 'আরতি'-সম্পাদক, সাহিত্যরত্ন শ্রীরাধাচরণ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অদৃশ্য জগতের রহস্য

ডক্টর সত্যপ্রকাশ দে

প্রথম পর্ব: সন্ধান

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে যে সময়টুকুর ব্যবধান তাহাই জীবন—জীবন দেহকেন্দ্রিক; বিচিত্র এই দেহের কার্যপ্রণালী। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে প্রাণী তাহার দৈনন্দিন জীবন-ধারণের করণীয় কাজগুলি করে—এই সব কর্ম-প্রণালীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা বা পরিচালনা যাহাতে সঠিক-ভাবে হয় তাহার জন্য প্রকৃতিই নির্দেশ ও বিধান দিয়াছে; প্রতি স্তরের প্রাণী তাহার প্রকৃতিগত ভাবের প্রেরণায় আহার বিহার ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়। এইসব স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ দেহ-রক্ষার উপকরণ বা অবলম্বন।

প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব—মানুষ। সে মনোময় পুরুষ; তাহার বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি তাহাকে জীবজগতে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী করিয়াছে। তাই ইহা স্বাভাবিক যে, মানুষ তাহার দেহ সম্বন্ধে অপর জীব অপেক্ষা বহুভাবে অধিক সচেতন। এমন কি আমাদের দেশে 'দেহ'কে 'মন্দির' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—'দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ' ইত্যাদি। আমাদের ইষ্টদেবতা আমাদেরই অন্তরে বিরাজমান। সেই-জন্য প্রাচীন যুগ হইতে দেহকে আমরা পরিষ্কার অথবা পবিত্র রাখিবার জন্য সচেষ্ট এবং দেহের কর্মকারিতা ও স্বাস্থ্য-রক্ষায় আমরা সর্বদা যত্নশীল। দেহে যখনই কার্যপ্রণালী ঠিকমত হয় না অথবা অস্বাভাবিক কোনও লক্ষণ দেখা দেয় তখনই আমরা চিন্তিত হই ও এই অবস্থাকে 'ব্যাধি' নামে অভিহিত করি।

প্রথমতঃ মাতৃগর্ভে ও পরে ভূমিষ্ঠ হইবার পর শরীর ক্রমশঃ বৃদ্ধি, পুষ্টি ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রতি স্তরে শরীরের এই বৃদ্ধি, পুষ্টি ও পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যথেষ্ট সচেতন ও কৌতূহলী ছিলেন এবং বয়সবিশেষের নানা অবস্থায় শারীরিক সমস্যা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। আমাদের বহু প্রাচীন গ্রন্থে স্বাস্থ্য ও শরীর বিষয়ে বহু আলোচনা ও উপদেশের প্রমাণ আছে। শুধু ভারতেই নয়, অপর বহু দেশেও, যথা প্রাচীন মিশর চীন গ্রীস রোম প্রভৃতি দেশেও শারীর-বিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্পর্কীয় তাঁহাদের জ্ঞানের পরিচয় আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। আমাদের প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আমরা শরীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্বপুরুষদের প্রতিভার যথেষ্ট নিদর্শন পাই। সেই সুদূর অতীতে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে এমন বহু ব্যাধির বিবরণ পাই যাহার প্রাদুর্ভাব বর্তমান-কালেও আমরা যথেষ্ট দেখিতে পাই। প্রাচীন মনীষিগণ সেই সকল রোগের বিশ্লেষণে শারীর-বিদ্যার (Anatomy) যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। আধুনিক যুগের বিচারের মানদণ্ডে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত-সমূহ বহুক্ষেত্রে স্থূল ও অপরিণত মনে হইলেও সাধারণভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, বহু তর্ক ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলেই তাঁহারা এইসব তথ্য অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন শব-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা শরীর সম্বন্ধে এইসব তথ্য সংগ্রহ সম্ভবপর হইয়াছিল। ব্যাধি-প্রসঙ্গেও উপসর্গ, চিকিৎসা অথবা তাহার প্রতিষেধ, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাহার কারণ নির্ণয়ে তাঁহাদের মৌলিক চিন্তাধারার স্বাক্ষর আজও বিদ্যমান। বলা বাহুল্য, তখনকার সময়ে বর্তমান সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্র বা বিশ্লেষণ-পদ্ধতির (Analysis) ব্যবস্থা না থাকায় বহু ব্যাধির কারণ সম্পর্কে তাঁহাদের ধারণা বর্তমান দৃষ্টিতে ভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। শরীরের আভ্যন্তরিক বায়ু, পিত্ত,

কফ এই ত্রিধাতুর বৈষম্য বা ত্রিদোষ বহু ক্ষেত্রে রোগের কারণ হিসাবে গণ্য করা হইত। এমন কি গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি আধিদৈবিক কারণে ব্যাধির সৃষ্টি হয়, এই ধারণাও প্রচলিত ছিল। শুধু এই দেশে নয়, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র রোগের সম্বন্ধে এইরূপ নানা অদ্ভুত ধারণা বর্তমান ছিল। পাশ্চাত্যেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানা-প্রকার পারিপার্শ্বিক কারণ, যথা জল, বায়ু বা দূষিত গন্ধ, এমন কি দুষ্ট প্রেতাত্মাকেও ব্যাধির কারণ মনে করা হইত। বর্তমান শারীর-বিদ্যায় বা চিকিৎসাশাস্ত্রে মাত্র দেড়শত বৎসরে নূতন চিন্তাধারার অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন শারীর-বিদ্যা (Anatomy), শারীরিক কর্মসংক্রান্ত জ্ঞান (Physiology) ও রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির ফলে, নূতন ভাবে ভেষজের (Drugs) সন্ধান, আবিষ্কার ও তাহার প্রস্তুত-প্রণালী সম্ভব হওয়ায় ও বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্যক্ দৃষ্টির পরিবর্তনের ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে এক অভিনব অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কিত আবিষ্কারের ফলে রোগের কারণ নির্ণয়ে আমাদের চিন্তা-ধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বে ব্যাধির কারণ হিসাবে যে সব ভ্রান্ত ধারণা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণ নূতনভাবে নূতন ছাঁচে ঢালা সম্ভব হইয়াছে। এই নূতন জগতের সন্ধানে যে অভিযান সেই বিষয়ে এই প্রবন্ধে কিছু বলা হইবে।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হলাণ্ডের অন্তবর্তী ডেল্‌ফট (Delft) নামক স্থানে এনটনি লিউয়েনহুকের (Antony L euwenhcek) জন্ম হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, বিশেষ শিক্ষালাভের সুযোগও লাভ করেন নাই। গাছগাছড়ার ঔষধ ও পুরাতন সামগ্রীর বেচাকেনাই ছিল তাঁহার পেশা, তবে অবসর সময়ে চশমা বা আতস কাঁচ তৈয়ার করা ও নানাভাবে ক্ষুদ্রাকারে কাঁচ প্রস্তুত-প্রণালী উদ্ভাবনে কৌতূহলী ছিলেন এবং পরে একটি নলের ভিতর নানাভাবে সাজাইয়া ছোট আকারের জিনিস কতো বড়ো করিয়া দেখা সম্ভব সেই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেন। ফুল পাতা কীট পতঙ্গ ধূলিকণা যাহা পাইতেন তাঁহার এই অভিনব যন্ত্রের তলায় রাখিয়া দেখিতেন। এই ভাবে কৌতূহলী লিউয়েনহুক একদিন এক ফোঁটা বৃষ্টির জল তাঁহার এই যন্ত্রে দেখিতে গিয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র জীবজাতীয় বস্তুর সন্ধান পান। নানা স্থান হইতে এইভাবে জল সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে নানাবিধ এইরূপ প্রাণী দেখিয়া প্রতিবেশী সকলকে বলিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে তিনি ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটিকে তাঁহার এই আবিষ্কারের কথা জানাইলেন। সুখের কথা, ইংলণ্ডের এই পরিষদ্ তাঁহার এই অভিনব যন্ত্র ও অভিনব প্রাণী সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি পাঠান এবং সেই ব্যক্তির নিকট সবিশেষ বিবরণ পাইয়া যন্ত্রটির সম্বন্ধে প্রশংসা করেন। এনটনি লিউ-য়েনহুকের এই যন্ত্রটি আমাদের প্রথম অনুবীক্ষণ যন্ত্র এবং ইহার সহায়তায় লিউয়েনহুকের এই অতি ক্ষুদ্র জীবজাতির আবিষ্কারে এই নূতন প্রাণিবিশেষের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়। বস্তুতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে এই অদৃশ্য জগতের অভিযান সুরু হয়। লিউয়েনহুকের মৃত্যু হয় ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর অন্তর্গত স্কানডিয়ানো (Scandiano) নামক স্থানে স্পালানজানির (Spallanzani) জন্ম হয়। পরবর্তী কালে ইনি লিউয়েনহুকের আবিষ্কারের সূত্র ধরিয়া নূতনভাবে গবেষণা আরম্ভ করেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, রয়াল সোসাইটির সমর্থন লাভ করিলেও লিউয়েনহুকের আবিষ্কারের বিপক্ষেও বহু মতামতের প্রচলন ছিল—বিশেষতঃ,

ইংলণ্ডে নিডহাম (Needham) নামক এক পাদ্রী ও পরে ফরাসী দেশের পণ্ডিত বুফোঁ (Buffon) প্রচার করেন যে লিউয়েনহুক অণুবীক্ষণের সাহায্যে যাহাদের দেখিয়াছিলেন তাহাদের প্রকৃতপক্ষে প্রাণিবিশেষ বলা যায় না – কোনও নিভৃত শক্তির (Vegetative forces) ফলে তাহাদের উদ্ভব ; জীবের ধর্ম প্রজনন ; এই জীববিশেষের জন্ম-তথ্য প্রমাণিত হয় নাই। স্পালানজানি এই মতবাদ খণ্ডন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন এবং বহু অভিনব প্রণালীতে গবেষণা করিয়া প্রচার করেন জীবাণু হইতেই জীবাণুর জন্ম। লিউয়েনহুকের সমর্থনে স্পালানজানির এই মন্তব্য পণ্ডিতমহলে সাদরে গৃহীত হয়। ফলে জীবাণুর অস্তিত্ব সকলেরই স্বীকৃতি লাভ করিল। স্পালানজানির মৃত্যু হয় ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় অর্ধশতাব্দী বিচিত্র এই প্রাণিজগৎ সম্পর্কে নূতন কোনও অনুসন্ধানের প্রমাণ আমরা পাইনা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী দেশে লুই পাস্তর (Louise Pasteur আবার অণুবীক্ষণের সাহায্যে গবেষণায় আগ্রহী হন। পাস্তর প্রকৃতপক্ষে রাসায়নিক পণ্ডিত ছিলেন, তাই শিল্পের সমস্যায় তাঁহাকে গবেষণা করিতে হইত। মদের শিল্পে ও রেশমের চাষে বিপর্যয় উপস্থিত হইলে তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার ফলে কীটাণু ও জীবাণুর সন্ধান পান এবং এই প্রমাণের ভিত্তিতে নূতনভাবে চিন্তা করিয়া এই দুইটি শিল্পকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হন। গৃহপালিত পশু ও পক্ষীর কয়েক প্রকার রোগের সমস্যায়ও তিনি এইভাবে পরীক্ষার ফলে সেই সব রোগের কারণ নির্ণয়ে জীবাণুকে দায়ী করেন এবং নূতন প্রথায় পশু ও পক্ষীগুলির শরীরে সেই জীবাণু হইতে তৈয়ার করা বিশেষ টিকা দ্বারা রোগদমনে সফলতা অর্জন করেন। এইভাবে প্রতিষেধক টিকার প্রবর্তনে এইসব রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পায়। পশু, পক্ষীর চিকিৎসা-প্রণালীতে এইভাবে উৎসাহিত হইয়া পাস্তর ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের ফলে যে জলাতঙ্ক রোগ (Hydrophobia) হয় তাহারও প্রতিষেধক টিকার প্রবর্তন করেন। বর্তমান কালে পাস্তরের প্রবর্তিত এই প্রতিষেধক টিকার ব্যবহার সর্বত্র হয়। প্রতিষেধক টিকার প্রচলন পাস্তরের বিশেষ অবদান। যদিও ইতিপূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এডওয়ার্ড জেনার (Edward Jenner) প্রতিষেধক বসন্তের টিকার প্রবর্তন করেন, তিনি কোনও বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এই টিকা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। মাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে প্রকৃতির এক নিহিত সত্য-তথ্যের বিশ্লেষণের ফলে তাঁহার পক্ষে এইরূপ টিকা তৈয়ার করা সম্ভব হইয়াছিল। পাস্তরের গবেষণায় টিকার মূল কার্যকারিতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিচার ও তাহা তৈয়ার করার প্রণালী সম্পর্কেও বৈজ্ঞানিক প্রথার অবলম্বন, জীবাণুর ক্ষতিকর শক্তি হ্রাস করিয়া শুধুমাত্র তাহার প্রতি-ষেধক শক্তির ব্যবহার ইত্যাদির ফলে পাস্তরের বৈজ্ঞানিক সূত্রে এই সফলতা লাভ হয়। সেই প্রথানুযায়ী পরবর্তী কালে অন্যান্য বহু ব্যাধির প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুত ও প্রচলন করা সম্ভব হইয়াছে।

পাস্তরের জীবদ্দশায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মানীতে রবার্ট কক্ (Robert Koch) নামক এক চিকিৎসা-শাস্ত্রের স্নাতক তাঁহার দৈনন্দিন কাজের অবসরে অণুবীক্ষণের সাহায্যে ব্যাধির জীবাণুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। কক্ পাস্তরের ন্যায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে অধিকাংশ ব্যাধির কারণ জীবাণু—জীবাণুকে না জানিলে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা সম্ভব নহে। সেইসব জীবাণু আবিষ্কার তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

পাস্তরের ন্যায় কক্‌ও নানাভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কার করেন ও দেহের বাহিরে জীবাণু-গুলিকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে লালন করিবার পদ্ধতি ও নূতনভাবে জিলেটিনের (gelatine) সাহায্যে জমাট আহার্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়া নানাভাবে এই বিজ্ঞানের গবেষণার সহায়তা করেন। সারা জীবন বার্লিনে গবেষণা-গারে ও মহামারীর সময় সেই সব স্থানে নিজে যাইয়া তথ্য সংগ্রহ করিতেন। তিনি বিসূচিকা (Cholera) রোগের জীবাণু আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে মিশরে ও কলিকাতায়ও আসিয়াছিলেন এবং তিনিই প্রথম এই ব্যাধির জীবাণু আবিষ্কার করেন। বিসূচিকা জীবাণু ব্যতীত তিনি এন্‌থ্রাক্স (Anthrax) নামক রোগ ও যক্ষ্মার (Tuberculosis) জীবাণুও প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনিও পাস্তরের প্রথায় প্রস্তুত প্রতি-ষেধক টিকা দেওয়া সমর্থন করিতেন ও কয়েক-ক্ষেত্রে টিকা প্রস্তুত করিয়া ব্যাধির চিকিৎসা ও প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। লুই পাস্তর ও রবার্ট কক্‌ উভয়ে জীবদ্দশায় পণ্ডিত সমাজের স্বীকৃতি ও রাজকীয় সম্মান লাভ করেন।

প্যারিসে পাস্তরের গবেষণাগারে থুলিয়ো (Thullier), রুক্স (Roux) চেম্বারলেণ্ড (Chamberland), কালমেত (Calmette) প্রভৃতি ও বার্লিনে রবার্ট ককের গবেষণাগারে লুফলার (Loeffler), গ্যাফকি (Gaffky), পাইফার (Pfeiffer), কিটাসাটো (Kitasato), ওয়েলশি (Welchi) প্রভৃতি গবেষণা করিতেন। তাঁহাদের নিজ নিজ গবেষণার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বহু ব্যাধির জীবাণুর আবিষ্কার হয় এবং তাঁহাদের গুরুর ন্যায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁহারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ লুই পাস্তর ও রবার্ট কক্‌ জীবাণুতত্ত্বের প্রবর্তক নহেন। তাঁহারা এই বিজ্ঞানের শাখার দুই শ্রেষ্ঠ আচার্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই অবদানের ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নূতন চিন্তা-ধারার প্রবর্তন হয় ও প্রায় অধিকাংশ ব্যাধির, বিশেষতঃ সংক্রামক ব্যাধির কারণ-স্বরূপ নানা প্রকার নূতন জীবাণু ও কীটাণুর আবিষ্কার সম্ভব হয়। জীবাণু অপেক্ষা আরো ক্ষুদ্র আকারের প্রাণী অণুজীবাণু আবিষ্কারের ফলে ইহাদের সম্বন্ধেও এই সময়ে বহু গবেষণা আরম্ভ হয় ও এই অতি ক্ষুদ্র অণুজীবাণুঘটিত বহু ব্যাধির সন্ধানও সম্ভব হয়। এই বিশাল অদৃশ্য জগতের বিচিত্র অধিবাসী অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতম প্রাণীর সন্ধান ও তাহাদের শক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হই। সংক্ষেপে কয়েকটি ব্যাধি, তাহাদের জীবাণুর আবিষ্কারের বর্ষ ও আবিষ্কারকের নামের তালিকা নীচে দেওয়া হইল :

খ্রীষ্টাব্দ	আবিষ্কারকের নাম	রোগের জীবাণু
১৮৭৪	হানসেন (Hansen)	কুষ্ঠব্যাধি
১৮৭৯	নাইসার (Neisser)	গনোরিয়া
১৮৮০	এবার্থ (Eberth)	টাইফয়েড
১৮৮১	অগষ্টোন (Ogston)	ফোড়া ইত্যাদি
১৮৮২	রবার্ট কক্‌ (Robert Koch)	যক্ষ্মা
১৮৮৩	রবার্ট কক্‌ (")	কলেরা
১৮৮৩	ফেহ্‌লাইসেন (Fehleisen)	রক্ত দূষিত করণ প্রদাহ ইত্যাদি
১৮৮৩/৮৪	ক্লেবস্‌ ও লুফলার (Klebs & Loeffler)	ডিপথিরিয়া

১৮৮৪	গ্যাফকি (Gaffky)	টাইফয়েড, কোলাই জ্বর
১৮৮৭	ফ্রেনকেল (Fraenkel)	নিউমোনিয়া
১৮৮৭	ওয়াইশেলবাউম (Weish-elbaum)	মেনিনজাইটিস্
১৮৮৯	কিটাসাটো (Kitasato)	ধনুষ্টঙ্কার
১৮৯২	ফাইফার (Pfeiffer)	ইনফ্লুয়েনজা
১৮৯৪	কিটাসাটো (Kitasato) ও ইয়ারসিন (Yarsin)	প্লেগ
১৮৯৮	শিগা (Shiga)	রক্ত আমাশয়

বস্তুতঃ উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে প্রায় অধিকাংশ মারাত্মক ও সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু আবিষ্কৃত হয়।

ক্রমে এইভাবে অনুসন্ধানের ফলে জীবাণু ব্যতীত অন্য যে সব অতিক্ষুদ্র প্রাণী বিশেষের পরিচয় সম্ভব হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অণুজীবাণুর (Virus) কথা বলা হইয়াছে। ইহার সহিত বলিতে হয় রোগের কারণ নির্ণয়ের প্রয়াসে উহাদের কারণ হিসাবে নানা জাতীয় কীট (Helminths, worms) কীটাণু (Protozoa) ও ছত্রাকেরও (Moulds, fungus) সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। শুধু চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এইসব গবেষণার ফল নিবদ্ধ ছিল না—অপর বহু অতিক্ষুদ্র প্রাণী অথবা জীবাণু অন্যান্যভাবে আমাদের কিভাবে সাহায্য করে তাহা জানাও সম্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ শিল্পের নানা প্রক্রিয়ার সহায়ক ও জমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারেও এইসব ভিন্ন প্রকৃতির জীবাণুদের অবদানও স্বীকার করিতে হয়। অণুজীবাণু সম্বন্ধে বলা হইলেও সাধারণ গবেষণাগারের অণুবীক্ষণের সাহায্যে ইহাদের দেখা সম্ভব নহে। বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি হওয়ায় বৈদ্যুতিক অণুবীক্ষণ (Electron microscope) প্রস্তুত হইয়াছে। এই অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে অণুজীবাণুর ছায়াচিত্র গ্রহণ সম্ভব ও সেই ছবির সাহায্যে তাহাদের সম্পর্কে সবিশেষ বিবরণ পাওয়া সম্ভব হইয়াছে।

ফরাসী দেশে পাস্তুর যখন জীবাণু ও ব্যাধি সংক্রান্ত ব্যাপারে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপিত করেন তখন ইংলণ্ডে শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নূতন প্রথার অবতারণা করেন বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক লিসটার (Lister)। ইতিপূর্বে বহু ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের কয়েকদিনের মধ্যে অনেক রোগীর রক্ত বিষাক্ত (Septicæmia) হইয়া অথবা ক্ষতস্থান বিষাক্ত (Gangrene) হওয়ায় পচন ঘটায় তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইত, ইহার সঠিক কারণ সম্পর্কে চিকিৎসকদের কোনও ধারণাই ছিল না। লিসটার পাস্তুরের সমসাময়িক, তাঁহার সহিত পরিচয় ছিল ও গুণগ্রাহী হিসাবে পাস্তুরের গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলেন। জীবাণু ও মানুষের ব্যাধির ব্যাপারে জীবাণুর ভূমিকার বিষয়ে অবগত হইয়া তিনি এই সূত্র ধরিয়া অস্ত্রোপচারের পদ্ধতির কিছু রদবদলের ব্যবস্থা করেন, বিশেষতঃ সর্বপ্রকারের অস্ত্রোপচারের সময় ব্যবহারের যন্ত্রাদি শোধন বা জীবাণু-মুক্ত করিবার ব্যবস্থা এবং অস্ত্রোপচারকালীন ও পরবর্তী সময়ে সর্বপ্রকারে জীবাণুর আক্রমণের প্রতিরোধের চেষ্টায় অথবা তাহাদের ধ্বংস করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া লিসটার অপ্রত্যাশিতভাবে সফল হইলেন। পূর্বের বিভীষিকা নির্মূল হইল।

মৃত্যুহারও যথেষ্ট হ্রাস পাইল। শল্য-বিজ্ঞানে এইভাবে জীবাণুমুক্ত অস্ত্রোপচারের (Antiseptic Surgery) প্রবর্তন হইল।

উনবিংশ শতাব্দীর এই অদৃশ্য জগতের রহস্যের আবিষ্কারের ফলে এবং পরবর্তী কালে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির বহুমুখী অগ্রগতির ফলে বর্তমানে ব্যাধির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া সেই অনুসারে ব্যাধিসমূহকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

(১) বহিরাগত কীটাণু (Protozoa), জীবাণু (Bacteria) অথবা অণুজীবাণু (Virus) শরীরে প্রবেশের ফলে নানারূপ রোগ বা সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ অথবা বিশেষ কোনও অঙ্গ আক্রান্ত হওয়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়—শরীরের তাপবৃদ্ধি সাধারণ লক্ষণ। যথা—জীবাণুঘটিত রোগ—টাইফয়েড, রক্তামাশয়, নিউমোনিয়া, বিসূচিকা প্রভৃতি ; অণুজীবাণু ঘটিত রোগ—বসন্ত, পোলিও, কর্ণমূলপ্রদাহ (Mumps) ইত্যাদি।

(২) কীটজাতীয় (Helminths, worms) জীবের আক্রমণের ও শরীরের অন্ত্রের ভিতর প্রবেশের ফলে নানারকমের উপসর্গের সৃষ্টি হইতে পারে। সাধারণতঃ মলের সংখ্যা বৃদ্ধি, গঠনের পরিবর্তন ও তাহার সহিত শ্লেষ্মা (Mucus) এবং ফলে শরীরের পুষ্টিসাধনে ব্যাঘাত হওয়ায় রক্তাল্পতা দেখা যায়। যথা—কৃমিজাতীয় কীট, হুকপোকা, ফিতা-পোকার আক্রমণ ইত্যাদি।

(৩) শরীরের কোনও বিশেষ আভ্যন্তরিক অঙ্গ বা যন্ত্র বিশেষের (Organ) অথবা কলার (Tissue) উপাদানের গঠন বা কার্যকারিতার গোলযোগ নানাবিধ উপসর্গ সৃষ্টি করিতে পারে—পরিপাকশক্তির হ্রাস অথবা শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, হাঁপানি ইত্যাদি। যথা—পাকস্থলী, যকৃত, হৃদযন্ত্র প্রভৃতি আভ্যন্তরিক অঙ্গের ব্যাধি।

(৪) শরীরের আভ্যন্তরিক কোন নালীবিহীন গ্রন্থির (Endocrine gland) নিঃসৃত রসের অথবা কর্মের গোলযোগ বা কোনও ভাবে গঠনের অস্বাভাবিক পরিবর্তন হওয়ার ফলে উদ্ভূত উপসর্গ। যথা—প্যানক্রিয়াস গ্রন্থির পরিবর্তনে বহুমূত্র ব্যাধি, থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যে বিশৃঙ্খলায় গলগণ্ড (Goitre) ব্যাধি।

(৫) দুর্জয় ব্যাধি (Malignant disease)। যখন শরীরের কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোষবিশেষ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় অথবা বিকল্পভাবে কাজ করিতে থাকে তখন শরীরে নানারূপ ক্রিয়ার জটিলতা বা বিকৃতি দেখা যায় এবং দেহের মধ্যে নানারকমের বিকল্প প্রতিক্রিয়ার ফলে স্বাস্থ্যহানি ও মৃত্যু হইতে পারে। যথা—কর্কট রোগ (Cancer), রক্তের শ্বেতকণিকা, অস্থিমজ্জার অথবা লসিকা গ্রন্থির (Lymph gland) অস্বাভাবিক কোষবৃদ্ধির রোগ (Leukaemia, Hodgkin's disease) ইত্যাদি।

(৬) খাদ্যবিশেষের অভাবে অপুষ্টিজনিত ব্যাধি। খাদ্যের নানা উপাদান : আমিষ পদার্থ (Protein), শর্করাজাতীয় পদার্থ (Carbohydrate), স্নেহ অথবা চর্বি ও তৈল জাতীয় পদার্থ (Fats, Oils), খনিজ বা লবণ জাতীয় পদার্থ (Salts, Minerals) ও পরিশেষে ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ (Vitamins)। শরীরের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে এই সকল বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে কোনও একটির অভাবে নানারূপ জটিল উপসর্গের সৃষ্টি হইতে পারে এবং বহু ক্ষেত্রে ইহার ফলে অন্য ব্যাধির আক্রমণও সম্ভব হয়। আমিষ খাদ্যের অভাবে শরীরের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্যের অভাবে কর্মশক্তির ও শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপের (Calories) হ্রাস, খনিজ পদার্থ ও কোনও খাদ্যপ্রাণের অভাবে নানা রকমের উপসর্গ, যথা—রক্তাল্পতা প্রভৃতি

(Anaemia, Scurvy, Keratomalacia ইত্যাদি)।

কোন কোন ব্যাধি বয়স বিশেষে বেশী কম দেখা যায়—প্রধানতঃ দুর্জয় রোগ, বহুমূত্র, হৃদ্‌-যন্ত্রের ও রক্তনালীর গোলযোগঘটিত রক্তচাপ-বৃদ্ধি রোগ প্রভৃতি প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সের ব্যাধি। অপুষ্টিজনিত অথবা খাদ্যপ্রাণের অভাবের উপসর্গ শৈশবেই অধিক দেখা যায়। যদিও সাধারণভাবে ব্যাধিগুলিকে ছয়টি শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ জীবাণু অণুজীবাণু, কীটাণু ও কীটের আক্রমণের ফলে উদ্ভূত ব্যাধির হারই শতকরা সত্তর বা আশি। বিশেষতঃ সংক্রামক ও মহামারীর রোগগুলির প্রায় সকলেই এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। অথচ মাত্র কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পূর্বেও এই অদৃশ্য-জগতের প্রাণী সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। [ক্রমশঃ]

শঙ্কর-বন্দনা

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

[গান : ভৈরব, একতাল]

ভারত-গগনে জ্ঞানভাস্কর কে তুমি চীরধারী।
ফুল্ল-আনন রাজীব-লোচন মুনিগণ-মনোহারী॥
বিবেক উজ্জ্বল প্রেম ঢল ঢল
বিষয়-বিরাগী চিত্ত কোমল
বিগত সংশয় হত রিপু ছয় তুমি কি গো ত্রিপুরারি॥
ধর্মের যবে বন্ধন দশা কর্মের নাগপাশে
অমিত বীর্য! জ্ঞান অসি নিয়ে মুক্ত করিলে এসে।
শুনি তব বেদ হুঙ্কার
জনম মরণ ঘুচে সবাকার
শঙ্কর মম শঙ্কা হরণ কর মোহ অপসারি॥

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

(৩) প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মমতের মধ্যে ঢাকা পড়ে আছে দুর্লভ রত্ন। নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান সংস্কার বিশ্বাসের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, শাস্ত্র-শরিয়ৎ, মন্দির-মসজিদ, অবতার-পয়গম্বর, পুরোহিত-মোল্লা প্রভৃতির দ্বারা সুরক্ষিত সেই দুর্লভ রত্ন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। বিভিন্ন ধর্মমতের রত্নপেটিকার মধ্যে লুকানো রত্নের দিকে দৃষ্টি দিতে পারলেই বিরোধ-বিদ্বেষ হ্রাসের সম্ভাবনা। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির সযত্নে সুরক্ষিত রত্নভাণ্ডার অনুসন্ধান ক'রে তিনটি প্রধান সূত্র পাওয়া যায়; সেগুলির সাহায্যে ধর্মমতগুলির বৈষম্য দূর করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ধর্মগ্রন্থ ও সাধকদের জীবন ও বাণী থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সকল ধর্মের উপাস্যের মধ্যে রয়েছে একত্ব। তত্ত্ব বা সত্য একই—বিভিন্ন তার নাম। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'ঈশ্বর এক কিন্তু ভাবে বহু। মাছ এক কিন্তু ঝালে, ঝোলে, অম্বলে প্রভৃতি নানা রকমে যেমন তাকে আস্বাদ করা যায়; সেই রকম ভগবান এক হইলেও সাধকগণ তাঁকে বিভিন্ন রকমে উপভোগ ক'রে থাকেন।'[২৬] যে নামেই ডাকা যাক্ আন্তরিক হলে ভগবান শোনেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'তিনি যে অন্তর্যামী, অন্তরের টান ব্যাকুলতা দেখতে পান। মনে কর এক বাপের অনেকগুলি ছেলে; বড় ছেলেরা কেউ বাবা, কেউ পাপা এই সব স্পষ্ট বলে তাঁকে ডাকে। আবার অতি শিশু ছোট ছেলে হদ্দ 'বা' কি 'পা' এই বলে ডাকে। যারা 'বা' কি 'পা' পর্যন্ত বলতে পারে বাবা কি তাদের উপর রাগ করবেন? বাবা জানেন যে ওরা আমাকেই ডাকছে, তবে ভাল উচ্চারণ করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।'[২৭]

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ধর্মে উপাস্যকে লাভ করার জন্য যে সকল পথ নির্দিষ্ট হয়েছে তাদের মধ্যে অনৈক্যের নিষেধ। পথ অনেক, কিন্তু পথ-বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে ঐক্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'এই কালীবাড়ীতে আসতে হলে কেউ নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ-বা হেঁটে আসে। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। নদী সব নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক। সকল ধর্মই সত্য।'[২৮] এর সঙ্গে তুলনীয় পুষ্পদন্তের উক্তি: 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং, নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব'। কোন কোন উন্নাসিক ধর্মসেবী বলেন, মত পথের এই যে ঐক্য এটা আংশিক সত্য। তাঁরা বলেন, নানান পথ দিয়ে কালীবাড়ী পৌঁছান যায় বটে, কিন্তু প্রাঙ্গণের ফটক থেকে মন্দিরে যাবার একটিই পথ। যেমন ভক্তি কর্ম যোগ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে অগ্রসর হলেও সাধক একমাত্র জীবব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকারের দ্বারা ভববন্ধন হতে মুক্তি লাভ করতে পারে।

---

২৬ সুরেশচন্দ্র দত্ত: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, নং ৬০৫

২৭ কথামৃত, ৫।২।১

২৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, (পঞ্চম সংস্করণ), পৃঃ ৪৮০-৮১

তৃতীয়তঃ প্রকৃত ধর্ম একটিই। ধর্মবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন একই ধর্ম নানান ধর্মমতের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'দেশ-কাল-পাত্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন।'[২৯] স্বামী বিবেকানন্দও বলেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট শিখে-ছিলেন, 'জগতের ধর্মসমূহ পরস্পর-বিরোধী নহে। এগুলি এক সনাতন ধর্মেরই বিভিন্ন ভাবমাত্র। এক সনাতন ধর্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আর এই ধর্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইতেছে।'[৩০] সুতরাং ধর্মে ধর্মে যে বিভেদ এটা বাহ্যিক, প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের মধ্যে রয়েছে একটি আন্তর ঐক্য।

ধর্ম একটিই। আমার ধর্মই অপর সকলের ধর্মের আকারে বিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়েছে। সকল ধর্মই আমার ধর্মের রূপভেদমাত্র, এই দৃষ্টিতে স্বধর্মানুষ্ঠান করলেও ধর্মের বিরোধ শান্ত হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন, 'আপন ইষ্টমূর্তির উপর বিশেষ নিষ্ঠা রাখিবে, কিন্তু অন্যান্য মূর্তিও সেই ইষ্টমূর্তির ভিন্ন রূপ ভাবিবে ও শ্রদ্ধা করিবে। দ্বেষভাব সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।'[৩১]

উপাস্য দেবতাসকলের বিচিত্র নাম রূপ উপাধির মধ্যে এক অদ্বিতীয় পরমদেবতা বিরাজ-মান, উপাসনা-আরাধনার বিভিন্ন ধারা একই উদ্দেশ্যমুখীন, বিভিন্ন পুরাণ আখ্যায়িকা একই পরম সত্যের মহিমা খ্যাপন করছে ইত্যাদি ধারণা পরধর্মসহিষ্ণুতা, অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা সহানুভূতি ও উদারতা শিক্ষা দেয়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় একই মূল ভাবকে প্রকাশ করেছে। শ্রীশ্রীমা তাঁর অনন্যু-করণীয় ভাষায় বলেছেন, 'ব্রহ্ম সকল বস্তুতে আছেন। তবে কি জান? সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জন এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা কালো লাল নানা রকমের পাখী এসে বসে হরেক রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলগুলিকেই আমরা পাখীর বোল বলি—একটিই পাখীর বোল আর অন্যগুলি পাখীর বোল নয়—এরূপ বলি না।'[৩২] এইভাবে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে সুসামঞ্জস্য ঐক্য সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেও ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিদ্বেষ যেন দূর হতে চায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের উদাহরণটা ধরা যাক্। তিনি বলতেন, "একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে; হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্ছে কলসী করে, বলছে 'জল'। মুসলমানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে চামড়ার ডোলে করে—তারা বলছে 'পানী'। খ্রীষ্টানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে—তারা বলছে 'ওয়াটার'। যদি কেউ বলে, 'না এ জিনিষটা জল নয়, পানী; কি পানী নয়, ওয়াটার; কি ওয়াটার নয়, জল' তাহলে হাসির কথা হয়।"[৩৩] হাসির কথা হলেও দীর্ঘ-কালের কুসংস্কার যেতে চায় না, বিদ্বেষের বীজ সহজে মরে না। ফলে ভুলক্রমেও যদি মুসলমান হিন্দুর ঘাটে নামে বা খ্রীষ্টান হিন্দুর জলের কলসী ছুঁয়ে ফেলে ধর্মধ্বজীদের ঝগড়া সুরু হয়ে যায়।

সাম্প্রদায়িক ধর্মমতগুলি প্রাতিষ্ঠানিক রীতি-নীতি-কৌশলে মানুষকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে বেঁধে রাখে। সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনায় মানুষ নীচতা ক্রূরতা উন্মত্ততা প্রভৃতির বিষবাষ্প উদ্গীরণ করে। সর্ব-নাশা বিষবাষ্প হতে সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে হলে শুধু বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ঐক্য অনুসন্ধান, বা উদারতা ও পরধর্মসহিষ্ণুতার উপদেশ

২৯ কথামৃত, ২।১৫।১
৩০ বাণী ও রচনা ১ম সং, ৮।৪০২
৩১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, নং ৬২৬
৩২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১০ম সং, পৃঃ ৪৭
৩৩ কথামৃত, ২।১৩।৩

সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। পরমত-সহিষ্ণুতাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন পরমতকে আত্মীয়-বোধে দেখা, প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া। স্বামী বিবেকানন্দ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "Not only toleration, for so-called toleration is often blasphemy, and I do not believe in it. I believe in acceptance. Why should I tolerate? Toleration means that I think that you are wrong and I am just allowing you to live. Is it not a blashphemy to think that you and I are allowing others to live? I accept all religions that were in the past and worship with them all."[৩৪]

(৪) শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মমতের সোপান দিয়ে তত্ত্বানুভূতির শীর্ষে আরোহণ করে বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে দেন। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নির্যাস তুলে ধরেন সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে, 'সকলেই আপনার জমি প্রাচীর দিয়া ভাগ করিয়া লয়; কিন্তু আকাশকে কেহ খণ্ড খণ্ড করিতে পারে না। এক অখণ্ড আকাশ সকলের উপর বিরাজ করিতেছে। মনুষ্য অজ্ঞানে আপনার ধর্মকে সত্য ও শ্রেষ্ঠ বলে, জ্ঞান হইলে সকল ধর্মেব উপর এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে বিরাজিত দেখে।'[৩৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ যে সর্বধর্মসমন্বয়ের সাধনা করেছিলেন তার দুটি বৈশিষ্ট্য: প্রথমতঃ তিনি দেখেছিলেন, 'যারা ঈশ্বরানুরাগী – কেবল সাধন ভজন নিয়ে থাকে, তাদের ভিতর কোন দলাদলি থাকে না। যেমন পুষ্করিণী বা গেড়ে ডোবায় দল জন্মায়, নদীতে কখনও জন্মায় না।' 'যতক্ষণ ঈশ্বর থেকে দূরে ততক্ষণ বিচার কোলাহল। তাঁর কাছে গেলে তিনি কি স্পষ্ট বুঝতে পারবে।'[৩৬] তিনি বুঝেছিলেন দর্শনতত্ত্বের কোলাহল, স্মৃতিশাস্ত্রের বাক্‌নৈপুণ্য, পুরাণকাহিনীর মনোহারিত্ব বা অনুষ্ঠানের আড়ম্বর—এসকলের মধ্যে ধর্মসমন্বয়ের সূত্র পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন ধর্মের যথার্থ সামঞ্জস্য হতে পারে একমাত্র তত্ত্বানুভূতির পর্যায়ে। স্বামী বিবেকানন্দ একটি উপমার সাহায্যে বলেছেন, 'যদি ইহাই সত্য হয় যে, ভগবানই সকল ধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ এবং আমরা প্রত্যেকেই যেন একটি বৃত্তের বিভিন্ন ব্যাসার্ধ ধরিয়া সেই কেন্দ্রেরই দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা হইলে আমরা সকলে নিশ্চয়ই কেন্দ্রে পৌঁছিব এবং যে-কেন্দ্রে সকল ব্যাসার্ধ মিলিত হয়, সেই কেন্দ্রে পৌঁছিয়া আমাদের সকল বৈষম্য তিরোহিত হইবে। কিন্তু যে পর্যন্ত না সেখানে পৌঁছাই, সে পর্যন্ত বৈষম্য অবশ্যই থাকিবে।"[৩৭] শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়-সাধনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, 'ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) যেমন প্রত্যেক মতের কিছুমাত্র ত্যাগ না করিয়া সমান অনুরাগে নিজ জীবনে উহাদের প্রত্যেকের সাধনা করিয়া তত্তৎমত-নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়া ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে ভাবে পূর্বের কোন আচার্যই ঐ সত্য উপলব্ধি করেন নাই।'[৩৮] শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সাধনপথ ধরে লক্ষ্যে পৌঁছে সাধ্যবস্তুর ঐক্য আবিষ্কার করেছিলেন; সেইসঙ্গে বিভিন্ন সাধনপথ অনুসরণ করে তাদের উপযোগিতা

---

৩৪ Swami Vidyatmananda (Ed.): What Religion is in the words of Swami Vivekananda, First Indian Ed. (1972), p 24

৩৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, নং ২৭৪

৩৬ শশীভূষণ ঘোষ: শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৩৬১

৩৭ বাণী ও রচনা, ৩।১৮০

৩৮ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, পৃঃ ২০০-০১

প্রমাণ করেছিলেন। তিনিই বিভিন্ন ধর্মমতের যথার্থ মর্যাদা দান করেছিলেন। এইভাবে 'যোগ-বুদ্ধি ও সাধারণবুদ্ধি' উভয়-সহায়েই শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত করেছিলেন, 'সর্ব ধর্ম সত্য—যত মত, তত পথ মাত্র।'[৩৯] তিনি যুক্তি বিচার ও তত্ত্বানুভূতির মিলিত আলোকে সর্বধর্মসমন্বয়ের অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, সাধারণ মানুষ যারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আওতায় বাস করছে এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে দ্বেষ-বিদ্বেষে মেতে উঠছে তাদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সমন্বয়-সূত্র কি ভাবে প্রযোজ্য? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে স্বধর্মানুষ্ঠান করা। স্বধর্মানুষ্ঠান করেও কি ভাবে অপর সকল ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করা সম্ভব সে সম্বন্ধে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলতেন, 'ও কি হীন বুদ্ধি তোর? জানবি যে তোর ইষ্টই কালী, কৃষ্ণ, গৌর সব হয়েছেন। তা বলে কি নিজের ইষ্ট ছেড়ে তোকে গৌর ভজতে বলছি, তা নয়। তবে দ্বেষবুদ্ধিটা ত্যাগ করবি। তোর ইষ্টই কৃষ্ণ হয়েছেন, গৌর হয়েছেন—এই জ্ঞানটা ভিতরে ঠিক রাখবি। দেখ না, গেরস্তের বৌ শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেওর, ভাসুর সকলকে যথাযোগ্য মান্য ভক্তি ও সেবা করে—কিন্তু মনের সকল কথা খুলে বলা আর শোয়া কেবল এক স্বামীর সঙ্গেই করে। সে জানে যে, স্বামীর জন্যই শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি তার আপনার। সেই রকম নিজের ইষ্টকে ঐ স্বামীর মতন জানবি। আর তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হতেই তাঁর অন্য সকল রূপের সহিত সম্বন্ধ, তাঁদের সব শ্রদ্ধা ভক্তি করা—এইটে জানবি। ঐরূপ জেনে দ্বেষবুদ্ধিটা তাড়িয়ে দিবি।'[৪০] ইষ্টনিষ্ঠা তথা স্বধর্মনিষ্ঠায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সম্প্রীতি রেখে বসবাস করতে হবে। সহৃদয় আচরণের মধ্য দিয়ে অপর ধর্মের মানুষকে আত্মীয়-ভাবে গ্রহণ করতে হবে। সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে বৃহৎ এক ধর্মপরিবার—এই বোধে সক্রিয় সহাবস্থান ও সহৃদয় লেনদেনের মধ্য দিয়ে ধর্ম-সমন্বয়ের চর্চা করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিদ্বেষ-ভাব আর রাখবে না। 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খৃষ্টান' এই বলে নাক সিঁটকে ঘৃণা করো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে—যতদূর পার। আর ভালবাসবে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দ ভোগ করবে। 'জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না'।"[৪১] অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, অপর ধর্মাবলম্বীদের প্রতি প্রীতি সহানুভূতিই ধর্মসমন্বয়-চর্চার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে বিভিন্ন ধর্মগুলি একটি অপরটির সম্পূরক, একটি অপরটির বিরোধী নয়। এই ভাবটি ধরে 'প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগ-গুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ধিত হইবে।'[৪২] স্বধর্মনিষ্ঠার গভীরতা ঐকান্তি-কতার সঙ্গে পরধর্মসেবীদের প্রতি প্রীতি ভালবাসার সার্থক সমবায়ের উপর ধর্মসমন্বয়ের সাফল্য নির্ভর করছে।

ধর্মের প্রাণ প্রত্যক্ষানুভূতি এবং বোধে বোধ অর্থাৎ তত্ত্বানুভূতিই শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সমন্বয়-সৌধের ছাদ—নানা মতের সাধনা সেই সৌধের

৩৯ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ৪০৪
৪০ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, পৃঃ ৪৪
৪১ কথামৃত, ১।১২।৯
৪২ বাণী ও রচনা, ১।৩৪

সোপান। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য তথা ঐক্য সম্ভব একমাত্র তত্ত্বানুভূতির পর্যায়ে। কোন কোন তাত্ত্বিক জটিল প্রশ্ন তুলেছেন,—যেহেতু লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সিদ্ধপুরুষের তত্ত্বানুভূতির আকার এক হতে পারে না, সুতরাং ঐক্য সম্ভব নয়। অদ্বৈত-পন্থী জ্ঞানমার্গী বলেন, প্রত্যেক ধর্মসাধনার চূড়ান্ত পরিণতি জীবব্রহ্মৈক্য-বোধরূপ অদ্বৈতানুভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন, 'উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা.…জানবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ।' এই মতে ঐক্য সম্ভব একমাত্র অদ্বৈতানুভূতির পর্যায়ে।[৪৩] কিন্তু ধর্ম-সাধনার শেষ ধাপ অদ্বৈতানুভূতি, এই সিদ্ধান্ত অনেক ধর্মাবলম্বী মানেন না। সুতরাং প্রশ্ন উঠবে, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সর্বধর্মসমন্বয়-পরিকল্পনায় কি এঁদের স্থান নেই? তাছাড়া এঁদের বাদ দিলে সর্বধর্মসমন্বয় পরিকল্পনাই যে ব্যর্থ হয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বভাব-অবগাহী উদার দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের বোধ হয় অভিপ্রেত নয়। তাঁর জীবনীতে দেখা যায়, তিনি বিভিন্ন সাধনপথে 'ভাবসাধনার পরাকাষ্ঠায় উপনীত' হবার পর শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে 'সর্বভাবাতীত বেদান্ত-প্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনে' প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমন্বয়সূত্র দিয়ে-ছিলেন, 'যত মত তত পথ'। অপথ, কুপথ, বিপথ পরিত্যাগ করে মানুষকে তার সহজ স্বাভাবিক পথ বেছে নিতে হবে। যদি আন্তরিক হয়, প্রত্যেক পথই পৌঁছে দেবে তত্ত্বানুভূতির রাজ্যে, তা সেই অনুভূতির আকার যাই হোক না কেন। ঈশ্বরানুভূতি, ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরকৃপালাভ এই ভাবটিকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন ধর্মের একই প্রাণ-মন্দাকিনী বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিত। সাধারণভাবে এই ঈশ্বরানুভূতি তথা তত্ত্বানুভূতির পর্যায়েই সকল ধর্মের সমন্বয় এবং বিভিন্ন ধর্মের বিরোধের অবসান সম্ভব। ধর্মসেবীমাত্রই ভগবানের ভক্ত। সকল ভক্তের এক জাত। ভক্তে ভক্তে বিরোধ স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক, অবাস্তব। এই দৃষ্টিতে সামাজিক বিরোধের অবসান করা দরকার। উদারদৃষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'সব মতই পথ। মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌছান যায়।' 'তাই প্রথমে একটা ধর্ম আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বরলাভ হলে সেই ব্যক্তি সব ধর্মপথ দিয়ে আনাগোনা করতে পারে; যখন হিন্দুদের ভিতর থাকে, তখন সকলে মনে করে হিন্দু; যখন মুসলমানের সঙ্গে মেশে, তখন সকলে মনে করে মুসলমান; আবার যখন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মেশে, তখন সকলে ভাবে ইনি বুঝি খ্রীষ্টান।'[৪৪] অপরপক্ষে মতলব-বাজ সম্প্রদায়কর্তাদের লক্ষ্য করে বলতেন, 'শ্যালারা পথে যাবারই কথা—ঐ নিয়ে মরছে মর শ্যালারা—ডুব দেয় না।'[৪৫]

অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, 'অভেদজ্ঞান পূর্ণ-জ্ঞান না হলে হয় না' এবং অদ্বৈততত্ত্বই সকল ধর্মসাধনের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু অদ্বৈততত্ত্ব সবধর্ম-

---

৪৩ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ: সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রকৃত পথ কি? উদ্বোধন ৩৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা:

"নানা পথ থাকিলেও একটি সাধারণ পথও আছে। অন্য সকল পথ পরিণামে একই পথে মিলিত হয়। সেইটিই সাধারণ পথ। ইহাই সেই অদ্বৈত পথ।.. এই অদ্বৈত পথে আরূঢ় হইবার জন্য বহু পথ আছে। সেই সমস্ত পথের সঙ্গে অন্য উপায়গুলি মিশিয়া যে বহুপথের কল্পনা করা যায়, সেই সকল উপপথকে লক্ষ্য করিয়াই 'যত মত তত পথ' বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই উপপথের পর যে পথ তাহা একই পথ, তাহা সেই জীবব্রহ্মৈক্য-বোধরূপ একটি মাত্র পথ, তাহাই অদ্বৈতবাদীর পথ।"

৪৪ কথামৃত, ২।১৫।১ ও ৫। পরিশিষ্ট পৃ: ১২　　৪৫ কথামৃত, ৪।২০।৫

মত গ্রাহ্য নয়, সুতরাং অদ্বৈতানুভূতির স্তরে সকল ধর্মের মিলন সর্ববাদীসম্মত আদর্শ হতে পারে না। ঈশ্বরলাভ তথা তত্ত্বানুভূতির পর্যায়ে (তত্ত্বানুভূতির আকার যাই হোক) সকল ধর্মের মিলন সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাঙ্গসুন্দর সর্বধর্ম-সমন্বয় একটি বাস্তব সর্বজনসমাদৃত কার্যকর আদর্শ। এরূপ সমন্বয় Pan Islam এর মত 'একধর্মীকরণ' মতবাদ নয়, নববিধানের মত ত্যাজ্যগ্রাহ্য বিশ্লেষণাত্মক বিচারের দ্বারা সমীকরণ নয়, বা দার্শনিক হেগেলের dialectic synthesis নয়, সর্বশাস্ত্রস্বীকৃত প্রত্যক্ষ সাধনভজনের উপর ধর্মসমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা। এই ধর্মবিরোধ নিষ্পত্তির সূত্র একটি ভাবগত তত্ত্বমাত্র নয়, বাস্তবে সুপরীক্ষিত একটি কার্যকর পন্থা। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-আদর্শের বৈশিষ্ট্য ;—কাউকেই নিজের ধর্ম ছাড়তে হবে না, অপর প্রচলিত বা অভিনব কোন ধর্মমত গ্রহণ করতে হবে না। যে যেখানে আছে সে সেখানে থেকেই অগ্রসর হবে নূতন লক্ষ্যের দিকে। অভিব্যক্তিভিত্তিক এই সমন্বয়ের আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম। ইতিবাচক এই আদর্শটির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মধ্যে, 'আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি।… হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গাতেই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে।'[৪৬] সার্বভৌমিক এই সর্বধর্মসমন্বয়ের নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক ধর্মসেবীকে জো সো করে ধর্মের লক্ষ্য ঈশ্বরানুভূতির দিকে আন্তরিকভাবে অগ্রসর হতে হবে। অপর সকল ধর্মের আচার্য ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। ধর্মের বাহ্য আড়ম্বর নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে ধর্মমতের মিলনকেন্দ্র ঈশ্বরানুভূতির দিকে ব্যাকুলভাবে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যবহারিক জীবনে অপর ধর্মাবলম্বীদের আত্মীয়জ্ঞানে গ্রহণ করতে হবে। সাধকের বহির্জীবন ও আন্তরজীবনের সমন্বয় কি ভাবে করতে হবে তার নির্দেশও দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন, "রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, তখন গরু সব মাঠে এক হয়ে যায়। এক পালের গরু। আবার যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়, তখন আবার পৃথক্ হয়ে যায়। নিজের ঘরে 'আপনাতে আপনি থাকে'।"[৪৭] এক মানব-সমাজের অঙ্গ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের ধর্মমত ভিন্ন হলেও তাদের মিলনে সত্যসত্যই কোন বাধা নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-উপলব্ধ সার্বভৌমিক সর্বধর্মসমন্বয়-সিদ্ধান্তটি স্বামী বিবেকানন্দ জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা পুনঃ প্রমাণিত করেছেন। জগতে প্রচলিত যাবতীয় ধর্মসাধনার পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। ভাবপ্রবণ, বিচারশীল, কর্মপটু ও ধ্যাননিষ্ঠ,—এই চার প্রকার মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্টি হয়েছে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ। জগতের বিভিন্ন ধর্মমত চারটি যোগের এক বা ততোধিক যোগ (অর্থাৎ উপায়) ধরে মিলিত হয়েছে ঐক্যবিন্দু ঈশ্বরদর্শন তথা তত্ত্বানুভূতিতে। ধর্মবিজ্ঞানের আদর্শ ও উপায় নির্দেশ করে স্বামীজী লিখেছেন, "Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this Divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work, or worship, or psychic control or philosophy—by one, or

৪৬ কথামৃত, ৪।২২।৪

৪৭ কথামৃত ১।১২।৯

more, or all of these—and be free.'[৪৮] ধর্মবিজ্ঞানের নীতি ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছেন যে জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের সমবায়ে চরিত্র গঠন করাই বর্তমান যুগের আদর্শ। যেমন সুষম খাদ্য (balanced diet) স্বাস্থ্যোন্নতি ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণে সাহায্য করে তেমনি মানব-প্রকৃতির মূল চারটি উপাদানের সুষম বিকাশের দ্বারা মানুষ দৃঢ় পদক্ষেপে ধর্মজীবনের মূল লক্ষ্য—তত্ত্বানুভূতির দিকে অগ্রসর হতে পারে; সেইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতের সঙ্কীর্ণগণ্ডি সহজে অতিক্রম করে ধর্মসমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দু-অভিমুখীন জীবন গড়ে তুলতে পারে। এই বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্বানুভূতি-কেন্দ্রিক ধর্মই বর্তমানের চাহিদা। বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন, 'We want··· a religion which is the basis of all special religions, a religion which can include them all, and one which harmonizes with science, philosophy and metaphysics.'[৪৯] শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী-পাঠক মাত্রই জানেন যে স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-ভিত্তিক ধর্মসমন্বয় বা স্বামী অভেদানন্দের বৈজ্ঞানিক ধর্মের উৎস শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী।

এইসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সর্বগ্রাহী উদার ধর্মমতের দ্বারা শুধুমাত্র যে বিবদমান ধর্মসম্প্রদায়সকলের বিরোধ নিঃশেষে ভঞ্জন হতে পারে তাই নয়, এই সমন্বয়-নীতির ভিত্তিতে জগতের মানুষের জীবন-সমস্যার সামগ্রিকভাবে সমাধান সম্ভব, পৃথিবীতে সহজ ও স্বাভাবিক গতিতে মিলন ও শান্তি আনয়ন সম্ভব। সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের কোলাহলে বিরক্ত হয়ে মানুষ কখনও কখনও 'ঢাকী শুদ্ধ ঢাক' বিসর্জন দেবার চেষ্টা করেছে। বৃহস্পতি-চার্বাক-মার্কসের চেলা-চামুণ্ডারা ধর্ম 'শোষিতের দীর্ঘশ্বাস', 'আম জনতার আফিঙ্' ইত্যাদি অভিযোগ তুলে ধর্ম-বর্জনের জন্য ঢেঁড়া দিয়েছে। ধর্মবিজ্ঞানের ছাত্র জানেন মানুষের মনের চিরন্তন গভীর বুভুক্ষা মিটাতে একমাত্র সক্ষম ধর্ম, মানুষের লুপ্তপ্রায় গুপ্ত মহত্ত্বকে সার্থকভাবে প্রবুদ্ধ করতে সমর্থ একমাত্র ধর্ম, বিশ্বশান্তির মূল নিদান একমাত্র ধর্ম। এষ ধর্মঃ সনাতনঃ। এই ধর্মকে অবলম্বন করে, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সর্বধর্মসমন্বয়ের মৌলিক আদর্শ অনুসরণ করেই ব্যক্তি-সত্তার জাগৃতি, সমষ্টি-মানুষের সমৃদ্ধি তথা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সর্বভাবস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক অবদান সর্বধর্মসমন্বয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'এখানে তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে ইনি আমাদের মতের লোক।'[৫০] বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজে এই ভাবাদর্শের বিশাল ভূমিকা। প্রশ্ন করা যেতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন কি? তিনি কি যথার্থই সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন? তাঁকে এই সকল জটিল প্রশ্ন করলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, 'অতসব জানিনি বাপু। আমি খাই দাই থাকি মায়ের নাম করি।' অনুরূপ প্রশ্ন করা হয়েছিল শ্রীমাকে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'দেখ বাবা, তিনি যে সমন্বয়ভাব প্রচার করবার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন, তা কিন্তু আমার মনে হয়নি। তিনি সর্বদা ভগবদ্ভাবেই বিভোর থাকতেন। খ্রীষ্টানেরা, মুসলমানেরা, বৈষ্ণবেরা যে যেভাবে তাঁকে ভজনা করে বস্তুলাভ করে, তিনি

---

৪৮ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I (1963) p. 257

৪৯ Prabuddha Bharata, 1900, Vol. v. p. 102

৫০ কথামৃত, ৪।২০।৩

সেই সেই ভাবে সাধনা করে নানা লীলা আস্বাদন করতেন ও দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত, কোন হুঁশ থাকত না।… সর্বধর্মসমন্বয় ভাবটি যা বললে, ওটিও ঠিক। অন্যান্যবারে একটা ভাবকেই বড় করায় অন্য সব ভাব চাপা পড়েছিল।'[৫১] জগজ্জননীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ধর্মসমন্বয়ের সাধনা যেন আপনা হ'তে উপস্থিত হয়েছিল; সেই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে সমন্বয়-ভাবাদর্শ এত সৌন্দর্য মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। তিনি নিজমুখেও বলেছেন, '… তেমনি যাকে পাইয়া এবং যার কাছে সর্বদা থাকিয়াও আমার তখন মনে হইত, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাঁহাকে নানাভাবে ও নানারূপে দেখিব। বিশেষ কোন ভাবে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে উহার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিতাম। কৃপাময়ী মা-ও তখন তাঁহার ঐ ভাব দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা যোগাইয়া এবং আমার দ্বারা করাইয়া লইয়া সেই ভাবে দেখা দিতেন। এইরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের সাধন করা হইয়াছিল।'[৫২]

এটা রামকৃষ্ণের যুগ, সত্য যুগ। যুগকর্তার ইঙ্গিতে স্বামী বিবেকানন্দ সকল ধর্মমতের সকল পথের মানুষকে সমবেত করে নিজে পুরোগামী হয়ে চলেছেন। বিভিন্ন জন বহন করছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের পতাকা। প্রত্যেকটি পতাকার উপর লেখা রয়েছে, 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'[৫৩] আর শান্তগতি জনসমুদ্র থেকে উত্থিত হচ্ছে এক অশ্রুতপূর্ব মহামিলনের ঐকতান। স্বরসমন্বয়ের মধ্যে চেনা যায় প্রত্যেকটি স্বরের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি সুরের মূলগত ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করে স্বরসমন্বয় করেছেন ওস্তাদ সুরশিল্পী। ফলে বৈচিত্র্যের পাশাপাশি ঐক্য অপূর্ব এক সুরলোক সৃষ্টি করেছে। প্রগতিশীল নির্দলীয় দলটি সার্বভৌম সর্বধর্মসমন্বয়-ভিত্তিক মানবসমাজকে স্বাগত জানাচ্ছে।

---

৫১ স্বামী গম্ভীরানন্দ : শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৫৮৫

৫২ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ২৮০-৮১

৫৩ চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের শেষ বাণী

সমালোচনা

The Visions of Sri Ramakrishna: Compiled by Swami Yogeshananda. প্রকাশক: রামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৪'৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও সাধনার গভীরতা ও বিস্তার দেশবিদেশের মনীষী-সমাজকে আগ্রহান্বিত করে চলেছে। এমন এক একটি মহাজীবন কালের দিক থেকে যতটা দূরবর্তী হয়, এক হিসাবে, নানা স্মৃতির সাক্ষ্যে ততই আমাদের কাছে সমগ্রতা লাভ করে। প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের সৌভাগ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নেই। কিন্তু বহুজনের দর্শন ও শ্রবণের কাহিনীগুলি একত্র হয়ে আজ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণমানসচিত্রটি সামগ্রিক তাৎপর্য লাভ করছে, এমনটি তাঁর সমকালে সম্ভব ছিল না।

নানা দিক থেকে এই পরমসত্যের আশ্চর্য প্রকাশকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। তাঁর কথায়, তাঁর কাহিনীতে, তাঁর অধ্যাত্ম-অনুভবের অতলতায়, সংসারের সব প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির সার্থকতা বিচারে, সন্ন্যাসের সর্বস্বত্যাগের নিরঞ্জন প্রত্যয়ে, সব মত ও পথের মহামিলনের তীর্থপথে, আবার দর্শনের যুক্তিসিদ্ধ উত্তরণপরম্পরায়—কতো ভাবেই না ভক্ত, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী তাঁর অনুধ্যানে আপন আপন জীবনপন্থায় আশ্বাস ও আলোক পেতে পারেন!

স্বামী যোগেশানন্দ আলোচ্য গ্রন্থে একটি অভিনব দিক পাঠকমণ্ডলীর কাছে উপস্থাপিত করেছেন, যে দিকটি আমাদের পরিচিত হলেও ঠিক এদিক থেকে কোনো বিস্তৃত আলোচনা এর আগে কেউ করেন নি। সাধক-মহাপুরুষেরা সব দেশেই এমন কিছু কিছু দর্শন লাভ করে থাকেন, যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিপথে ধরা দেয় না। এ-জাতীয় দর্শন লৌকিক যুক্তিবিচারের গণ্ডীতে পুরোপুরি ধরা দেয় না বলে একদল সমালোচক আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদের সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চান। কিন্তু পৃথিবীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির জগতে সব সিদ্ধপুরুষই এ-জাতীয় দর্শন কম বেশী পেয়েছেন এবং সেই সব দর্শনের আলোকে নিজেদের ও অনুগামীদের জীবনধারা পরিচালিত করেছেন। সুতরাং যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এ-জাতীয় দর্শনের কথাও সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। সংকলয়িতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যদর্শনসমূহ সেই মহামানবের জীবনের ইতিহাস-অবলম্বনে ধারাবাহিকভাবে গ্রথিত করেছেন, কিন্তু এসব দর্শনের কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে নিজের বক্তব্য আরোপ করেন নি। সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ হয়ে গেলে পার্থিব জীবনলীলার সমান্তরালে যে অসীমের জগৎ উন্মোচিত হয়, পাঠক তার সীমাহীন বিস্ময়ে অভিভূত হতে বাধ্য।

সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা মেরী লুই বার্ক তাঁর অনবদ্য মুখবন্ধে এ-গ্রন্থটিকে অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার মণি-ভাণ্ডাররূপে বর্ণনা করেছেন। ভারতীয় দৃষ্টিতে সিদ্ধপুরুষদের জীবনে ইষ্ট, দেবতা, ভবিষ্যৎঘটনা, অধ্যাত্মরাজ্যের বিভিন্ন স্তরের প্রকাশ—এগুলি খুব আশ্চর্য নাও ঠেকতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ-বাদী পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে কিছুকাল আগেও পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের বাইরের ঘটনাবলী স্বাভাবিকভাবেই অস্বীকৃত হতো। শ্রীমতী বার্কের মতে আজকের পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে আর সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখাটি এত সুনিশ্চিত নয়।

এদেশের আধুনিক মনে অবশ্য পাশ্চাত্য-

বাসীদের ফেলে-আসা সংশয়ের ছায়াই যুক্তিবাদের রূপ ধরে দেখা দেয়। পরিপূর্ণভাবে সত্যকে জানার পক্ষে সংশয় যতটা দরকারী, উপলব্ধি তারও বেশী প্রয়োজনীয়। এদিক থেকে যাঁরা জীবনসত্যকে গ্রহণ করেন, তাঁরা দেখবেন শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জীবনে অজস্র দর্শনের শোভাযাত্রায় সব কটি দর্শনই তাঁর সত্যোপলব্ধির নানামুখী প্রকাশ। শৈশবে মাঠের আলপথে যাবার সময় মেঘের বুকে বলাকার সৌন্দর্য দেখে তন্ময়তা, দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী-মন্দিরে মাতৃদর্শনের ব্যাকুল-তম আবেগের মুহূর্তে অনন্তজ্যোতিরূপিণী মহা-শক্তির তরঙ্গলীলাদর্শন অথবা সপ্তর্ষিমণ্ডলে ধ্যানমগ্ন ঋষির কাছে দিব্যশিশুরূপী আবির্ভাব—এ-জাতীয় দর্শন থেকে আরম্ভ করে এ-জগতের ও জগতের পরপারের কতো বিচিত্র চলচ্ছবি শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসে নিত্য প্রবাহিত হয়ে চলেছিল যাদের সৌন্দর্য, মাধুর্য, ব্যঞ্জনা ও উত্তরণ যেমন সাধনার সামগ্রী, তেমনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ভাবকল্পনারও আদর্শ।

এমন একটি দিব্যদর্শনের সঙ্কলনগ্রন্থ যে-কোনো ভাষায়ই পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে। তবে ইংরেজী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হওয়াতে পাশ্চাত্যজগতে যে অধ্যাত্ম-সচেতনতা গড়ে উঠেছে, তার পক্ষে এ-গ্রন্থটি বিশেষ সহায়ক। ভারতীয় সাধনার পটভূমিসম্বন্ধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁদের কাছে এ-গ্রন্থে সঙ্কলিত আধ্যাত্মিক সম্পদ যে বিশেষ মূল্যবান, একথা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থটির প্রকাশের পরিকল্পনায় সুরুচি ও সংযম বিশেষ প্রশংসনীয়। তবে প্রচ্ছদটি আরো ব্যঞ্জনাময় হতে পারতো। **ডক্টর প্রণব রঞ্জন ঘোষ**

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

কাটিহার: গত ২৪শে ফেব্রুআরি হইতে ১লা মার্চ পর্যন্ত কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৯তম জন্মমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন বিশেষ পূজা হোম নগরকীর্তন পাঠ ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ৩৫০০ ব্যক্তিকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২৫শে হইতে ২৮শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ভাষণ দেন স্বামী অমৃতত্বানন্দ, স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীনন্দ-লাল দে ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ধর্মসভার শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন, রামায়ণ গান, শুম্ভ-নিশুম্ভবধ পালাকীর্তন ও তরণীসেনবধ পালাকীর্তন পরিবেশন করেন। গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবানুষ্ঠানের শেষ দিবসে স্বামী আত্মানন্দের পৌরোহিত্যে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিবিক্তানন্দ আশ্রমের বার্ষিক কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। ২৫শে ফেব্রুআরি হইতে ২৭শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ 'বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মেলা' নামে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রায় ৪০০০ দর্শক এই প্রদর্শনী দেখেন। ছাত্রদের অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টা সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে।

তমলুক : গত ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুআরি তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম দিন মঙ্গলারতি, বেদপাঠ ও রামকৃষ্ণবন্দনার মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। মধ্যাহ্নে বিশেষ পূজা হোম ও ভোগারতির পর প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। হাসপাতালের রোগীদের এবং শিশুরক্ষা-ভবনের বালকদেরও ফলপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে কালীকীর্তনের পর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দ রামকৃষ্ণ-পুণ্যাবির্ভাব কাহিনী আলোচনা করেন এবং "রাণী রাসমণি" ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়।

দ্বিতীয় দিন আশ্রম বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব উপলক্ষে ভারপ্রাপ্ত মহকুমা-শাসক শ্রীবাসুদেব দেবের সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পুরস্কার গ্রহণ করে। ধর্মসভার অধিবেশনে আশ্রমাধ্যক্ষ তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামীজীর উক্তিসমূহ সুললিত ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা স্বামী প্রভানন্দ বলেন—বর্তমান যুগে শ্রীশ্রীঠাকুরই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও অনন্য অবলম্বন। মহকুমা মুনসেফ শ্রীতড়িৎবিকাশ দেব ঠাকুরের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৌকাবিলাস ও পদাবলী কীর্তন শত শত ভক্তকে প্রভূত আনন্দ দেয়।

রামহরিপুর : গত ৩রা মার্চ রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতির পর 'পুরুষসূক্ত' ও 'নারায়ণসূক্ত' পাঠ করা হয়। ছাত্রাবাসের বালকগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভজন-সঙ্গীত পরিবেশন করে। পূজা হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী দীনেশানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ করেন। পরে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করেন স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ। প্রায় ৪৫০০।৫০০০ ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ পান। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্বানুভবানন্দ। বক্তৃতা করেন স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ ও দীনেশানন্দ। সন্ধ্যারতির পর দুইটি সম্প্রদায় পালাকীর্তন করিয়া ভক্তমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন। কীর্তন চলে রাত্রি প্রায় ২টা পর্যন্ত। স্থানীয় লোকের প্রবল উৎসাহ ও আন্তরিক সহযোগিতায় উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

বাগেরহাট : গত ২৪শে ফেব্রুআরি বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিদিবস উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজান্তে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব সেখ আবদুর রহমান, এম. পি., বাগেরহাট। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মহাকুমা প্রশাসক জনাব আজাদ রুহুল আমীন সাহেব। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধর্মমত"-প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী দিব্যানন্দ, এ্যাড্‌ভোকেট বিনোদ বিহারী সেন, এ্যাড্‌ভোকেট এম. এ. সবুর, আতাহার উদ্দীন খান, শ্রীশিবপদ বসু, আলীয়া মাদ্রাসার মোঃ সেকেন্দার আলী প্রমুখ সুধীবৃন্দ। সভাপতি তাঁহার সারগর্ভ ভাষণের পর বাগেরহাট পৌরসভার অন্তর্গত সকল বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ৫৮ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একসেট করিয়া পাঠ্য পুস্তক এবং ৩৫ জন শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মাননীয় এম পি. সাহেব পূর্বাহ্ণে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে দৈনিক পাঁচশত শিশুর মধ্যে দুগ্ধ বিতরণ করা হইবে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

আরারিয়া : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩৯তম শুভ জন্মতিথি উৎসব অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন, রামায়ণ গান, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা এবং ধর্মসভার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। স্বামী আত্মানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। সেতারশিল্পী শ্রীনন্দলাল দে এবং শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রামায়ণ গানে অংশ গ্রহণ করেন।

কলিকাতা : গত ১৭ই মার্চ দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে কসবা চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৯তম শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। মঙ্গলারতিতে শুরু হইয়া ভজন পূজা পাঠ লীলা-কীর্তন ও ধর্মসভায় সারাদিন অতিবাহিত হইয়া সন্ধ্যারতিতে উৎসবটি সমাপ্ত হয়। আনুমানিক আটশত ভক্ত ও চারশত দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী অমৃতত্বানন্দ ও প্রধান অতিথি স্বামী অচ্যুতানন্দ তাঁহাদের ভাষণে সকলকে অনুপ্রাণিত করেন।

নবগ্রাম : গত ১০ই মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মদিবস পালন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতির পর বিশেষ পূজা ও হোম হয়। স্থানীয় বালক-বালিকারা শ্রীশ্রীঠাকুরের গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে। বৈকালের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ। সভাশেষে সালিখা কালীকীর্তন সমিতি কর্তৃক কালীকীর্তন হয়।

পরলোকে বিভূতিভূষণ দত্ত

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য বিভূতিভূষণ দত্ত গত ১৯শে মার্চ ১৯৭৪ মঙ্গলবার দিবা ২-৩৫ মিনিটে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের অশেষ কৃপায় তিনি কিছুকাল বেলুড় মঠে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার দুর্লভ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২১ শ্রীশ্রীমহারাজের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে অতিরিক্ত সেবকরূপেও সঙ্গে ছিলেন। শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ তাঁহাকে 'মোহন্ত' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি একজন সুদক্ষ ক্রীড়াবিদ্ ছিলেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

পরলোকে সগেন রায়

গত ২০শে মার্চ, রাত্রি সাড়ে নয়টায় শেলার বাসী ভক্ত সগেন রায় ৯০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব দিন প্রাতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী যখন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তখন সগেনবাবুর মুখে গভীর আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামী প্রভানন্দের (কেতকী মহারাজ) সহিত বেলুড় মঠে আসিয়া স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন।

শেলা আশ্রমের সমুদয় জমি তিনিই দান করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহান্তে শেলা আশ্রমের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা
[পুনর্মুদ্রণ]

ভাব্‌বার কথা।

স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভোলাপুরি বেজায় বেদান্তী—সকল কথাতেই তাঁর ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে পরিচয়টুকু দেওয়া আছে। ভোলাপুরির চারিদিকে যদি লোকগুলো অন্নাভাবে হাহাকার করে—তাঁকে স্পর্শও করে না; তিনি সুখ দুঃখের অসারতা বুঝিয়ে দেন। যদি রোগে শোকে অনাহারে লোকগুলো ম'রে ঢিপি হয়ে যায় তাতেই বা তাঁর কি? তিনি অমনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব চিন্তা করেন! তাঁর সামনে বলবান দুর্ব্বলকে যদি মেরেও ফেলে, ভোলাপুরি—"আত্মা মরেনও না, মারেনও না" এই শ্রুতি বাক্যের গভীর অর্থসাগরে ডুবে যান। কোনও প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তে ভোলাপুরি বড়ই নারাজ। পেড়াপিড়ি কর্ল্লে জবাব দেন যে, পূর্ব্ব জন্মে ও সব সেরে এসেছেন। এক জায়গায় ঘা পড়্‌লে কিন্তু ভোলাপুরির আত্মৈক্যানুভূতির ঘোর ব্যাঘাত হয়,—যখন তাঁর ভিক্ষার পরিপাটিতে কিঞ্চিৎ গোল হয় বা গৃহস্থ তাঁর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পূজা দিতে নারাজ হন, তখন পুরিজির মতে গৃহস্থের মত ঘৃণ্যজীব জগতে আর কেহই থাকে না এবং যে গ্রাম তাঁহার সমুচিত পূজা দিলে না সে গ্রাম যে কেন মুহূর্ত্ত মাত্রও ধরণীর ভার বৃদ্ধি করে, এই ভাবিয়া তিনি আকুল হন।

ইনিও ঠাকুরজিকে আমাদের চেয়েও আহাম্মক ঠাওরেছেন।

বলি, রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখ্‌লেনা, ব্যবসা বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার উপর নেসা ভাঙ্‌ এবং দুষ্টামিগুলাও ছাড়্‌তে পার না, কি করে জীবিকা কর বল দেখি? রামচরণ—"সে সোজা কথা মহাশয়—আমি সকলকে উপদেশ করি।"

রামচরণ ঠাকুরজিকে কি ঠাওরেছেন?

—০০—

ভগবদ্গীতা-

শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[১—১০ শ্লোক, উহাদের অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ এবং শাঙ্করভাষ্যের কিয়দংশ, বঙ্গানুবাদসহ।

—বর্ত্তমান সম্পাদক]

শারীরকসূত্র রামানুজ ভাষ্যম্‌।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিতম্‌।)

[প্রথম সূত্রের মূল ভাষ্যের কিয়দংশ, বঙ্গানুবাদসহ।—বর্তমান সম্পাদক]

[অতিরিক্ত পৃষ্ঠা]

মুর্ষিদাবাদ

অনাথ-আশ্রম।

উদ্বোধন সম্পাদক সমীপেষু,—

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, মুর্ষিদাবাদের শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুর মুর্ষিদাবাদ অনাথ আশ্রমে এককালীন ২০০৲ দুই শত টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এই বদান্যতার জন্য তিনি সর্ব্ব সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

মুর্ষিদাবাদ জেলার লালগোলা নামক স্থানের জমীদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় সাহেবের উদারতা বিশেষ প্রশংসনীয়। আমি তাঁহার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া আশ্রমের ৩টী বালকসহ সম্প্রতি তাঁহার রাজধানীতে গিয়াছিলাম। তাঁহার সরল ব্যবহারে ও দানশীলতায় আমরা যার পর নাই আপ্যায়িত হইয়াছি।

তাঁহার এমনি দয়া যে, তিনি প্রত্যহ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অনাথ বালক কয়টীকে ভোজন করাইতেন। তাঁহার সদয় ব্যবহারে আমরা প্রকৃতই মুগ্ধ। সম্প্রতি তিনি অনাথ আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২৫৲ টাকা নগদ এবং আশ্রমস্থ সকলকেই নূতন যথোপযোগী পরিধেয় বস্ত্রাদি দিয়া বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি প্রতি বৎসর ১০০৲ এক শত টাকা নগদ, ৪৮ মণ রবিশস্য এবং ১৫০ দেড় শত নূতন বস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহার এই সহানুভূতি-লাভ করিয়া আমরা বিশেষরূপে উৎসাহিত হইয়াছি এবং আশা করি, তাঁহার সহানুভূতি স্থায়ী হইলে এই অনাথ আশ্রম স্থায়ী হইয়া লোক সমাজের প্রভূত হিত সাধন করিবে। ইতি।

অখণ্ডানন্দ।

রামকৃষ্ণ মিশন হইতে

কলিকাতায় প্লেগকার্য্য।

সম্পাদক—সিস্‌টার নিবেদিতা।

প্রথম কার্য্যাধ্যক্ষ—স্বামী সদানন্দ। অন্যান্য কার্য্যকারীগণ,—১। স্বামী শিবানন্দ। ২। স্বামী নিত্যানন্দ। ৩। স্বামী আত্মানন্দ।

৩১শে মার্চ্চ আমাদিগের মিশন হইতে প্লেগনিবারক কার্য্য আরম্ভ হয়। ঘর বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাই প্লেগ নিবারণ করিবার প্রথম ও প্রধান উপায়। বসতিতে ইহা হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। সহরের মধ্যে যদি কোন স্থানে অনেকগুলি গরীব কুটীর বাঁধিয়া বাস করে, সেই স্থানকে "বসতি" বলে। বসতির লোকেরা প্রায় নিম্ন শ্রেণীর হইয়া থাকে; কেমন ক'রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়, তাহারা তাহা জানে না, জানিলেও অর্থাভাবে অক্ষম। ভারতসম্রাজ্ঞীর রাজধানী হইলেও, কলিকাতায় এরূপ বসতি বা গরীব পল্লী অনেক। প্লেগ প্রথমে বসতিই আক্রমণ করেন; পরে ক্রমশঃ প্রাসাদাদিতে প্রবেশ করেন।

স্বামী সদানন্দ সাতজন ধাঙ্গড় লইয়া বাগবাজার বোসপাড়ার বসতি সাফ করিতে প্রথম স্থরু করেন।

৫ই এপ্রেল, সিস্‌টার নিবেদিতা অর্থের জন্য ইংরাজি সংবাদপত্রে আবেদন বাহির করেন। আমাদের যাহা ছিল, তাহার উপর ২৩৫৲ টাকা আরও পাওয়া গেল। ৬ই এপ্রেল সিস্‌টার নিবেদিতা ৭ জন ধাঙ্গড় ছাড়া আরও ৫ জন ধাঙ্গড় নিযুক্ত করিলেন।

ইতিপূর্ব্বেই নিকিডীপাডাব বসতিতে কার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। নিকিডীপাডা শ্যামবাজারের নিকটে। এই বসতি অনেক দিন হইতে এতদূর অস্বাস্থ্যকর ও অপরিষ্কার ছিল যে, তাহা আর কি বলিব। ১৫ই এপ্রেল নাগাৎ আমাদিগের নিকিডীপাডার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। উক্ত তারিখে স্থানীয় ডিস্‌ট্রিক্ট মেডিকাল অফিয়র ডাক্তার মেহনী সাহেব নিকিডীপাড়ার কার্য্য দেখিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ এবং উৎসাহ প্রদান করেন। ১৭ই এপ্রেল চেয়ারম্যান্ ব্রাইট্ সাহেব স্বয়ং দেখিতে আসিয়াছিলেন,— তিনিও খুব উৎসাহ প্রদান করিয়া যান।

শিয়ালদহর নিকট মুচিবাগানে একটী মস্ত লম্বা ড্রেন অনেক দিন হইতে অত্যন্ত ময়লায় ভর্ত্তি হইয়া ছিল। কতকগুলি ভদ্রলোকের অনুরোধে সিস্‌টার নিবেদিতা সেই ড্রেন পরিষ্কার করিবার জন্য ১৯শে এপ্রেল সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহার জন্য আমাদের পূর্ব্বেকার ধাঙ্গড় ছাড়া আরও অনেক কুলি নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। ২০শে এপ্রেল শিয়ালদহর কার্য্য শেষ হইয়া যায়।

২১শে এপ্রেলে ক্লাসিক থিয়েটারে এক সভা আহ্বান করা হয়; সিস্‌টার নিবেদিতা "প্লেগ এবং ছাত্রগণের কর্ত্তব্য" বিষয়ে বক্তৃতা দেন; স্বামী বিবেকানন্দ সভাপতি ছিলেন। ১৫ জন ছাত্র প্লেগে কার্য্য করিবার জন্য ভলান্‌টিয়ার হন। তাঁহারা নিজের নিজের পাড়ায়—কোথা অপরিষ্কার আছে—কোথা প্লেগ হইয়াছে—প্রতি গৃহে অনুসন্ধান লইবেন। এই সম্বন্ধে প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার সময় ৫৭ নম্বর রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে রামকৃষ্ণ মিশন গৃহে উক্ত ছাত্রবৃন্দ এবং অন্যান্য সকলে একত্রে মিলিয়া সিস্‌টার নিবেদিতার সহিত কথোপকথন করিতেন।

১লা মে পুনরায় ওয়ার্ড নম্বর একে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কতিপয় ব্রাহ্মমহোদয় সিস্‌টার নিবেদিতাকে খুব সাহায্য করিয়াছেন।—ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬।

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১লা আষাঢ়। (১৩০৬ সাল) [১১শ সংখ্যা।]

গোবরা।

(কবিবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

তারিণী চাটুয্যে সওদাগর আফিসে "সদর মেট" কায করিয়া বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে পরম সুখ্যাতির সহিত কার্য্যে অবসর লইয়া আফিষ হইতে "পেনসন" পান। সাহেবরা এখনও বড আদর করে, তারিণীর মাথাটী ধরিলে বড সাহেব আপনার ফ্যামিলি ডাক্তার পাঠান। স্বয়ং সাহেবরা দেখিতে আসিয়া বিশ্বাসী ভৃত্যের শয্যাপার্শ্বে বসেন। তারিণীর প্রতি তাঁহাদের বড স্নেহ। তারিণী চাটুয্যে সদ্ব্যয়ী, মিষ্টভাষী, পরোপকারী ও নির্ব্বিরোধী। অবসর পাইয়া আপনার পূজাদি লইয়া থাকেন। চাটুয্যের পরিবারও অতি পবিত্রা—নাম অন্নদা—কার্য্যেও অন্নদা। "আহা, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!" এ কথা সমবয়স্কা নারীগণ ঈর্ষা ভুলিয়া বলে। বামনীকে দেখিলে,—তাহার স্নেহ-বাক্য শুনিলে, আপনা হইতেই মাতৃ বাক্য আইসে। বামুনের মেয়ে—পাড়াশুদ্ধ লোকের মা! কিন্তু মা বলিবার গর্ব্ভের সন্তান নাই। সুখের সংসারে ভগবান এই দাগা দিয়াছেন। বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে,—সন্তান হইবার আর সম্ভাবনা নাই। চাটুয্যে ভাবিতেন, যাহা আছে দেবসেবায় দান করিবেন। এ অবস্থায় ত্রিপুরা ঠাকুরাণী নাম্নী একটী পাড়াপড়সী ব্রাহ্মণী কোথা হইতে চণ্ডীর ঔষধ আনিয়া বলিল,—"অন্নদা, এই চণ্ডীর ঔষধ খা,—তোর ছেলে হবে।"

বৃদ্ধবয়সে চাটুয্যে একটী পুত্র সন্তান লাভ করিল। জন্মদিনে বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা নাই। বাজ্‌না-বাদ্যি! হিজ্‌ড়েরা আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ফিরিল। বড় সাহেবও "রিটায়ার" হইবার সময়, তারিণীর ছেলে হইয়াছে শুনিয়া, লাখ্ টাকা ছেলের নামে দিয়াছে। চাটুয্যের মহা আনন্দ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘোর বিষাদ! শুভক্ষণে, শুভলগ্নে পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। জ্যোতিষপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছেন,—সন্তান হইতে বংশের মর্য্যাদা থাকিবে,—তর্পণে পিতৃলোক তৃপ্ত করিবে। ব্রাহ্মণের পরম আনন্দের বিষয়, পুৎনামক নরক হইতে রক্ষা পাইয়াছেন,—সন্তান উৎপাদনে পিতৃকার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু গৃহিনীর প্রসব করিয়া অবধি বড় অসুখ। ক্রমে রোগ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এদিকে জাত শিশুর নিমিত্ত মাইদিউনী পাওয়া যায় না। এক মাগী বাগ্দিনী,—মণি তাহার নাম;—"হস্‌পিটালে" প্রসব করিয়া সেইদিনই আসিয়াছে,—ছেলেটা

দুই ঘণ্টা বাঁচিয়াছিল মাত্র। বাগ্দিনী নব শিশুর মাইদিউনী হইল। মাতৃস্তন আর শিশুর ভাগ্যে ঘটিল না! বাগ্দিনীই প্রতিপালন করে। দুই মাস কাল শয্যাধারা হইয়া অন্নদা দেবী ক্রমে আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু ছেলেটী বাগ্দিনীর কাছেই থাকে। মণি বাগ্দিনী বড় দজ্জাল,—নষ্ট, দুষ্ট, খাণ্ডার যত নাম আছে,—মণি বাগ্দিনীকে দিলে কুলায় না; কিন্তু সন্তান প্রতিপালনে মণি বাগ্দিনী সাক্ষাৎ জননীরূপ ধারণ করিয়াছে। যাহার সহিত মণি বাগ্দিনী কোন্দল করে,—সে যদি ভয় দেখায় যে, ছেলে ঘুমাইলে সে চীৎকার করিয়া ছেলের ঘুম ভাঙ্গাইবে—বাগ্দিনী অতি শান্ত,—পায়ে ধরিয়া কোন্দল মিটায়! মণি বাগ্দিনী আর সে বাগ্দিনী নাই। যেখানে দেব দেবী দেখে, মাথা খোঁড়ে,—ছেলে যেন অন্নদা বাম্নীর না বশ হয়! অষ্ট প্রহর ভাবে,—বড় হয়ে গোবরা আমায় "মা" বল্‌বে কি? ছেলের নাম মাগী গোবরা রাখিয়াছে। গোবরার গল্প শুনাইয়া,—"গোবরা এমন হেসেছে,"—"গোবরা এমন হাত নেড়েছে,"—মাগীর কাছে যা চাও—দিবে। ছেলে কোলে করিয়া চাটুয্যে যেখানে বসে, সেইখানে যায়। কিন্তু অন্নদা দেবী "দিদি" সম্বোধন করিয়া মিষ্ট কথায় ছেলে কাছে আনিতে বলিলে, বলিত,—"রাখগো রাখ,—তোমার রস রাখ,—ছেলে এখন ঘুমাবে।" একটা না একটা ওজর করিয়া, প্রায়ই ছেলে কাছে লইয়া যাইত না। অন্নদা দেবী হাসিতেন। সে হাসি দেখিয়াও মাগী রাগিত, বলিত,—"হাস্‌বে না কেন? ওর ছেলে, ও হাস্‌বে না কেন? আমি ত পেটে ধরি নাই!" বিস্তর চেষ্টায় বাম্নি তার অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিতে পারিল না।

ছেলের নামকরণ হইল,—"উমাচরণ" কিন্তু বাগ্দিনী "গোবরা" বলে, নামেরও উপর দ্বেষ! এ সকল প্রথম প্রথম মিষ্ট ছিল, এখনও যে মিষ্ট নয়, তা' নয়,—কিন্তু ক্রমে বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। ছেলে লইয়া যার তার সঙ্গে ঝগড়া হয়,—"চাকর ভাল দুদ আনে নাই,"—"দাসী উনানে আগুন দেয় নাই,"—"দুদ ভাল জ্বাল দে'য়া হয় নাই,"—"ও পোড়ারমুখো ছেলের দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে গেল,"—"ও মাগী নিশ্বেস ফেলে গেল!" একে দেখে ছেলে লুকায়,—ওকে দেখে ছেলে লুকায়,—মানা সত্বে ছোট পাড়ায় ছেলে লইয়া যায়। আবার অকথা কুকথা শুনিয়া ছেলে আধ আধ ভাষায় সেই সকল বলিতে চেষ্টা করে! ক্রমে ছেলে যত বড় হইতে লাগিল,—বাগ্দিনীকে লইয়া ততই বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। লেখাপড়া করিতে যাইতে দিবেনা। গেঁড়ি, গুগলি, ঝিনুক, ভদ্রলোকের অখাদ্য মৎস্য,—বাগ্দিনী ভালবাসিত। সেই সকল দ্রব্য বাগ্দীপাড়ায় রন্ধন করিয়া, গোপনে ছেলেকে খাইতে দিত। ছেলে যদি একবার কাঁদিয়া থাকে,—সে দিনত' ত্রিভুবনে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। ক্রমে ছেলে যত বাড়ে, বাগ্দিনী ততই অসহ্য হইয়া উঠিল। উপনয়নের পর শূদ্রের মুখ দেখিতে নাই, মাগী না'কি বাধা না মানিয়া উকি মারিয়া দেখিত। উপনয়নের পর মাগী "ভিক্ষা মা" হইল। এবার ভাবিল, বামুন মাগীর যা অধিকার ছিল, সেই অধিকার তাহার সম্পূর্ণ হইয়াছে। এত দিন চাটুয্যে মহাশয়কে মানিত,—এখন আর তাহাও নহে! আবার বাগ্দীপাড়ায় কে না কি বলিয়াছে,—"ছেলে এখন তোর!"—লিখ্‌তে দেবেনা, পড়্‌তে দেবে না!—"কেন,—পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাবে!—হাজার মানা করুক,—আমি লুকিয়ে বেঁধে খাওয়াব।"—কিন্তু আবার ভয়ও পায়,—বামুনের ছেলে—কি হতে কি হবে! গাল মন্দ সহ্য করিয়াও বাগ্দিনীর এ পর্য্যন্ত জবাব হয় নাই। কিন্তু কুপুত্র হইলে পিতৃলোকের অধোগতি

হইবে। বাগ্দিনী কোন মতেই শোনে না। কুপুত্র—শতপুত্র ত্যাজ্য,—ব্রাহ্মণের এ মর্ম্মে মর্ম্মে ধারণা। ক্রিয়াবান পূর্ব্বপুরুষের অকর্ম্মণ্য পুত্র বলিয়া মনে মনে আপনাকে জ্ঞান। বাগ্দিনীর কাছে রাখিলে সন্তান কুসন্তান হইবে। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের জন্য নিজ শিরশ্ছেদ করিতে প্রস্তুত। বাগ্দিনীকে জবাব দিলেন। বাগ্দিনী কিছু বলিল না,—কাঁদিল না,—চলিয়া গেল!—সকলে আশ্চর্য্য হইল! কিঞ্চিৎ দূরে একটী কুটীর লইয়া, ঘুঁটে বেচিয়া—সময় মত ফল বেচিয়া—ও অন্যান্য লোকের ফায়ফরমাস খাটিয়া দিন গুজরান করিতে লাগিল।—উমাচরণের আর খোঁজও লয় না। অন্নদাদেবী, সন্তানের কল্যাণকামনায় কত স্তব স্তুতি করিয়া পাঠান,—বাটীতে আসিতে বলেন,—উত্তম সামগ্রী তৃপ্তির নিমিত্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু বাগ্দিনী আসেও না, দ্রব্যগুলিও ব্যবহার করে না,—ভিকারী নাগারীকে দেয়। মাগীর কোনও নিয়ম নাই,—এক নিয়ম—অতি নিভৃতে বসিয়া আহার করে। সে সময়ে দুয়ার বন্ধ করিয়া দেয়,—কাহাকেও আসিতে দেয় না, দেখিতে দেয় না। যাহা রন্ধন করে; তাহার কিঞ্চিৎ লইয়া একটা পাবে রাখে, পরে কাককে খাওয়ায়।

এদিকে উমাচরণ দিগ্‌গজ হইয়া উঠিয়াছে। অসামান্য বুদ্ধিবলে কিছু শিখিতে পারে বটে, কিন্তু মাষ্টার পণ্ডিতকে ঘুষ দিয়া বশ করিয়াছে। মাষ্টার পণ্ডিত পড়াইতে আসিলে, পান আনাইয়া, তামাক আনাইয়া দাবা খেলিতে বসায়। সৃষ্টির অকার্য্য কুকার্য্য পাড়ার ছেলেরা যত করে, তার সর্দ্দার উমাচরণ। কুসংসর্গের ভয়ে চাটুয্যে মহাশয় স্কুলে দেন নাই। সে স্কুলের পক্ষে মঙ্গল, স্কুলে গেলে সকলকে "বয়াটে" করিত। কখন কখন বাগ্‌দিনী মণি মার কাছে যায়, বাগ্‌দিনী দূর দূর করে। যা কিছু ফল টল পায় তুলিয়া লয়। বাগ্দিনী অবাচ্য গালি দেয়। তবু মাঝে মাঝে যায়, বাগ্দিনী পলাইল।

উমাচরণের মাতৃবিয়োগ হইল। পৃথিবীতে যদি উমাচরণ কাহাকেও ভয় করিত,—তাহা মাকে। তাড়না ভিন্ন তিনি উমাচরণকে কখনও মিষ্টবাক্য বলেন নাই। কুকার্য্য করিলে প্রহার করিতেও ত্রুটি করিতেন না। উমাচরণ ভয় করিত, কিন্তু মনে মনে ক্ষোভ ছিল, পাড়ার ছেলে পুলেকে যত্ন করেন, চাকর দাসীকেও যত্ন করেন, কিন্তু আমায় ভালবাসেন না। মাতার প্রতি কোপ না হইয়া কিসে মাতার প্রিয়পাত্র হইবে, এই চেষ্টা উমাচরণের বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু তাহার মাতার রুষ্টভাব দূর করিতে পারিল না। পীড়ার সময় সেবা করিতে যাইলে, তাহার মাতা তাড়াইয়া দিতেন, বলিতেন,—"দূর হ, তুই আমার কাছে আসিস্‌নি, মুখে আগুন দিবার সময় আগুন দিস্।" উমাচরণ কাঁদিত, গৃহের বাহিরে বসিয়া থাকিত। বাহিরের জলটা দেওয়া, ফাইফরমাস খাটিত। রুগ্ন-শয্যায় গৃহিণী একদিন সকলকে বাহিরে যাইতে বলিয়া কর্ত্তাকে ডাকিলেন। গিন্নী ধীরে ধীরে বলিতেছেন, উমাচরণ দোরের পাশে বসিয়া শুনিল। গিন্নী কর্ত্তাকে বলিতেছেন, "তোমার পদসেবা করিয়া আমার কোনও অভাব নাই। একটী কথা আমার রেখো, পেটের কাঁটা, ফোটে কি কর্ব্বে! তুমি জান উমো বড় অভাগা, একদিনও স্তন দিতে পারি নাই। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, পাছে অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে ওর প্রতি আমি চাই নাই, কখনও আদর করি নাই, পাছে তুমি তাড়না কর, এই ভয়ে আমি আগেই তাড়না করিতাম; কিন্তু বাছা সকলের কাছেই দুরন্ত শুনিতে পাই! আমার তাড়নায় কেঁদেছে মাত্র, কখনও মুখ তুলে চায় নাই। আমার পুত্র-স্নেহ আমি তোমায় দিয়া গেলাম!" উমাচরণ শুনিল, "মা মা" রবে উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সেই দিনই ব্রাহ্মণীর গঙ্গালাভ হয়। অতি যত্ন সহকারে, শোক ভুলিয়া উমাচরণ সৎকার করিল। পাছে কোনরূপ অনিয়ম হয়, সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ঠিক হইয়াছে কিনা!" পরে অতি কঠোর নিয়ম পালন পূর্ব্বক অশৌচ অতিক্রম করিল। অতি শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। শ্রদ্ধা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য! এতদিন বাগ্দিনীর কোন সংবাদ ছিল না, কিন্তু গঙ্গাতীর হইতে বরাবর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত দিন দিন সংবাদ লইয়াছে। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের পর উমাচরণ সরবত পান করিয়াছে শুনিয়া, তবে পাড়া হইতে চলিয়া গেল। উমাচরণের ক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, আমার সুসন্তান!

সকলেই সেইরূপ ভাবিয়াছিল, বুঝি মাতৃবিয়োগে পরিবর্ত্তন হইল। কিন্তু দিন দিন সম্পূর্ণরূপ বিপরীত। কুপ্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ শাসন করিতে গিয়া, স্ত্রীর শেষ কথা মনে পড়ে, আর কঠোর শাসন করিতে পারেন না,—পারিবেনও না—উমাচরণ জানে। উকীল আনিয়া ভয় দেখান—ত্যাজ্যপুত্র করিবেন, উমাচরণ ভ্রুক্ষেপও করে না। ভালর মধ্যে এক সখ আছে, "ইংরাজী কথা কহিব, ইংরাজী বক্তৃতা করিব।" একজন সাহেব রাখিয়া পড়ে। সাহেব কিছু দিনেই বুঝিল, উমাচরণের পড়াশুনায় যত্ন নাই। বই পড়িয়া কিছু শিখিবে না! সুবিজ্ঞ সাহেব নানা ছলে বিদ্যা দান করিতে লাগিল, শিকার করিতে লইয়া যায়, সেখানে পক্ষী জীব জন্তুর চরিত্র বর্ণনা করিয়া শুনায়। নানাবিধ পক্ষী প্রভৃতির ছবি দেখায়, কথায় ইতিহাস বলে। কবিতা পাঠ করিয়া শুনায়, দূরবীক্ষণ দিয়া তারা দেখায়, ফটোগ্রাফ তুলিতে শেখায়। "সাহেব হইব" এই লোভে লোভে কথা কহিবার ছলে উমাচরণ শেখে। আর এরূপ দৃঢ় করিয়া সাহেব শিক্ষা দেয় যে, ভোলে না। বৈজ্ঞানিক আশ্চয্য ব্যাপার দেখিয়া বিজ্ঞানে রুচি হইল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে সাহেব যত শিখাইতে পারিলেন, তত শিখাইলেন। সাহেব দেশে গেলেন। কিছুদিনের পর চাটুয্যে মহাশয়ের মৃত্যু হইল। পুত্রের কার্য্য পূর্ব্ববৎ সুসম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু যৌবনে বিষয়প্রাপ্তির ফলও ফলিতে লাগিল। ইংরাজ সহবাসে, ইংরাজপ্রিয় আমোদে সখ, তোসামোদ সহবাসেও নীচ প্রবৃত্তি তেমনি প্রবল। একদিন বড়লোকের ছেলেরা সখে ঘোড়দৌড় করিবেন, উমাচরণ একজন সওয়ার। সেখানে দূর দর্শকের ভিতর উমাচরণ যেন বাগ্দিনীকে দেখিল। ঘোড়দৌড় জিতিয়া সঙ্গীদের সহিত মদ্যপান করিয়া টম্ টম্ হাঁকাইয়া উমাচরণ ফিরিল। হটাৎ টম্ টম্ উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। সংজ্ঞাহীন!

রাস্তার লোক তামাসা দেখিতেছে, এমন সময় এক মাগী ছুটিয়া আসিয়া কোলে করিয়া বসিল, "ওগো জল লয়ে এস, ওগো জল লয়ে এস!" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। পাশে দোকানীরা জল আনিল ও উমাচরণের মুখে দিতে লাগিল। উমাচরণ চক্ষু চাহিল। উমাচরণকে সকলেই চিনিল। চিনিবার পর আর মাগীর সেবার প্রয়োজন রহিল না। মাগীকে তাড়াইয়া দিয়া শত শত আত্মীয় ব্যক্তি উপস্থিত। সাংঘাতিক আঘাতে উমাচরণকে একমাস শয্যাগত থাকিতে হইল। পাঁচ ছয় দিন একরূপ সংজ্ঞাহীন ছিল, পাঁচ ছয় দিন মণি বাগ্দিনী জলস্পর্শও করিল না, কেহ উঠাইতেও পারিল না! শিয়রে বসিয়া রহিল। পাঠক চিনিয়াছেন, রাস্তার সে মাগী মণি বাগ্দিনী। যতদিন রুগ্ন অবস্থা, ততদিন সংবাদ লইয়া বাগ্দিনী আবার অদৃশ্য হইল।

ইংরাজী চালে বদ্মাইসি আরম্ভ করিলে, গৃহস্থের ঘরে লক্ষ্য করিলে ও কথায় কথায় বিবাদ

করিলে কুবেরের সম্পত্তিও থাকে না। নানারূপে ত ব্যয় হইয়াছে; তারপর পারিষদের ছলে এক সাজান গৃহস্থের কুমারীর প্রতি বল প্রকাশের নালিশ হওয়ায়, বিস্তর অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। কিন্তু অর্থব্যয়েও নিষ্কৃতি হইল না। ঘুষঘাষ—অর্দ্ধেক বিষয় ব্যয়েও জেলের হাতে এড়ান পাইলেন না। বলপ্রকাশ প্রমাণ হইল না বটে, কিন্তু ব্যভিচারের সাজা দুইমাস কারাবাস ও বিশ হাজার টাকা জরিমানা দণ্ড হইল। কষ্টে কাটিল!—মুক্তির দিন গাড়ীতে উঠিতেছে, দেখিলেন দূরে বাগ্‌দিনী দাঁড়াইয়া!

একবারকার রোগী আরবারকার রোঝা হয়। উমাচরণ নাবালক ছেলেদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিলেন! বেশ্যালয় আছে, মদ আছে, বরফ জল, পাখা, ফুলের মালা—তাহার মাঝে বসিয়া ধনীর সন্তানেরা একশ' টাকা লইয়া হাজার টাকা লিখিয়া দিয়া যায়। দিনকতক কাজটা একপ্রকার চলিল! এবার মিথ্যা সাক্ষীতে ধরা পড়িয়াছে। জজ সাহেব "পারজারীর" সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন, যে ছেলেকে ঠকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার একজিকিউটারেরা পুলিশে ওয়ারিণ বাহির করিবে। একজিকিউটার, ছেলের খুড়ো, বড় কড়া লোক, ভাবিয়াছিল, পরদিনেই ওয়ারিণ বাহির করিবে। হটাৎ তাহার স্ত্রী বসন্তরোগে আক্রান্তা হয়। বাড়ীতে আত্মীয় লোক বেশী নাই, কন্যা বা পুত্রবধূ নাই, দুরন্ত রোগের ভয়ে দাস দাসীরা কাছে ঘেঁসে না। এমন সময় একটী চাকরাণী পাওয়া গেল। চাকরাণী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, সেবা করিতে লাগিল। তাহার যত্নে একজিকিউটারের স্ত্রী জীবিতা হইলেন। দাসীর প্রতি গৃহস্বামী পরম সন্তুষ্ট, যাহা চায় দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। দাসীও বাড়ী যাইব বলিতেছে। কর্ত্তা গৃহিনীকে বলিলেন, "ও কি চায়?" গৃহিণী বড় অদ্ভুত উত্তর দিল, "ও কিছুই চায় না, তুমি কি কারও নামে পুলিশে নালিশ করিয়াছ?" কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" গৃহিণী বলিল, "মাগী বলে, ওর যা দোষ মার্জ্জনা কর।" কর্ত্তা মাগীকে ডাকাইলেন, "ও তোর কে? তুই কেন মার্জ্জনা চাস্?" মাগী কেবল, "মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর!" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কর্ত্তা ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকিয়া উত্তর করিলেন, "ভাল আমি মার্জ্জনা করিলাম, কিন্তু ও তো ঐরূপ কার্য্যই করিয়া বেড়াইবে, তার উপায় কি করবি?" মাগী বলিল, "আপনি এবার মার্জ্জনা করুন, আমি তার উপায় করিব।"

সহরে ধূম পড়িয়াছে, বড় জুয়াচ্চোরী মকদ্দমা! যে বাড়ীতে খপরের কাগজ নেয়—সে বাড়ীতে ভিড়! "পারজারীর" দাবীতে উমাচরণের নামে মকদ্দমা চলিতেছে, কেহ জামীন হয় নাই, নিশ্চয় সেসান হইবে, সাত বৎসর কেহই ছাড়াইতে পারিবে না! তারিণী চাটুয্যের অনুরোধে অনেকেই একজিকিউটারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণের ছেলেকে এবার মার্জ্জনা করুন।" একজিকিউটার কাহারও কথা শুনেন নাই। মকদ্দমার শেষদিন! ম্যাজিষ্ট্রেট সেসান সুপারদ্দ করিবেন স্থির করিয়াছেন। আসামীকে হাজত হইতে আনা হইয়াছে; বাদী উপস্থিত নাই! সে দিন মকদ্দমা স্থগিত রাখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ভাবিলেন, মহারাণীর উকীলের দ্বারা মকদ্দমা চালাইবেন। হটাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী গাড়ীতে আসিয়াছেন! তাড়াতাড়ি কার্য্য সারিয়া, চিঠি না লিখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মেমের গাড়ীতে উঠিলেন। সে সময় মেম আসিবার কথা নয়

[ক্রমশঃ

দিব্য বাণী

সাম্রাজ্যসৌখ্যং তৃণবদ্ বিহায়
সন্ধারয়ংশ্চীবরচিহ্নবেশম্।
নিনিন্দ বেদং পশুঘাতনং যো
দয়াময়ং তং প্রণতোঽস্মি বুদ্ধম্॥

—দশাবতারস্তোত্রম, ৯

রাজ্যসুখ তৃণসম ত্যজি যিনি চীরবেশ
করিলা ধারণ,
নিন্দিলেন বেদবাদে, কর্মকাণ্ডে যজ্ঞাদিতে
পশুর ঘাতন
নমি আমি দয়াময় সেই বুদ্ধ-শ্রীচরণে
পতিত-পাবন।

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব

কথামৃতের পঞ্চমভাগে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন: 'বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি, তিনি দশাবতারের ভিতর একজন। ব্রহ্ম অচল অটল নিষ্ক্রিয় বোধস্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধ-স্বরূপে লয় হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়। ন্যাঙটা বলতো, মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধস্বরূপে।'

—কয়টিই বা কথা! কিন্তু এই কথা কয়টিতেই বিস্তর কথা আছে। ল্যাটিন ভাষায় একটি উক্তি আছে: 'multum in parvo', অর্থাৎ 'অল্পের মধ্যে অনেক'। বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর্যুক্ত কথাগুলি এই উক্তির একটি অনন্যসাধারণ নিদর্শন। তাঁহার ঐ কথাগুলিকে উপজীব্য করিয়া দার্শনিকগণ অবশ্যই কয়েক খণ্ড গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবেন। আমরাও হয়তো একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিতাম, কিন্তু স্থানাভাব—প্রয়োজনও নাই। অতএব সংক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কথাগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করিব। কথাগুলির বিশ্লেষণ করিলে তিনটি মুখ্য বিষয় আমরা পাই: (১) বুদ্ধদেবের অবতারত্ব, (২) বুদ্ধত্ব ও (৩) শংকরাচার্য-প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদী দশনামী সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত বনাম বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত। আমরা এই তিনটি বিষয় যথাক্রমে উপস্থাপিত করিতেছি।

(১) বুদ্ধদেবের অবতারত্ব: বুদ্ধদেব 'দশাবতারের ভিতর একজন।'

দশাবতারের উল্লেখ আছে বরাহপুরাণে: মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী। এখানে বুদ্ধদেবকে আমরা নবম অবতাররূপে পাই। জয়দেবের গীতগোবিন্দেও দশাবতারের কথা আছে এবং সেখানেও বুদ্ধদেবকে নবম অবতার বলা হইয়াছে। পার্থক্য শুধু এই যে, অষ্টম অবতার কৃষ্ণের স্থলে বলরামকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। গীত-গোবিন্দে বর্ণিত দশাবতারে কৃষ্ণের নাম নাই, কারণ কৃষ্ণই দশ অবতাররূপ ধারণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে, কলিযুগ আরম্ভ হইলে বুদ্ধদেব একবিংশ অবতাররূপে বিগ্রহবান হইবেন। মৎস্যপুরাণেও বুদ্ধদেবকে অবতার বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যদিও বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত হইয়া ভারতে-তর দেশে বিপুলভাবে প্রসারলাভ করিয়াছিল, ভারতবাসী বুদ্ধদেবকে কখনও ত্যাগ করে নাই—তাঁহাকে অবতাররূপে পূজাই করিয়াছে। এমনকি বৌদ্ধধর্মও ভারতে রূপান্তরিত হইয়া অনেকাংশে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। কিন্তু উহা অন্য প্রসঙ্গ—এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

লীলাপ্রসঙ্গে সাধকভাবের শেষ অধ্যায়ে স্বামী সারদানন্দজী লিখিয়াছেন: 'পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান যাবতীয় ধর্মমতসকলে সিদ্ধ হইতে দেখিয়া পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কিরূপ ধারণা ছিল। সেজন্য ঐ বিষয়ে আমাদের যাহা জানা আছে তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা ভাল। ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে ঠাকুর হিন্দু-সাধারণে যেমন বিশ্বাস করিয়া থাকে সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন; অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধদেবকে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া শ্রদ্ধা ও পূজা সর্বকাল অর্পণ করিতেন এবং পুরীধামস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলভদ্ররূপ ত্রিরত্নমূর্তিতে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের প্রকাশ অদ্যাপি বর্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।'

স্বামী সারদানন্দজীর মতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব

যোগদৃষ্টিসহায়েই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অবতার।

কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে বুদ্ধদেবের মনে তাঁহার অতীত পাঁচশত[১] জীবনের স্মৃতি জাগরিত হইয়াছিল। এই পাঁচ শত জীবনের কাহিনী জাতকের উপাখ্যানগুলিতে বিবৃত। উপাখ্যানগুলিতে দেখান হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব বিবর্তনের ফলেই অন্তিম জন্মে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। প্রচলিত অবতারবাদে কিন্তু বিবর্তনের স্থান নাই। ঈশ্বর স্বাভাবিক জ্ঞানৈশ্বর্যবলবীর্যাদির দ্বারা সদাসম্পূর্ণ। যুগপ্রয়োজনে তিনি অবতীর্ণ হন। যুগপ্রয়োজনে তাঁহার প্রকাশের তারতম্য থাকিতে পারে, কিন্তু সর্বাবস্থায় তিনি পরিপূর্ণ ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহেন। তিনি মায়াধীশ, তাঁহার দেহধারণ মায়াধীন জীবের ন্যায় কর্মপরতন্ত্র নহে। অতএব জাতকের উপাখ্যানগুলি বহু পৌরাণিক কাহিনীর ন্যায়ই শিক্ষামূলক, কিন্তু বাস্তবতা-ভিত্তিক নহে, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু লোক-প্রচলিত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই বুদ্ধদেবকে অবতার বলিতেন না, তিনি অভ্রান্ত যোগদৃষ্টিসহায়েই উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কালী তপস্বী (ভাবী স্বামী অভেদানন্দ) তাঁহার নিকট বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ তুলিলে, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, 'বুদ্ধদেব অবতার, তাঁর সঙ্গে কি ধরা। বড় ঘরের বড় কথা।'

যোগদৃষ্টিসহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুদ্ধদেবের কিরূপ দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আমরা গ্রন্থে পাই না। তবে কথামৃতে পাওয়া যায়, নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়া হইতে কাশীপুরে ফিরিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অসুস্থাবস্থায় ইঙ্গিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কি, মাথায় ঝুঁটি?' নরেন্দ্রনাথ উত্তর দিতেছেন, 'আজ্ঞা না, রুদ্রাক্ষের মালা অনেক জড় করলে যা হয়, সেই রকম মাথায়।' মাথায় ঝুঁটির কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেন উল্লেখ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তবে লীলাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদা যীশুর শারীরিক গঠন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন যে, যীশুর নাসিকা টিকালো ছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'কিন্তু আমি দেখিয়াছি তাঁহার নাক একটু চাপা। কেন ঐরূপ দেখিয়াছিলাম কে জানে!' বাস্তবিক ইহার বহুকাল পূর্বে পঞ্চবটীতলে বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যীশুর যে দিব্য মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 'একটু চাপা' নাকই দেখিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দজী লিখিয়াছেন, 'ঠাকুরের শরীররক্ষার কিছুকাল পরে জানিতে পারিলাম, ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে তিন প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং উহার মধ্যে একটিতে তাঁহার নাসিকা চাপা ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে।' এইভাবে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগদৃষ্টিসহায়ে যে সকল দিব্য দর্শন লাভ করিতেন তাহা অভ্রান্ত। বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপভাবে 'মাথায় ঝুঁটি' দর্শন করিয়াছিলেন কিনা কে বলিবে!

আরেকটি কথা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, 'বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি।' ইহা কাশীপুরে ২৪শে মে, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ইহার সাত মাস পূর্বে ২৩শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, আমরা দেখি শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরীশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'বুদ্ধচরিত' নাটক শ্রবণ করিতেছেন এবং নাটকের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দিব্য দর্শন উপস্থিত হইয়াছে। 'বুদ্ধদেবের

১ "According to Pāli 'Jātaka-Atthakathā' collected by Fausböll, the number of re-births which Gotama Buddha passed through as Bodhisatta is 550. This being a round number the actual number of stories in the collection comes to only 547..."—De, Gokuldas; *Significance And Importance of Jātakas*, Cal, Univ. 1951, p. 2.

কথা অনেক শুনেছি'—এই উক্তিটি মুখ্যতঃ 'বুদ্ধচরিত'—শ্রবণবিষয়ক কি না তাহা গবেষণার বিষয়। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব গ্রন্থাদি না পড়িলেও অসংখ্য বিদগ্ধ ব্যক্তির আলোচনা, শাস্ত্রার্থবিচার ইত্যাদি বহুল পরিমাণে শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাধারণ্যে এই ধারণা প্রচলিত যে, তিনি অশিক্ষিত ছিলেন, ইহা সর্বৈব ভিত্তিহীন। তিনি কিছু পড়েন নাই, কেহ এই অনুযোগ করিলে, তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন, 'ওগো, আমি শুনেছি কত।' তিনি আরও বলিতেন, 'পড়ার চেয়ে শোনা ভাল।' আর তিনি প্রথম শ্রেণীর শ্রুতিধরও ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ত্রিশ বৎসর থাকাকালীন বুদ্ধদেব সম্বন্ধে অনেক কিছু শোনা অস্বাভাবিক নহে। ঐ কালে যদি তাহা নাও শুনিয়া থাকেন তাহা হইলেও কথামৃতেই আমরা চারিটি দিনে—২৩শে অক্টোবর ১৮৮৫ (শ্যামপুকুর), ৯ই ও ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬ (কাশীপুর) ও ২৪শে মে ১৮৮৬ (কাশীপুর)—যে বুদ্ধ-প্রসঙ্গ পাই, তাহা পুংখানুপুংখরূপে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেবের কথা এই সাত মাসে তিনি অনেক শুনিয়াছিলেন, কারণ ঐ প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট একাধিকবার বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত হইয়াছিল।

(২) বুদ্ধত্ব: 'ব্রহ্ম অচল অটল নিষ্ক্রিয় বোধস্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধ-স্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়।' কথামৃতের অন্যত্রও পাওয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, 'বুদ্ধ কি জান? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে তাই হওয়া;—বোধ-স্বরূপ হওয়া।'

কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে, যে অবস্থায় মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপারশূন্য হয় এবং বুদ্ধিও স্বকার্যে ব্যাপৃত থাকে না, সেই অবস্থাকেই জ্ঞানিগণ উত্তম গতি বলিয়া থাকেন। ঐ উপনিষদেই অন্যত্র বলা হইয়াছে, সর্বভূতে নিগূঢ় এই আত্মা অপ্রকাশিত, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পুরুষগণ একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিসহায়ে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন। গীতাতেও আত্যন্তিক সুখস্বরূপ সেই বস্তুকে 'বুদ্ধিগ্রাহ্য' বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, ব্রহ্ম বা আত্মা, বা যে নামই আমরা দিই না কেন, সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে যাহা একমাত্র নিত্য বস্তু, তাহা শুদ্ধা বুদ্ধির দ্বারাই লভ্য। সেই বস্তু চিন্তা করিতে করিতে স্বচ্ছ বুদ্ধি ক্রমশঃ তদাকারে আকারিত হইয়া যায়। তাহাকেই বুদ্ধির লয় বলা হয় এবং উহাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে 'বুদ্ধত্ব'। জীব সাধনবলে ও ঈশ্বরানুগ্রহে 'তপঃপ্রভাবাদ্ দেবপ্রসাদাচ্চ'—সেই বস্তুকে জানিতে পারে এবং 'বুদ্ধত্ব' লাভ করে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে জীবে ও গৌতম বুদ্ধে প্রভেদ কোথায়? ইহার উত্তর: প্রভেদ শক্তিতে—জ্ঞান-স্বরূপতায় নহে, বুদ্ধত্বে নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়: সেখানে সব শিয়ালের এক রা।

(৩) অদ্বৈতবেদান্তীর সিদ্ধান্ত বনাম বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত: 'ন্যাংটা বলতো, মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধস্বরূপে।'

এই বিষয়টি পূর্বেই অনেকাংশে আলোচিত হইয়াছে। চিরচঞ্চল সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে লয় পায় এবং বুদ্ধিও জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে লীন হয়—ন্যাংটা, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসগুরু শঙ্করপন্থী তোতাপুরী এই কথা বলিতেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে অদ্বৈতবেদান্তীর ব্রহ্মজ্ঞান ও বুদ্ধের বুদ্ধত্ব একই জিনিস—অদ্বৈতবেদান্তের 'ব্রহ্ম' ও বৌদ্ধরা যে বস্তুকে 'নির্বাণ' অবস্থা বলে তাহা একই পদার্থ। লীলাপ্রসঙ্গকার পরিষ্কার লিখিয়াছেন, মহাকবি গিরিশচন্দ্র রচিত বুদ্ধচরিত নাটক শ্রবণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, 'শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবর্তিত মতে ও বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই।' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষাধারায় পরিশীলিত লীলাপ্রসঙ্গকার

লিখিয়াছেন, 'ভগবান বুদ্ধ যাহাকে সর্বভাবের নির্বাণভূমি শূন্য বস্তু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ভগবান শংকর তাহাকেই সর্বভাবের মিলনভূমি পূর্ণবস্তু বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।'

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে একদিকে বৈদিক যাগযজ্ঞের আতিশয্য—উদগ্র কামনাবাসনার পূর্তির জন্য এক একটি যজ্ঞে শত শত পশুর প্রাণ-নাশ, অন্যদিকে তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কিছু সংখ্যক লোকের ঔপনিষদ-চিন্তা—অরণ্যবাসী হইয়া দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া নিরন্তর বিচার-বিমর্শ, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। বুদ্ধদেব দেখিলেন, এই দুই মার্গের কোনটিতেই জনসাধারণের কল্যাণ নাই। এইজন্য তিনি অষ্টাঙ্গমার্গের প্রবর্তন করিলেন। মানুষ যদি নীতিপরায়ণ, সচ্চরিত্র, পবিত্রস্বভাব হয়, তাহা হইলে তত্ত্ব আপনা হইতেই জানিতে পারিবে। সুতরাং আত্মা ও ঈশ্বর সম্পর্কিত কূট-তর্ক লইয়া তিনি জনসাধারণকে বিব্রত করিলেন না। তিনি ঐ ব্যাপারে নীরব রহিলেন। ফলে পরবর্তী কালে তিনি নাস্তিক আখ্যা পাইলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, 'নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই। ···নাস্তিক কেন হতে যাবে!···অস্তি নাস্তি প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক, সেখানে অস্তি নাস্তি ছাড়া।'

একদিকে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন, 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ।' ,অন্যদিকে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিতেছেন, 'অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ।' যদিও আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'অসৎ-কে 'শূন্য' বলিয়া ব্যাখ্যা করি না, শূন্যবাদী বৌদ্ধরা এই বাক্যে নিশ্চয়ই তাঁহাদের মতের সমর্থন পাইবেন। কিন্তু 'সৎ' বা 'অসৎ' সম্পর্কিত এই সমস্ত বিচারই প্রকৃতির ব্যাপার—মায়ার ব্যাপার। 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি।' এই সকল বিচার-বিমর্শ নির্মায় ব্রহ্মবস্তুকে স্পর্শও করে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন: (ব্রহ্ম) 'অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না।' 'ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে; বেদ পুরাণ তন্ত্র ষড়্‌দর্শন—সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।'

হে প্রবুদ্ধ! দেহ প্রজ্ঞা—

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

অবিদ্যার মোহে মূঢ় অগ্নি-গৃহে বসে'—
করিতেছে শিশু ক্রীড়া কেঁদে' আর হেসে'।
নাহি জানে যেই অগ্নি জ্বলে লেলিহান—
তাহার করাল গ্রাসে হারাইবে প্রাণ।
অজ্ঞান সন্তানে হেরি মৃত্যু-ক্রীড়া-রত
উদ্বেগ আকুতিভরে ডাকিছ নিয়ত
উদ্ধারিতে তারে। তথাপি অবোধ মুগ্ধ
নাহি জাগে ডাকে তব হে সম্যা-সম্বুদ্ধ!

আপন প্রজ্ঞায় জাগি' জাগাতে জগতে,
দেখাইলে আর্য-সত্য অষ্টাঙ্গিক মতে।
তৃষ্ণা হ'তে ভব আর দুঃখ-ব্যাধি-জরা—
মান-অপমান-মৃত্যু পুনর্জন্ম-ধারা।
কামনার অগ্নি মোরে ঘিরে লেলিহান—
হে প্রবুদ্ধ! দেহ প্রজ্ঞা করহ নির্বাণ।

স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য বিনোদেশ্বর দাশগুপ্তকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

The Ramkrishna Math
Belur P. O. Howrah
Dated, the 22.8.1916

কল্যাণবরেষু

বিনোদ, তোমার পত্রে ভুবনবাবুর মৃত্যু সংবাদে দুঃখিত হইলাম। মৃত্যু অপেক্ষা সত্য ব্যাপার জগতে আর কিছুই নাই। এই মৃত্যু-অতিক্রম জন্যই শাস্ত্র সাধুসঙ্গ উপদেশ কচ্ছেন, আর উপদেশ কেবল শুনিলে হবে না, আচরণ করা চাই। আহা! ভুবনবাবু আমাকে কতই ভালবাসিতেন। যে এজীবনে একবার ঠাকুরের নাম নেবে সেই প্রভুর ধামে পৌঁছাবে এতে সন্দেহ কর্ব্বে না। তোমরা ত নিত্য প্রভুর পূজা কচ্ছ তোমাদের কোন ভাবনা নাই। জানবে তোমরা সব ঠাকুরের আর ঠাকুরও তোমাদের নিত্য ধন।

পুত্রশোকে তোমার মাতাঠাকুরাণী ত কাতর হবেনই। কিন্তু কৃপাসিন্ধুর দয়ায় সব দূর হয়ে যাবে। তাঁকে ঠাকুরের পুঁথি শুনাবে। ঠাকুর হচ্ছেন খুঁটি, উহা ধরে ঘুরতে পাল্লেই মানুষ অমর হবে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়, কামিনীবাবু, ভূপতিবাবু প্রভৃতি ভক্তদের আমার সাদর সম্ভাষণ ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাবে এবং তুমি জানিবে। মহারাজ বাঙ্গালোরে ভাল আছেন। এখানকার কুশল জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

No. 57 Ramkanta Bose's St.
Bagh Bazar, Calcutta
29th October '17

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার ২২শে অক্টোবরের পত্র পাইয়াছি। আশা করি ঢাকা মঠে ৺পূজার সময় বেশ আনন্দ হইয়াছিল। এবার মঠেও পূজার সময় অনেক ভক্ত সমাগম হইয়াছিল। পূজনীয় হরি মহারাজ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছেন, আবার পায়ের চেটোয় একটি operation হইয়াছে। ডাক্তারের মত হইলেই তাঁহাকে কলিকাতায় আনিবার চেষ্টা হইবে। অত্রস্থ সমস্ত কুশল।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপ্রেমানন্দ

ঈশোপনিষদ্ অনুধ্যান

স্বামী নিরাময়ানন্দ

মনীষার আলোকে

'ঈশ্বরভাবের দ্বারা এই জগতের সব কিছু আচ্ছাদিত কর' তারপর 'ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর।' প্রথমাংশ না হয় কোন প্রকারে বুঝিলাম, কিন্তু দ্বিতীয়াংশ? ত্যাগের দ্বারা ভোগ—সে আবার কি রকম? এইখানেই বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিবার অবকাশ পাইয়াছেন—নিজ নিজ বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি অনুযায়ী। উচ্চাবচ বিচার না করিয়া ঈশোপ-নিষদের ক্রমবর্ধমান পাঠকপাঠিকাদের সম্মুখে সেগুলি তুলিয়া ধরিতেছি, ক্রমশঃ তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন—এইগুলির মধ্যে স্তরভেদ আছে, মনের এক এক স্তরে এক এক প্রকার অর্থের প্রকাশ, এইগুলির মধ্যে আমরা নিজেদেরই মনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই; কোনটি বর্তমানের, কোনটি অতীতের, কোনটি বা ভবিষ্যতের। যেটি আজ সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছি, সেটি দ্বারাই আমার মনের বর্তমান অবস্থা ধরা পড়িতেছে। অন্যগুলি—হয় আমি অতিক্রম করিয়াছি, না হয় ভবিষ্যতে করিব। কোনটি ভুল বলিয়া এখনই ফেলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

প্রাচীনকালের মনীষীদের বক্তব্য উপনিষদের ভাষ্য ও তাহার টীকাতেই নিবদ্ধ; এবং অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত—প্রধানতঃ এই ত্রিবিধবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আধুনিক কালের মনীষীরা জোর গলায় স্বাধীন চিন্তার কথা বলিলেও ঐ ত্রিবিধ-বাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, এবং তাঁহাদের চিন্তাধারাও কিছুটা অজ্ঞাতসারেই কোন না কোন বাদের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে, কারণ মনের চিন্তাও শরীরপ্রক্রিয়ার মতোই প্রকৃতির নিয়মানুবর্তী। অতএব এখানেও একান্ত অভিনব কিছু একটা আশা করা ঠিক নয়।

প্রথমে ধরা যাক্ রাজা রামমোহন রায়কৃত উপনিষদের বঙ্গানুবাদ। ১৮১৬ খ্রীঃ প্রকাশিত, (বর্তমানে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত)। রামমোহন ঈশোপনিষদ্ অনুবাদের ভূমিকায় লিখিতেছেন, 'এক্ষণে দশোপনিষৎ যে মূল বেদ ও যাহার ভাষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, তাহার বিবরণ সেই ভাষ্যের অনুসারেতে ভাষাতে করিবার যত্ন করা গিয়াছে।' এই উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত হইল ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ ব্যাপারে রামমোহন ভক্তিভরে আচার্য শঙ্করেরই অনুসরণ করিয়াছেন। পরে অবশ্য কি ব্রাহ্মসমাজে কি অন্যান্য বঙ্গানুবাদে, কি বিভিন্ন মনীষীদের আলোচনায় এই ধারা দেখা যায় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে ঈশোপ-নিষদের প্রথম শ্লোকটি দ্বারা অনুপ্রাণিত, ইহা তাঁহার আত্মজীবনী পাঠকমাত্রেই জানেন, রবীন্দ্রনাথও 'শান্তিনিকেতন' ভাষণে বা রচনা-মালায় বহুস্থানে উপনিষদের ভাবধারা আলোচনা করিয়াছেন,—ঈশোপনিষদের আলোচ্য অংশ সম্বন্ধে তাহার ভাবময় বক্তব্য: যে পরম ইচ্ছায় সমস্ত জগৎ বিধৃত ও চালিত, যে পরম ইচ্ছায় সূর্য চন্দ্র তারা নিয়মিত, সেই পরম ইচ্ছার দ্বারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে আচ্ছন্ন ইহা উপলব্ধি কর। সব স্পন্দিত তাঁর ইচ্ছার কম্পনে, তাঁর আনন্দের বিদ্যুতে; সেই আনন্দকে দেখ। তিনি ত্যাগ করেছেন, তাই ভোগ করছি। তিনি ত্যাগ করেছেন, তাই জীবনের উৎস দশদিকে প্রবাহিত হচ্ছে,...অজস্রধারায় সেই আনন্দ সেই প্রেম প্রবাহিত। ভোগ কর, আনন্দ কর। রবীন্দ্রনাথ

'ঈশা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'পরম ইচ্ছার দ্বারা' 'বাস্য' শব্দের অর্থ 'আচ্ছন্ন'। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা:' পদের অর্থ শব্দের অনুসরণ ততটা করে নাই, যতটা করিয়াছে ভাবের।

ঈশোপনিষদ্ প্রসঙ্গেই ত্যাগ ও ভোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরিপূরক উক্তি: এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্যে নয়। নিজেকে পূর্ণ করার জন্যই। 'ত্যাগ' মানে আংশিককে ত্যাগ, সমগ্রের জন্যে; ক্ষণিককে ত্যাগ, নিত্যের জন্যে; অহংকারকে ত্যাগ, প্রেমের জন্যে; সুখকে ত্যাগ, আনন্দের জন্যে। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়। (শা. নি. ২।৪।১৯)।

মহাত্মা গান্ধীও ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি সম্বন্ধে একাধিকবার ভাষণ দিয়াছেন—তাঁহার ভাবশিষ্য বিনোবাকে সমগ্র উপনিষদ্‌টির একটি ব্যাখ্যাও লিখিতে বলেন।

প্রথম শ্লোকের গান্ধীকৃত ব্যাখ্যার ভাবানুবাদ: এই মন্ত্রটিকে আমি এইভাবে অনুবাদ করিতে চাই: এই বিশাল বিশ্বে যাহা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। (ইহাকে) ত্যাগ কর, (ইহাকে) ভোগ কর, [অথবা] তোমরা তাহাই ভোগ কর যাহা তিনি তোমাদের দেন। অপর কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না, পৃথিবীতে যাহাকিছু আছে—বস্তুই হোক আর প্রাণীই হোক—ভগবানই সব কিছুর স্রষ্টা ও প্রভু, এবং তিনিই সব কিছু পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। মন্ত্রটির শেষ তিনটি অংশ প্রথম অংশটি হইতে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত। যদি বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং তিনিই আমাদের স্রষ্টা, তাহা হইলে ইহাও মানিতে হইবে যে আমরা এমন কিছু ভোগ করিতে পারি না যাহা তাঁহার দান নয়। আর যদি মনে রাখি যে সকলেই তাঁহার সন্তান, তাহা হইলে অন্য কাহারও ধনে লোভ করা যায় না। যদি মনে করি আমি তাঁহার অসংখ্য সৃষ্টজীবের অন্যতম, তাহা হইলে সব কিছু তাঁহার পায়ে সমর্পণ করা উচিত হইবে। ইহার অর্থ, এই ত্যাগ এক নব-জন্মের সূচনা, ইহাই যথার্থ 'দ্বিজ' হওয়া। এই ত্যাগ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় করিতে হইবে, অজ্ঞানে নয়। এই ত্যাগ আমাদের জীবনে নবীনতা আনয়ন করে। (হরিজন ১৯৩৭)।

এবার আমরা এ বিষয়ে দার্শনিক মনীষী শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারা অনুসরণ করিতেছি। তিনি ইংরেজীতে ঈশোপনিষদের একটি ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন (Isha Upanishad)। সেখানে প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা: 'শংকর বলেন শুদ্ধব্রহ্ম দর্শন-দ্বারা আমাদের এই মিথ্যা বাস্তববিশ্বের অস্তিত্ব-বোধ ত্যাগ করিতে হইবে। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে এই মন্ত্রটি এই উপনিষদের অন্যান্য শিক্ষার বিরুদ্ধ হয়। এই উপনিষদ্ শিক্ষা দেয়—আপাত-বিরুদ্ধ বিষয়ের সমন্বয়—যেমন ঈশ্বর ও জগৎ, ত্যাগ ও ভোগ, কর্ম ও অন্তরের স্বাধীনতা, এক ও বহু, সত্তা ও বিকাশ, নিষ্ক্রিয় ঐশ্বরিক অব্যক্তি ও সক্রিয় ঐশ্বরিক ব্যক্তি, বিদ্যা ও অবিদ্যা, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি এবং পার্থিব জীবন ও অমরত্ব। * * *

'যখন আমরা উপলব্ধি করিব যে ঈশ্বরের দ্বারা এই চরাচর পরিব্যাপ্ত, তখন আমরা বিশ্বের সহিত ও ঈশ্বরের সহিত ঐক্য অনুভব করিব। আমরা অসীমকে পাইব, তখন আমাদের সসীম বস্তুর আকাঙ্ক্ষা দূর হইবে। ফলে আমরা বিশ্বকে ও ঈশ্বরকে অখণ্ডভাবে পাইব। আমিত্ববোধের অতীতে যাইয়া এবং পরমাত্মাকে অনুভব করিয়া আমরা সমগ্র বিশ্বকে এক বিশ্বাত্মার মধ্যে পাইব। ত্যাগবুদ্ধি না হইলে জগৎ উপভোগ সম্ভবপর হয় না।'

এবার 'ঈশাবাস্য বৃত্তি'তে বিনোবার ভাব-কাননে একটু বিচরণ করিয়া আমরা আমাদের

পরিচিত প্রশস্তপথে উঠিব। বিনোবা পণ্ডিত এবং সাধক। তিনি এই প্রথম শ্লোকের বেশ একটু নূতন রকম বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন ··· অবশ্য সেজন্য ভাবার্থে বিশেষ কিছু পার্থক্য হয় নাই।

'ঈশাবাস্যম্' পদে তিনি সন্ধি সহিত সমাস ভাঙিয়াছেন—"ঈশস্য আবাস্যম্ ইদং 'সর্বম্'—এই জগতে প্রাণী অপ্রাণী সবই ঈশ্বরের আবাসস্থান ·· এর সমানার্থক 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'। ঈশ্বরের অধিকার স্বীকার করে নিলে মনুষ্যের 'স্বামিত্ব' সহজেই দূর হয়ে যায়। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' বাক্যের দ্বারা তা বিশদ করা হয়েছে।··· এ ভোগের বিধি নয় ত্যাগের বিধি। প্রকৃতপক্ষে এ ত্যাগ ও ভোগের ভেদ মিটিয়ে দেওয়ার উপায়।··· বৈদিক সাহিত্যে 'গৃধ্' ধাতু অকর্মক··· অতএব 'মা গৃধঃ' এবং 'কস্য স্বিদ্ ধনম্ ?' এরূপ দুইটি বাক্য হওয়া সম্ভব। ইংরেজী 'greed' শব্দ এ [গৃধ্] থেকে তৈয়ারী হয়েছে। 'গৃধ্' ধাতু থেকে গৃধ্র বা শকুনি শব্দও নিষ্পন্ন হয়েছে। বেদসমূহে অন্যের ধনের প্রতি লোভের বৃত্তিকে গৃধ্রবৃত্তি এই যথার্থ নাম দেওয়া হয়েছে।"

বিনোবার মতে : এই মন্ত্রে বৈদিক ধর্মের সব সার সঞ্চিত হয়ে গিয়েছে : (১) ঈশ্বরীয় অধিকার (সত্তা) স্বীকার অতএব (২) ত্যাগবৃত্তিতে জীবন যাপন করা এবং এই জন্যে (৩) অন্যের ভোগ-বৃত্তির প্রতি ঈর্ষা না করা। এই হ'ল তিন (স্বাত্মা পরাত্মা পরমাত্মা) স্তরবিশিষ্ট বৈদিক ধর্ম।

শংকরের অনুগামী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা 'উদ্বোধন' প্রকাশিত স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষদ্ গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডেই পাওয়া যাইবে। প্রকাশকের নিবেদনে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে 'শব্দার্থ ও টীকাদিতে আচার্য শংকর ও তদনুবর্তী গ্রন্থকারগণের মত অনুসরণ করা হইয়াছে।' যাঁহারা সুবিস্তীর্ণ ভাষ্য ও টীকার অরণ্যে প্রবেশ করিবেন না, করিবার সময় নাই, ইচ্ছা নাই, বা প্রয়োজনীয় সংস্কৃতভাষাজ্ঞান নাই, উপনিষদের যথাযথ অর্থ জানিবার পক্ষে এই গ্রন্থাবলী তাহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে। এই গ্রন্থ অনুসারে প্রথম শ্লোকের অর্থ : ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্যবস্তু আছে, এই সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়। (সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই—এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদনীয়)। উক্তরূপ ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে পালন কর। (বৈদিক আত্মনেপদী প্রয়োগ)।

পরবর্তী কালের পাণিনি-সূত্র 'ভুজোঽনবনে' অনুসারে ভুজ্ ধাতুর আত্মনেপদী অর্থ ভোগ করা পরস্মৈপদী অর্থ পালন করা। 'ভুঞ্জীথাঃ' আত্মনেপদী পদ, তদনুযায়ী অর্থ হয় 'ভোগ কর'; ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর,—ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থ হয় না। পুত্রধনাদিকে ত্যাগ করিয়া কেহ ভোগ করে না। পরন্তু উহাদের প্রতি আসক্তি ত্যাগ আত্মানুভূতির পরিপোষক। তৃতীয় শ্লোকে এই ভাবের সমর্থন আছে। যাহারা আত্মদর্শনের ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না, তাহারা আত্মঘাতী; যাহারা আত্মাকে পালন করে না, রক্ষা করে না, তাহারা আত্মাকে হত্যা করে, আত্মার বিনাশের অর্থাৎ অজ্ঞানময় দুর্গতির কারণ হয়।

পরিশেষে মনে প্রশ্ন ওঠে : এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বিশেষতঃ এ যুগের বেদান্তের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও প্রচারক—স্বামী বিবেকানন্দ ঈশোপনিষদ্ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন কিনা, বলিয়া থাকিলে কি বলিয়াছেন এবং কোথায় ?

স্বামীজীর জ্ঞানযোগ গ্রন্থে প্রকাশিত বক্তৃতা-মালার 'সর্ববস্তুতে ঈশ্বরদর্শন' দ্রষ্টব্য।* বক্তৃতাটিকে ঈশোপনিষদের ভাববিস্তার বলা যায় : উপনিষদের

* বাণী ও রচনা ৩য় সং, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৮
(God in Everything—a lecture delivered in London on the 27th Oct. 1896)

নিগূঢ় ভাব স্পষ্টীকরণের জন্য প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি :

"—বেদান্ত শিক্ষা দেয় জগৎকে ব্রহ্মভাবে দর্শন করিতে। বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চায় না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, এমন আর কোথাও নাই, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ 'আত্মহত্যা' নহে—নিজেকে শুকাইয়া ফেলা নহে। বেদান্তে বৈরাগ্যের অর্থ 'জগতের ব্রহ্মভাব'—জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি, উহাকে আমরা যেমন জানি, উহা যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ত্যাগ কর এবং উহার প্রকৃতস্বরূপ অবগত হও। জগৎকে ব্রহ্মভাবে দেখ—বস্তুতঃ উহা ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নহে ; এই কারণেই আমরা প্রাচীনতম উপনিষদে···দেখিতে পাই, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে।

"সমুদয় জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে—জগতে যে অশুভ দুঃখ আছে, তাহার দিকে না চাহিয়া মিছামিছি সবই 'মঙ্গলময়, সবই সুখময় বা সবই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য' —এরূপ ভ্রান্তসুখবাদ অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে ঈশ্বর দর্শন করিয়া এইভাবে আমাদিগকে 'সংসার' ত্যাগ করিতে হইবে—আর যখন সংসার ত্যাগ হয়, তখন অবশিষ্ট থাকে কি ? —ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্য কি ? তাৎপর্য এই—তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা নয় ; কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে তোমাকে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ কর —ইহার অর্থ কি ? ছেলেগুলিকে লইয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিতে হইবে—যেমন সকল দেশের নরপশুরা করিয়া থাকে ? কখনই নয় ; উহা তো পৈশাচিক কাণ্ড—উহা তো ধর্ম নয়। তবে কি [করিতে হইবে] ? সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন কর। এইরূপ সকল বস্তুতেই, জীবনে মরণে, সুখে-দুঃখে—সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ ; কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর। বেদান্ত বলে : তুমি জগৎ সম্বন্ধে যেরূপ অনুমান করিয়াছ, তাহা ত্যাগ কর ; কারণ তোমার অনুমান আংশিক অনুভূতির উপর—খুব সামান্য যুক্তির উপর—মোট কথা, তোমার নিজের দুর্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ আনুমানিক জ্ঞান ত্যাগ কর—আমরা এতদিন জগৎকে যেরূপ ভাবিতেছিলাম, এতদিন যে-জগতে আসক্ত ছিলাম, তাহা আমাদের নিজেদের সৃষ্ট মিথ্যা জগৎ মাত্র, উহা ত্যাগ কর। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, আমরা যেভাবে এতদিন জগৎকে দেখিতেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে কখনই উহার সেরূপ অস্তিত্ব ছিল না—আমরা স্বপ্নে ঐরূপ দেখিতেছিলাম—মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আমাদের ঐরূপ ভ্রম হইতেছিল, অনন্তকাল ধরিয়া সেই প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান। তিনিই সন্তান-সন্ততির ভিতরে, তিনিই স্ত্রীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে, তিনিই ভালয় মন্দে, তিনিই পাপে ও পাপীতে, তিনিই হত্যাকারীতে, তিনিই জীবনে এবং মরণেও তিনিই রহিয়াছেন।"

এইভাবে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়াই আমরা জীবনের দুঃসহ দুঃখরাশি এড়াইতে পারি। এবং ইহা তো শুধু বেদান্তের আরম্ভ। সর্বত্র ব্রহ্মানুভূতি করিয়া সর্বাবস্থায় সর্বদা ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া তবে ইহার শেষ।

এই সুসমাচারই স্বামীজী বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করিয়াছেন—বিশেষতঃ এই বক্তৃতামালায় ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকের ভাবটি যেরূপ জোরালো ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা বর্তমান সমস্যা-সংকুল যুগজীবনের দিগ্‌দর্শন। আগামীবারে সমগ্র ঈশোপনিষদের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

প্রথম পর্ব

শ্যামপুকুরের ভাড়াবাড়ী। সেখানে আনন্দকন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রোগশয্যায় শায়িত। রোগ চিকিৎসার অসাধ্য। রোগের যন্ত্রণা নিষ্ঠুর বেদনা-দায়ক—অসহ্য। আজ রোগের বাড়াবাড়ি। সেবক শশী ও রাখাল কাঁদতে থাকেন, শিশুর মত আবেগে ভালবাসায় প্রত্যাশায় কাঁদতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁদের প্রাণের প্রাণ, তাঁদের হৃদয় জুড়ে তাঁর আসন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণেরও চোখে জল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলেন: 'আহা কাঁদিস কেন? সকলের কি আর শরীর থাকে।'

সেবক নরেন্দ্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নয়নের মণি। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন: 'তাই দক্ষিণেশ্বরে চলুন—সেখানে কালী আছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসেন। মৃদু প্রতিবাদ করে বলেন: 'এখানে কি কালী নাই?'

অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যপূর্ণ ঘরোয়া জীবনের মধুর একটি দৃশ্য!

ছয় দিন পরে, ১০ই ডিসেম্বর (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত নিবেদন করেন যে, কাশীপুরে একটি উদ্যানবাটী পাওয়া গেছে, ভাড়া মাসিক ৮০৲ টাকা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'আমার জন্য ৮০৲ টাকায় বাড়ী ভাড়ায় কাজ নেই বাপু—যা থাকে কপালে—দক্ষিণেশ্বরে যাই'।[১]

তাঁর আর দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া ঘটেনি। ভক্তদের আকুল আগ্রহে তিনি শেষ পর্যন্ত কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে বাস করতে সম্মত হন। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তিনি বাস করেন আট মাস।

এখানেই অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের বেদনা-মধুর অন্ত্যলীলা অনুষ্ঠিত হয়। অবতারের প্রাণদা জীবনধারা কল্যাণময়ী হয়ে দুই তীরের প্রান্তর কিরূপে সবুজে সোনায় ফলে ফসলে ভরিয়ে দেয় এখানেই তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবতার পুরুষের জীবনচর্যার প্রতিটি ক্ষণ লোককল্যাণে উৎসর্গীকৃত। এখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমল প্রেমের বাঁধনে গড়ে ওঠে সুগঠিত ভক্তসঙ্ঘ। তার মধ্য হতে আত্মপ্রকাশ করে অগ্নিসম্ভব ত্যাগী ভক্তসঙ্ঘ—রামকৃষ্ণভাবধারা-প্রসারের প্রধান কর্মযন্ত্র। এখানেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিযোগে স্বস্বরূপে বিলীন হন, এখানেই সমাপ্তি ঘটে শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহে নরলীলাবিলাস। লৌকিক ঘটনার পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে জীবন্ত প্রাণবন্ত ভাবের আলোকস্রোত। তাই কাশীপুর উদ্যানবাটী মহাপীঠ, পুণ্যতীর্থভূমি, রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের একটি প্রধান ঘাঁটি।

শ্রীমা বলেছিলেন: 'কাশীপুর বাগান তাঁর অন্ত্যলীলার স্থান। কত তপস্যা, ধ্যান, সমাধি! তাঁর মহাসমাধির স্থান—সিদ্ধস্থান। ওখানে ধ্যান করলে সিদ্ধ হয়।' (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।১৫৪)।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। ভব-সংসারে দুঃস্থ দুঃখী মানুষের তারণের জন্যই তাঁর অবতরণ। মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্ব বিকাশে সাহায্য করে দেবশক্তি, বাধা দেয় পশুশক্তি। অবতার আসেন পশুশক্তি দমন করতে, দেবশক্তির উদ্বোধন করতে। নবজাগরণের শক্ত্যাধার অবতার। অসীম শক্তিধর তিনি। তাঁর দেহে ব্যাধি—সৃষ্টি করে বিস্ময় বিভ্রান্তি। অবিশ্বাসীর

---

১ 'শ্রীম' বা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ডায়েরী হতে গৃহীত। ডায়েরীগুলি ব্যবহার করতে দিয়ে শ্রীম'র সুযোগ্য পৌত্র শ্রীঅনিল গুপ্ত আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রীম'র মধ্যম পুত্র প্রভাসবাবু, তাঁর পুত্র অনিলবাবু।

বিশ্বাসের ভিত সন্দেহের দোলায় বিকম্পিত বিপর্যস্ত হয়, বিশ্বাসীর বিশ্বাসের খুঁটি দৃঢ়তর হয়। ঘটনাক্রম অনুসরণ করে দেখা যায়, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের প্রথমদিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম গলার বেদনা অনুভব করেন। মাসখানেকের মধ্যে দেখা যায়, কথা বেশী কইলে বা ভাব-সমাধি হলে রোগের উপসর্গ বাড়ে। বহুবাজারের রাখাল ডাক্তার গলার ভিতরে ও বাইরে লাগাবার ওষুধ ও মালিশের ব্যবস্থা করে দেন। বিশেষ ফল হয় না। ইতিমধ্যে ২৬শে মে ঠাকুর সদলবলে পাণিহাটির মহোৎসবে যোগদান করেন, ভাবোন্মত্ত হয়ে দীর্ঘকাল ধরে পথসংকীর্তনে নৃত্য করেন। প্রেমানন্দের হিল্লোলে উৎসবপ্রাঙ্গণ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। মেঘলা আকাশ, মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ে। জলকাদায় ভিজে ও অত্যধিক পরিশ্রমে রোগের প্রকোপ প্রবল হয়। একদিন পরেই স্নানযাত্রার উৎসব, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে আনন্দের মেলা বসে। ইতিমধ্যে চিকিৎসকেরা স্থির করেন রোগ—Clergyman's throat disease। ভাদ্রমাসের প্রথমদিকে একদিন ঠাকুরের কণ্ঠতালু হতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। ভাবিত সন্ত্রস্ত ভক্তেরা ঠাকুরকে কলকাতায় আনেন সুচিকিৎসার জন্য। বলরামভবনে ঠাকুরের অবস্থানকালে গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেন ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য রোহিণী। কয়েকদিন পরে ঠাকুর ৫৫ নং শ্যামপুকুর স্ট্রীটের ভাড়াবাড়ীতে ওঠেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেন। চিকিৎসার প্রথম প্রথম কিছু সুফল দেখা যায়, কিন্তু কিছুদিন পরে ব্যাধির দাপট তীব্রতর হয়ে ওঠে। কথা কওয়া কষ্টসাধ্য হয়। ভাতের মণ্ড গলাধঃকরণও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে রোগের তীব্রতা বাড়ে। জিভে ঘা, গলায় ব্যথা যন্ত্রণা, কাশি, রক্তস্রাব শরীরকে ক্রমেই দুর্বল করে ফেলে। ৪ঠা ডিসেম্বর রাত্রে কম্প দিয়ে জ্বর হয়, গলার যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে ওঠে। পরদিন ডাক্তার সরকার পরামর্শ দেন, ঠাকুরকে কলকাতার ধুলো-ধোঁয়ামিশানো হাওয়া হতে মুক্ত কোন স্থানে স্থানান্তরিত করার। সেই সময়ে ঠাকুরের স্বাস্থ্য বর্ণনা করে প্রত্যক্ষদর্শী রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন: 'পরমহংসদেবের শারীরিক অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া এক পদ চলিবার শক্তি ছিল না এবং উঠিলে ক্ষতস্থানে বেদনা উপস্থিত হইত।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ১৭১)।

'তখন অগ্রহায়ণের অর্ধেক অতীত হইয়াছে। পৌষ মাসে ঠাকুর বাটী পরিবর্তন করিতে চাহিবেন না জানিয়া ভক্তগণ এখন উঠিয়া পড়িয়া ঐরূপ বাগানবাটীর অনুসন্ধানে লাগিয়া যাইলেন এবং অনতিকালের মধ্যেই কাশীপুরস্থ মতিঝিলের উত্তরাংশ যেখানে বরাহনগর-বাজারে যাইবার বড় রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহারই সম্মুখে রাস্তার অপর (পূর্ব) পার্শ্বে অবস্থিত ৺রাণী কাত্যায়নীর জামাতা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষের উদ্যানবাটী[১] ৮০৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় ঠাকুরের বাসের জন্য ভাড়া করিয়া লইলেন।' (স্বামী

---

১ উদ্যানবাটীর সন্ধান পান রামচন্দ্র দত্ত। তিনি লিখেছেন, "তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) অভিমত হইবে, এমন বাটী কোথায়, তাহা কেহ জানে না। এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিয়া তাঁহার জনৈক সেবক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'প্রভু, কোন দিকে বাটী অনুসন্ধান করা যাইবে?' পরমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, 'আমি কি জানি?' সেবক সেসময়ে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'প্রভু, আমাদের সহিত এখনও আপনার এই ভাব! বলিয়া দিন কোন দিকে যাইব। অনর্থক ঘুরাইয়া মারিবেন না।' সেবক প্রকাশ্যে বলিলেন, 'কাশীপুর, বরাহনগর অঞ্চলে অন্বেষণ করিব?' তিনি ইঙ্গিতে আজ্ঞা দিলেন।" (জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭২)। ঠাকুরের ইঙ্গিত অনুসারে রামচন্দ্র কাশীপুরনিবাসী ভক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তীর সাহায্যে উদ্যানবাটীটি নির্বাচন করেন।

সারদানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫। পৃঃ ৩৭২)

প্রবীণ গৃহস্থভক্তেরা স্থির করেছিলেন যে তাঁরা চাঁদা তুলে উদ্যানবাটীর ভাড়া ও ঠাকুরের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার খরচপত্র চালাবেন। ঠাকুর তাঁর উদারহৃদয় ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে ডেকে বলেন, 'দেখ সুরেন্দর, এরা সব কেরানী মেরানী ছাপোষা লোক, এরা এত টাকা চাঁদা তুলতে পারবে কেন?… বাড়ীর ভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও।' সুরেন্দ্র এই আদেশলাভ করে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। তিনি উদ্যানবাটীর ছয়মাসের[১] ভাড়ার জন্য অঙ্গীকারপত্রে সই করেন। পরে ভাড়ার মেয়াদ আরও তিন মাস বাড়ান হয়।

সামনেই পৌষ মাস। তাছাড়া শ্যামপুকুরের বাড়ী ছাড়বার জন্য বাড়ীওয়ালার তাগাদা আসছিল। পঞ্জিকা দেখে স্থির করা হয় যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরদিনই বাসস্থান পরিবর্তন করবেন। পরদিন সুরেন্দ্রনাথ অঙ্গীকারপত্রে সই করেন, সেদিনই ঠাকুর যাত্রা করেন। সেদিন ছিল ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ। শুক্লাপঞ্চমী, শুক্রবার। ১১ই ডিসেম্বর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

অপরাহ্ণ আড়াইটার পর একটি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর হতে যাত্রা করেন। সঙ্গে অন্ততঃ আরও একটি গাড়ী জিনিসপত্র ও সেবকদের নিয়ে চলে। ঠাকুরের সঙ্গে যান শ্রীমাতাঠাকুরাণী, সেবক লাটু কালীপ্রসাদ বুড়োগোপাল এবং সম্ভবতঃ নরেন্দ্রনাথ ও রামচন্দ্র। মহেন্দ্রনাথ ওরফে মাষ্টারমশাই যাত্রার সময় শ্যামপুকুরের বাড়ীতে উপস্থিত থাকলেও ঠাকুরের সঙ্গে যেতে পারেননি মনে হয়।

ঘোড়ার গাড়ী এগিয়ে চলে। বাগবাজারের পুল ধরে চিৎপুর-কাশীপুরের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে। সে সময়ে কাশীপুর-চিৎপুর অপেক্ষাকৃত নির্জন পল্লী। সে সময়ে কাশীপুর-চিৎপুর অঞ্চল দক্ষিণ সুবারবন পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত এবং চিৎপুর, কাশীপুর, সিঁথি ও বেলগাছিয়া এই চারটি ওয়ার্ডে বিভক্ত। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি স্বতন্ত্র পৌরসভা 'কাশীপুর-চিৎপুর' গঠিত হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল ৪০,৭৪০, আর কলকাতার ৮,৪৭,৭৯৬। কলকাতা কর্পোরেশন কাশীপুর অঞ্চলে পরিস্রুত জল সরবরাহ করত। সরকারী চিকিৎসাব্যবস্থার মধ্যে ছিল ৪০টি শয্যাবিশিষ্ট নর্থ সুবারবন হাসপাতাল ও চিৎপুরে একটি পৌরচিকিৎসালয়। বেচাকেনার প্রধান কেন্দ্র ছিল ভেরীতলা ও বিবিবাজার।[২] অবশ্য কাশীপুর উদ্যানবাটী হতে নিকটে ছিল বরাহনগরের বাজার। বাৎসরিক মেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফুলবাগানে পাঁচদিনের মোহনমেলা ও ব্যারাকপুর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর তিন দিনের রামলীলার মেলা।[৩]　　ক্রমশঃ]

---

১ রামচন্দ্র দত্তের মতে প্রথমে তিন মাসের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়।

২ কাশীপুর চৌরাস্তার উত্তরদিকে বিবিবাজার। এ বাজার হতেও উদ্যানবাটীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা হত।

৩ (ক) Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Vol I, p. 384 & 400

(খ) L. S. S. O'malley : Bengal District Gazetteer : 24 Parganas, p. 226-7

নিঠুর লীলাময়

শ্রীশান্তশীল দাশ

জীবনখানি নিয়ে আমার
কেবল ভাঙো গড়ো,
কখনো দাও ঘন আঁধার,
আলোয় কভু ভরো ;
কাঁদাও তুমি হাসাও তুমি,
যখন খুশি হয়,
তোমার লীলা বুঝি না যে
নিঠুর লীলাময়।
জীবন সুরু করেছিলাম
কবে প্রভাত বেলা,
সেদিন থেকে দেখছি তোমার
খেয়াল-খুশি খেলা।
কেটে গেল কত না দিন
খেলার নাহি শেষ,
জানিনে হায় আর কত দিন
রইলো অবশেষ।
অবাক হয়ে দেখি কেবল
এবং কাঁদি হাসি,
আলো আঁধার দুয়ের বুকে
পুতুল হয়ে ভাসি।

মুসলীমের দৃষ্টিতে গৌতম বুদ্ধ

আলহাজ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

আজ আমরা মহামানব গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ আলোচনা করার জন্য এখানে সমবেত হয়েছি। তাঁর জীবনকে আমরা সাধারণতঃ ছুই-ভাবে আলোচনা করতে পারি। প্রথমটি, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে, অপরটি ধার্মিকের দৃষ্টিতে। ধার্মিকের দৃষ্টিতে আলোচনাও ছুই রকম হবে। এক, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর দৃষ্টিতে; ছুই, অপর ধর্মাবলম্বীর দৃষ্টিতে। অবশ্য কোন আলোচনাতেই ইতিহাসকে বাদ দেওয়া যাবে না।

আমি ইসলাম ধর্মের অনুসারী। তাই একজন মুসলীমের দৃষ্টিতে গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর শিক্ষাকে এখানে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করব। একজন মুসলমান হিসাবে আমরা মহাত্মা বুদ্ধকে ছুইভাবে দেখতে পারি। প্রথমতঃ সাধারণ ইতিহাসে এবং প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে যে রূপ দেখতে পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে এতটুকু বলা যায় যে, বুদ্ধদেব একজন দার্শনিক ছিলেন, আর তাঁর দর্শনকে কোনক্রমেই ধর্ম বলা যেতে পারে না। কেননা ধর্মের প্রাণ হল আল্লার অস্তিত্ব। প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে আল্লা বা ঈশ্বরের কোন স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআনে আছে, 'লাকাদ বায়াছনা ফিকুল্লে উম্মাতির রাছুলান, অর্থাৎ—প্রত্যেক জাতিতে নবীর আবির্ভাব হয়েছে।' অন্যত্র আছে, 'লিকুল্লে কাউমিন হাদ, অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়েই পথ-প্রদর্শকের আগমন হয়েছে।' অন্য এক জায়গায় আছে, 'ওমা আরছালনা মির রাছুলিন ইল্লা বিলিছানী কাউমিহি, অর্থাৎ -যুগে যুগে আগত এইসব নবী তাঁদের জাতীয় ভাষায় নিজ নিজ সম্প্রদায়কে শিক্ষাদান করেছেন।' বিভিন্ন দেশে ও জাতিতে আগত এইসব লক্ষ লক্ষ নবীর মধ্যে পবিত্র কোরআনে ত্রিশজন নবীর নামও উল্লেখ করা হয় নাই। আল্লা বলেন, ওয়া রাছুলান কাদ কাছাছন হুম আলাইকা মিন কাবলু ওয়া রুছু-লাল্লাম নাকছুছ হুম আলাইকা। অর্থ:—কোন কোন রছুলের সংবাদ ইতিপূর্বে প্রদান করেছি আর বহু রছুল রয়েছেন যাদের খবর আমি তোমাকে দেই নাই।' (নেছা, ৬৫)। অতএব, কোরআনের এই মহান শিক্ষা অনুযায়ী আমরা যুগে যুগে আগত সকল নবী রছুলকে মান্য করতে বাধ্য। যেহেতু পৃথিবীর সকল দেশেই নবীর আবির্ভাব হয়েছে অতএব আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এই পাক-বাংলা-ভারত উপমহা-দেশও নবীর পদস্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকে নাই। এই উপমহাদেশে যেসব মহামানব জন্ম গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ অন্যতম। যিনি দীর্ঘ আড়াই হাজার বৎসর পরও কোটি কোটি মানবের মনে শ্রদ্ধার আসনে আসীন রয়েছেন। তিনি যে শুধু একজন শুষ্ক দার্শনিক অথবা কল্পনা বিলাসী ছিলেন একথা আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারি না। নবী ছাড়া অন্য কারো ভাগ্যে এহেন সম্মান লাভ সম্ভবপর নয়। এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, তাহলে মহাত্মা গৌতম কি নবী ছিলেন? যিনি নাস্তিক ছিলেন অথবা আল্লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব ছিলেন তিনি কি করে নবী হতে পারেন? অতএব সর্বপ্রথম আমাদেরকে দেখতে হবে যে শাক্যসিংহ গৌতম আল্লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন কি না।

আমরা ইতিহাস পাঠ করে এবং বর্তমান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করে এমন একটি বাক্যও

পাই না যার দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে গৌতম বুদ্ধ আল্লায় অবিশ্বাসী ছিলেন। বরং এমন বহু প্রমাণ আমরা দেখতে পাই যার দ্বারা একথা বলা যায় যে বুদ্ধদেব স্বয়ং আল্লায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং আল্লার বাণীকেই তিনি জীবনভর প্রচার করে গিয়েছেন। কথিত আছে যে একদা কতিপয় ব্রাহ্মণের মধ্যে তাদের মত ও পথের প্রাধান্য নিয়ে তর্ক চলছিল। তাদের মধ্যে কে মানুষকে ঈশ্বর প্রাপ্তির সঠিক পথ দেখাতে পারেন তাই নিয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে এই ঝগড়া চলছিল বহুদিন ধরে। শেষ পর্যন্ত কোন মীমাংসায় উপনীত হতে না পেরে তারা ফয়সলার জন্য গিয়ে উপস্থিত হল মহাজ্ঞানী গৌতমের কাছে। মহাত্মা বুদ্ধ সবকিছু শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি ঈশ্বরকে দেখেছ?" ওরা বলল, "না।" বুদ্ধ বললেন, "তাহলে তোমাদের পিতা, পিতামহ এবং গুরুদেবরা কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" ব্রাহ্মণরা জবাব দিল, "দেখেছেন বলে ত জানি না!" তখন বুদ্ধ বললেন, "যাঁকে তোমরা দেখ নাই, তোমাদের পিতা, পিতামহরা এমন কি তোমাদের গুরুদেবরা পর্যন্ত দেখে নাই, তাঁর কাছে পৌছার পথ তোমরা কি করে অন্যকে দেখাবে?" এই ঘটনার মধ্যে অনেকে নাস্তিকতার গন্ধ আবিষ্কার করতে চান, কিন্তু আমরা দেখছি এর মধ্যে নাস্তিকতা ত দূরের কথা বরং এর মধ্যে আস্তিকতারই সুর ধ্বনিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে, ঘুমন্ত ব্যক্তি কখনও অন্যকে জাগ্রত করতে পারে না, যে অন্ধ সে অন্যকে পথ দেখাতে পারে না। তেমনি যে ঈশ্বরের সন্ধান লাভ করে নাই সে কখনও অন্যকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ দেখাতে পারে না। গৌতম ঈশ্বরকে লাভ করেছিলেন তাই সেই যুগে একমাত্র তিনিই মানুষকে ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। একথাই ইঙ্গিতে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। অপর একস্থানে তিনি বলেছিলেন, "অংথি ভিকৃথবে! অজাতম্, অভূতম্, অকতম্, অসঙ্খতম্, অর্থাৎ—হে ভিক্ষুগণ! এমন কিছু আছে যা অজাত, অভূত, অকৃত এবং অযৌগিক।" (ইতিবুত্তকম্—৪৩)। এখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় অজাত, অভূত শক্তি আল্লাতালার কথা বর্ণনা করেছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বর্তমান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি মহাত্মা গৌতমের মৃত্যুর বহু শতাব্দী পর লিপিবদ্ধ হয়। তাই এর মধ্যে বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষার কোন কোন অংশ বাদ পড়া এবং নূতন কিছুর সংযোজন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। এদিক দিয়ে সম্রাট অশোকের শিলালিপিগুলির মূল্য অনেক বেশী। কেননা অশোক বুদ্ধদেবের নিকটবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তাঁর শিক্ষাকে প্রচার এবং সংরক্ষণ করার সাধ্যমত চেষ্টা করেন। বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা সম্বলিত শিলালিপিগুলি আজো বহুস্থানে বিদ্যমান রয়েছে। জগন্নাথক্ষেত্র থেকে কুড়ি মাইল দূরে ধাওলিতে এমনি এক প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে আল্লা এবং স্বর্গের স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত প্রস্তরলিপিতে যে 'ইসানা' শব্দ রয়েছে তার অর্থ হল, ঈশ্বর, প্রভু। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে বৌদ্ধধর্মে আল্লাকে সাধারণতঃ কি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করলে আমরা জানতে পারি যে বৌদ্ধধর্মে আল্লাকে "বুদ্ধ" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বুদ্ধ অর্থ জ্ঞানী, আরবীতে যাকে বলে আলীম। আলীম আল্লাতালার অন্যতম নাম। মহাত্মা গৌতম যখন 'বোধিসত্ত্বকে' লাভ করেন তখন রূপকভাবে তিনিও বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। প্রকৃতপক্ষে পরম বুদ্ধ (আলীম) হলেন আল্লাতালা স্বয়ং। বোধিসত্ত্বকে লাভ করার পর গৌতম পরম বুদ্ধ আল্লার মজহার বা বিকাশরূপে বুদ্ধ বা আলীম নামে অভিহিত হন। আমাদের সমাজেও জ্ঞানী এবং

পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে আলীম নামে আখ্যায়িত করা হয়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা সত্যিকার আলীম নহেন। বরং মূল আলীম আল্লাতালা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে তারা রূপকভাবে আলীম নামে অভিহিত হন।

এই আলোচনার পর আমরা এখন ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কতিপয় প্রধান প্রধান শিক্ষার সাদৃশ্য আলোচনা করব। গৌতম বুদ্ধ 'মার' নামক যে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়যুক্ত হন কোরআনে তাকেই 'আমমারা' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যে নির্বাণ লাভের পথ দেখিয়েছেন আরবীতে তাকেই 'ফানা' বলা হয়। নির্বাণ পালি শব্দ, 'নি' অর্থ 'না' এবং 'বান' অর্থ কামনা। কামনার অবসান ঘটিয়ে একমাত্র পরম বুদ্ধ বা আল্লার মধ্যে 'আমিত্ব'কে হারিয়ে ফেলার নামই ফানা ফিল্লাহ্ বা পরিনির্বাণ। বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান বিষয় হল, বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের আশ্রয় লাভ। ইসলামে যাকে বলা হয় আল্লা বা উলুহিয়ত, দীন বা শরীয়ত এবং নেজাম বা জমায়াত। আল্লাকে বিশ্বাস করে শরীয়তের বিধান মেনে খিলাফতের মাধ্যমে জমাতভুক্ত হয়ে থাকাই হল ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। গৌতম বুদ্ধ যে জরা, মৃত্যু এবং ব্যাধির বিরুদ্ধে সাধনা করে জয়যুক্ত হয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল আত্মিক জরা, মৃত্যু এবং ব্যাধি। প্রত্যেক নবীই এই সব আত্মিক হীনাবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়লাভ করেন। হজরত যীশু (আঃ)ও অনুরূপ আত্মিক মৃত, অন্ধ এবং খঞ্জদেরকে জীবিত এবং সুস্থ করেছিলেন। কোরআনের ভাষায় এই সব আত্মিক ব্যাধিকে বলা হয়েছে, 'ফি কুলুবিহিম মারাজুন।' আত্মিক মৃতদের সম্বন্ধে এক জায়গায় আছে, 'ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমানুছ তাজিবুলিল্লাহি ওয়ালির রাছুলী ইজা দায়াকুম লেমা ইউহ্যিকুম। অর্থাৎ—আল্লার রছুল যখন তোমাদেরকে জীবিত করার জন্য আহ্বান করেন তোমরা তখন তাতে সাড়া দান কর।' (আনাম—২৫)। বৌদ্ধধর্ম যে পঞ্চশীল পালন করার নির্দেশ দিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ পালনের মধ্য দিয়েই সার্থকতা লাভ করতে পারে।

একং ধম্মং অতীতস্স মুসাবাদিস্স জন্তুনো,
বিতিণ্ণপরলোকস্স নত্থি পাপং অকারিয়ং।
(ধম্মপদ)।

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি একমাত্র সত্য ভাষণ ধর্মকে পরিত্যাগ করে, মিথ্যা ভাষণ দান করে এবং পরলোক বিশ্বাস করে না সেই ব্যক্তির অকরণীয় পাপ কিছুই নাই। ইসলাম ধর্মেও মিথ্যা বলা এবং পরকালে অবিশ্বাস করাকে মহাপাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরকালে যদি কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করার ভয় না থাকে তাহলে মানুষের পক্ষে সব কিছু করাই সম্ভব। তাছাড়া একমাত্র মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করলে সমস্ত পাপ কর্ম থেকেই মানুষ রক্ষা পেতে পারে। অন্যত্র আছে,—সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা যে নিজেকে জয় করতে পেরেছে। (ধম্মপদ)। হাদিছে আছে, 'ইন্নামাশ শাদিতুল্লাজি ইয়ামলেকু নাফছাহু ইন্দাল গাজ্বাবা। অর্থাৎ—সেই উৎকৃষ্ট পাহ্‌লোয়ান যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে।' অন্যত্র আছে, 'নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রামই সব চাইতে বড় জেহাদ।' বৌদ্ধরা প্রার্থনাকালে এই বাক্যটি তিনবার পাঠ করে থাকেন। যথা,

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স

অর্থ : পবিত্র মহাজ্ঞানী প্রভুর প্রশংসা হোক। অনুরূপ মুসলমানরাও প্রতিদিন 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' বা সকল প্রশংসাই বিশ্ব প্রভু আল্লার। তাছাড়া, 'ছুবহানা রাব্বিয়েল আলা' বা মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করি, এই বাক্যও প্রতিদিন প্রার্থনাকালে তিনবার করে

পাঠ করে থাকেন। ইসলাম যুগে যুগে আগত নবীদের শিক্ষার এবং উপাসনার বিভিন্ন অংশকে গ্রহণ করেছে। নামাজের মধ্যে দুনিয়ার সকল জাতির উপাসনার এবং সম্মান প্রদর্শনের রীতি পদ্ধতি সন্নিবেশিত হয়েছে। রোজা, হজ্জ্ ইত্যাদিও পূর্ববর্তী নবীদের সুন্নত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। গৌতমের যে কাল্পনিক ছবিটি বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায় তাতে তাঁকে যে ধরণের পোষাক পরিহিত দেখি এবং যার অনুকরণে ভিক্ষুরা সাধারণতঃ যে পোষাক পরিধান করে থাকেন ঠিক তদ্রূপ পোষাক মুসলমানরা হজ্জ্ উপলক্ষে এহরাম কালে পরিধান করে থাকেন। এহরাম অবস্থায় কোন প্রাণী হত্যা না করা, পত্র ছিন্ন না করা, এমন কি সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার না করারও বিধান রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান বৌদ্ধধর্মে সর্বাবস্থায় প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং শুধু ভিক্ষুদের বেলায় (যারা এহরামের ন্যায় জীবন যাপন করেন) বৃক্ষপত্র ছিন্ন না করা ও সুগন্ধি ব্যবহার না করারও শীল প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ অবস্থায় যে যে বিধান পালন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল আজ তা ধর্মের সার্বক্ষণিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে গিয়েছে। কালের প্রবাহে এবং ভক্তদের দ্বারা চিরদিনই এ ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে।

এতক্ষণ আমরা যে সব আলোচনা করলাম তাতে গৌতম বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে। আমরা দেখেছি যে তাঁর শিক্ষা ইসলামের বিরোধী ছিল না, বরং ইসলামের মহান শিক্ষাকেই হজরত বুদ্ধ সারা জীবন প্রচার করে গিয়েছেন। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে হজরত গৌতম বুদ্ধ খোদা প্রেরিত এক মহান নবী ও রসুল ছিলেন। শেষ করার আগে বলি,—

দুল্লভো পুরিসাজঞ্ঞো ন সো সব্বত্থ জায়তি,
যত্থ সো জায়তি ধীরো তং কুলং সুখমেধতি।

অর্থাৎ বুদ্ধের ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্লভ। এ ধরণের মহাপুরুষ সর্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি বা তাঁর ন্যায় ব্যক্তি যেখানে জন্মগ্রহণ করেন সেই কুলের সৌভাগ্য বর্ধিত হয়। (ধম্মপদ)।*

* ২৫১৭তম বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে বাংলাদেশ (ময়মনসিংহ) কৃষি বিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ছাত্র-শিক্ষক বর্তৃক আয়োজিত আলোচনা-সভায় প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ।

ত্যাগ ও তাহার আদর্শ

শ্রীসুনীলকুমার দত্ত

এই পুরাতন পৃথিবীতে ও পরিবর্তনশীল সংসারে, সুদূর অতীত হইতে বর্তমান পর্যন্ত, আদিম কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত, কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য সর্বত্র ত্যাগের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। ত্যাগের জয়গাথা সর্বধর্মে বিদ্যমান ও স্বীকৃত। আজ পর্যন্ত যত মনীষী বরেণ্য ও শরণ্য হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ত্যাগের পথের দিশারী। ত্যাগকে সম্বল করিয়াই তাঁহারা নিজেদের স্থান মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ত্যাগই একমাত্র প্রাথমিক ও অপরিহার্য বস্তু যাহা আমাদিগকে আমাদের অবর সত্তা হইতে উর্ধ্ব সত্তায় লইয়া যাইতে পারে।

ত্যাগ মূলতঃ মানব প্রকৃতির সত্ত্ব গুণ হইতে উৎপন্ন। তবে ত্যাগের প্রকার ভেদে ইহা রাজসিক বা তামসিকও হইতে পারে। আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হইয়া মানব-কল্যাণে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ সাত্ত্বিক ত্যাগ। যেরূপ সিদ্ধার্থের ত্যাগ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক মনীষীদের ত্যাগ। নিজের দেশের কল্যাণে ব্রতী সংসারীর যে সংসার ত্যাগ, বা সাংসারিক মানুষদের নিজেদের পরিবারের জন্য যে ত্যাগ, আবার অনেক সময় মানব কল্যাণের জন্য যে আর্থিক ত্যাগ বা শ্রম ত্যাগ আমরা স্বীকার করিয়া থাকি তাহা সাধারণতঃ রাজসিক ত্যাগ। কারণ ইহাতে যে কারণে বা যাহাদের জন্য ত্যাগ করা হইয়া থাকে তাহাদের প্রতি আসক্তি থাকিবার সম্ভাবনা থাকে এবং অনেকক্ষেত্রে এরূপ ত্যাগ আমাদের অহং-বোধ হইতে আসিয়া থাকে। আবার আলস্য, ভয়, বিরক্তি, অজ্ঞানতা ও জড়তার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া যে কর্মত্যাগ করা হয় তাহা তামসিক ত্যাগ। তাই আমাদের সর্বদা সযত্নে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন আমাদের ত্যাগ তামসিক ত্যাগ না হয়। (তুলনীয়: শ্রীঅরবিন্দের যোগসমন্বয়, পৃঃ ৩১৮, গীতা-নিবন্ধ, পৃঃ ৫০০)।'

অহং-বোধ হইতে যে ত্যাগ করা হয় তাহা ত্যাগের মূলগত ভাব নহে। সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণায় বিহ্বল হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া যে সংসার বা কর্মত্যাগ করা হয় তাহাও ত্যাগের আদর্শ হইতে পারে না। তবে প্রকৃত ত্যাগ কি? নিজেদের অবর সত্তার ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। অর্থাৎ কামনা বাসনা অহং-এর ত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা ও ত্যাগের আদর্শ। স্বার্থহীন ত্যাগ বা নিষ্কাম ত্যাগ বলিতে আমরা যে ত্যাগ বুঝি তাহার প্রধান অন্তরায় এই কামনা ও বাসনা এবং অহং। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন:

'বস্তুতঃ লোকে যখন ত্যাগের কথা, বৈরাগ্যের কথা বলে তখন ঐ কথার দ্বারা তাহারা সংসার ত্যাগই বুঝে, অন্ততঃ ইহারই উপরে তাহারা জোর দেয়, কিন্তু গীতার মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তদনুসারে ত্যাগের ভিত্তি হইতেছে কর্ম এবং সাংসারিক জীবন; মঠে, গুহায় বা শৈলশিখরে পলায়ন করা নহে। প্রকৃত ত্যাগ হইতেছে কামনাশূন্য হইয়া কর্ম করা এবং তাহাই প্রকৃত সন্ন্যাস।' (গীতা-নিবন্ধ, পৃঃ ৪৯৮)।

ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কামনা বাসনা অহং-এর ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ এবং ইহার জন্য সংসার বা কর্মত্যাগের প্রয়োজন করে না এবং ইহা আমরা সংসারে থাকিয়াই করিতে পারি। তবে প্রশ্ন হইতেছে কর্ম করিলেই প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী তাহার ফলও আছে, আবার ফল থাকিলে বন্ধনের, আসক্তির ভয় আছে। এই

সমস্যার সমাধান গীতা যথাযথ ভাবে করিয়া দিয়াছে।

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥'

(গীতা, ২।৪৭)।

আর ইহা করিবার উপায় ঐ ত্যাগ অর্থাৎ কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ। কারণ, 'ফলকামনাই জীবের বন্ধনের সর্বাপেক্ষা প্রবল কারণ এবং ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া জীব কর্মের মধ্যেও মুক্ত থাকিতে পারে।' (গীতা-নিবন্ধ, পৃঃ ৪৩৩)। এই কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে তখনই সম্ভব হইবে যখন আমরা আমাদের কর্ম, কর্মফল এবং সমস্ত কিছু পরমপুরুষ বিশ্ববিধাতার কাছে সমর্পণ করিতে পারিব। যদিও ইহা কষ্ট-সাধ্য, তবে একেবারে অসম্ভব নয়। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস, অধ্যবসায়, তিতিক্ষা, সংযম ও আত্মজয় দ্বারা ইহা সম্ভব।

এখন ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, প্রকৃত ত্যাগী হইতে গেলে আমাদের কামনা বাসনা ও সর্বোপরি অহংকেই ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, অহং হইতে কামনা বাসনা ও সর্ববিধ মোহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অহংকে ত্যাগ করাই হইতেছে ত্যাগের ভিত্তি ও ত্যাগের আদর্শ। আর ইহাই হইতেছে সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব হইতে ঊর্ধ্বে উঠিবার চিরবাঞ্ছিত শাশ্বত পথ।

ভগবান বুদ্ধ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

যে কথা বলিয়া গেলে হে জ্ঞানী, হে বুদ্ধ,
সে কথা পালিয়া মন করেছি কী শুদ্ধ!
বলিয়াছ সত্যসম ধর্ম নাহি আর,
সততা মানব-দেহে চরিত্রের সার।
বলিয়াছ সত্যে দৃষ্টি রাখ চির স্থির,
সঙ্কল্প পুরাতে হও গিরিসম ধীর।
বলিয়াছ সৎপথে করিতে গমন,
সৎকর্মে রত যেন থাকে দেহ মন,
রিপুগণ অহর্নিশ থাকে যেন বশ ;
হৃদয়-ভূধরে যেন নাহি নামে ধস্।
হিংসা দ্বেষ কভু যেন নাহি থাকে মনে,
লোভ যেন নাহি থাকে যশ মান ধনে।
তবেই সার্থক হবে জন্ম এই ভবে,
জরা ব্যাধি মৃত্যু ভয় দূর হয়ে যাবে।

অসীম করুণাভরা সঞ্জীবনী বাণী
জীবেরে করেছ দান স্বর্গ হতে আনি।—
আমি কী করেছি পান সেই বাণী-সুধা
মিটায়েছি মোহে ভরা সর্বনাশী ক্ষুধা!
আমি কী বেসেছি ভাল প্রাণের ঠাকুরে ;
দেখেছি কী তারে আমি তোমার মুকুরে!—
দেখি নাই তারে আমি, বাসি নাই ভাল,
তাইতো আমার ধরা কাজলের কাল!

অদৃশ্য জগতের রহস্য

ডক্টর সত্যপ্রকাশ দে

[পূর্বানুবৃত্তি]

দ্বিতীয় পর্ব: সংগ্রাম

জেনারের বসন্তের প্রতিষেধক টিকার পর পাস্তুর কয়েকটি ব্যাধির ক্ষেত্রে গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে আহার্য তৈয়ার করেন এবং সেইসব রোগের জীবাণু শুদ্ধভাবে সংগ্রহ ও কৃত্রিমভাবে উৎপাদন করেন। পরে উত্তাপের সাহায্যে সেগুলিকে মারিয়া ফেলিয়া কয়েক প্রকার ব্যাধির প্রতিষেধক প্রস্তুত করেন ও ইহাদের ব্যবহারে সুফল পান। এইভাবে এনথ্রাক্স্ (Anthrax) ও মুরগীর বিসূচিকার (Fowl Cholera) টিকার দ্বারা এইসব রোগের মহামারীর কবল হইতে বহু পশু ও পক্ষীকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

টিকা বস্তুতঃ প্রতিষেধক—ইহার দ্বারা রোগের চিকিৎসা সম্ভব হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে শিশুদের মধ্যে ডিপথিরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী ছিল—মৃত্যুহারও ছিল ভয়াবহ। প্যারিসে ও বার্লিনে হাসপাতালে ডিপথিরিয়াক্রান্ত শিশুদের বাঁচাইবার কোনও উপায় ছিল না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে অল্পসংখ্যক রোগী বাঁচিলেও মৃত্যুহার শোচনীয় ছিল। প্যারিসে পাস্তুরের ছাত্র এমিল রুহ্ (Emile Roux) ও বার্লিনের তরুণ চিকিৎসক এমিল বেরিং (Emil Behring) হাসপাতালে শিশুদের এই মৃত্যুতে মর্মাহত হইয়া এই ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ইতিমধ্যে রবার্ট কক্ পাস্তুরের প্রথার উন্নতি সাধন করিয়া কৃত্রিম উপায়ে জীবাণুর লালন-পদ্ধতির সুবিধার জন্য নূতন উপায় প্রবর্তন করেন। ফলে কোন জীবাণুর মিশ্রণ হইতে শুধু কোনও একটিকে বাছিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। রুহ্ ও বেরিং এইসব নূতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে রোগীর মুখের ভিতর ডিপথিরিয়া রোগের জীবাণু-ঘটিত প্রদাহ স্থানের উপরের ঝিল্লী হইতে সংগৃহীত রোগের জীবাণুকে বিশুদ্ধভাবে পৃথক করিয়া তরল খাদ্যে লালন করার সময়ে লক্ষ্য করেন যে, কয়েকদিন এইভাবে থাকার পর তরল পদার্থে ডিপথিরিয়া জীবাণু হইতে একপ্রকার "বিষ" (Toxin) নিঃসৃত হয়। গবেষণাগারের জানোয়ারের শরীরে সেই বিষ-প্রয়োগে তাহাদের ডিপথিরিয়া-ব্যাধির উপসর্গও দেখা যায় ও তাহাদের অধিকাংশই মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। এই বিষ এত মারাত্মক যে, অতি অল্পমাত্রায় প্রয়োগেও এইরূপ উপসর্গ দেখা যায়। যে কয়েকটি জানোয়ার কোনও প্রকারে বাঁচিয়া যায় তাহারা কিভাবে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায় তাহার অনুসন্ধানে উভয়েই দেখেন যে, এইসব জানোয়ারদের রক্তে এই বিষ দমনকারী একপ্রকার "প্রতিবিষ" (Antitoxin) তৈয়ার হইয়াছে। শরীরে এইভাবে বিষ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতার ফলে তাহারা বাঁচিয়া গিয়াছে। গবেষকগণ তখন জানোয়ারদের শরীরে ক্রমশঃ প্রথমে অল্প ও পরে হিসাব মত বর্ধিতহারে 'বিষ' প্রয়োগ করিয়া পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী 'প্রতিবিষ' প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। রক্তরসের (Plasma) মধ্যে এই 'প্রতিবিষ' থাকে। বার্লিনে বেরিং ঘোড়াকে মাত্রানুযায়ী বিষ প্রয়োগ করিয়া তাহার রক্ত হইতে বিশুদ্ধভাবে এই বিষ-প্রতিরোধকারী অংশ অর্থাৎ 'প্রতিবিষ' পৃথক্ করিয়া বহু দ্বিধা ও চিন্তার পর রোগীর উপর পরীক্ষা করা স্থির করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে যিশুখ্রীষ্টের জন্মদিনের রাত্রে বেরিং বার্লিনে প্রথম একটি শিশুরোগীকে তাঁহার সংগৃহীত

'প্রতিবিষ' প্রয়োগ করেন। ফলে রোগী মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পায়। চিকিৎসায় এই প্রথম 'প্রতিবিষে'র প্রবর্তন। কহ্ ও বেরিং-এর গবেষণার ফলে আমরা ডিপথিরিয়া রোগের 'প্রতিবিষে'র ব্যবহার আরম্ভ করি। পরবর্তী কালে এইভাবে অপর কয়েকটি ব্যাধির জীবাণুজনিত বিষের প্রতিরোধকারী প্রতিবিষ তৈয়ার করা সম্ভব হইয়াছে। প্রতিবিষ এইসব রোগের অমোঘ ঔষধ। ধনুষ্টঙ্কারের (Tetanus) জীবাণু, ক্ষত-পচনকারী রোগের (Gas gangrene) জীবাণু ও খাদ্য পচনকারী (Food Poison) একজাতীয় জীবাণু, ইহারা প্রত্যেকে অতিশক্তিসম্পন্ন বিষ ক্ষরণ করে—ইহাদের প্রত্যেকের বিষের প্রতিবিষ প্রস্তুত সম্ভব হইয়াছে।

এইভাবে অনিষ্টকারী জীবাণুকে কি ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রতিষেধক ও রোগ নিরাময়-কারী ঔষধ করিবার কাজে ব্যবহার সম্ভব হইয়াছে এই সম্পর্কে আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে ১৯২১-২৩ খ্রীষ্টাব্দের আর এক নূতন আবিষ্কারের কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পূর্বে বলা হইয়াছে ডিপথিরিয়া ও ধনুষ্টঙ্কার রোগের জীবাণুর বিষ অতি মারাত্মক, অতি সামান্য অংশও শরীরে প্রবেশের ফলে ভয়াবহ উপসর্গের সৃষ্টি হয়। গ্লেনী (Glenny) ও তাঁহার সহকর্মীরা এবং রামোঁ (Ramon) ১৯২১-২৩ খ্রীষ্টাব্দে নূতন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই দুইটি মারাত্মক বিষকে রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহারের যোগ্য করিতে সক্ষম হন। এই প্রক্রিয়ার ফলে বিষের ক্ষতি-কারক শক্তি হ্রাস পায় অথচ উহার প্রতিবিষ উৎপাদনের ক্ষমতা অব্যাহত থাকে। ইহারা এই নূতন পদার্থকে পরিশুদ্ধ বিষ (Toxoid) নাম দেন। আজকাল আমরা শিশুদের প্রতি-ষেধক টিকা হিসাবে Toxoid বা পরিশুদ্ধ বিষের নাম প্রায় শুনিয়া থাকি। গ্লেনী ও রাঁমোর গবেষণার ফলে ইহাদের প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। মানুষের চিন্তার ধারা বহুমুখী—জেনার পাস্তর ও ককের চিন্তাধারার পরিবর্তন দেখি কহ্ ও বেরিং এর কর্মপ্রথায়। রবার্ট ককের গবেষণাগারে পল এহরলিক (Paul Ehrlich) যদিও জীবাণুতত্ত্বেরই গবেষণা করিতেন, তিনি অন্যভাবে চিন্তা করিতে শুরু করেন। পরীক্ষার সময়ে জীবাণু বা শরীরের কোনও কলার অংশ অণু-বীক্ষণের সাহায্যে দেখিবার পূর্বে তিনি সেগুলির উপর নানারকম রাসায়নিক রং সংযোগ করিয়া তাহার ক্রিয়াকলাপ দেখিতেন। এইভাবে খেয়ালী পরীক্ষার ফলে তিনি একটি বিশেষ রং (Dye)-এর একটি অভিনব প্রক্রিয়ার পরিচয় পান ও এই সূত্র ধরিয়া একটি কীটাণুর উপর উহার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া সেই কীটাণুঘটিত রোগের চিকিৎসা প্রবর্তন করেন। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কীটাণু ধ্বংসে উৎসাহিত হইয়া তিনি পরে আর সেনিকের (Arsenic) সংমিশ্রণে ঔষধ তৈয়ারি করিয়া স্পাইরোকীট (Spirochaete) নামক জীবাণুর উপর প্রয়োগ করিয়া সুফল পান। স্পাইরোকীট উপদংশ বা সিফিলিস (Syphilis) রোগের জীবাণু। এহরলিকের এই ঔষধ একটি যুগান্তকারী নূতন চিকিৎসা প্রণালীর প্রবর্তন করে। এই প্রথম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈয়ারী ঔষধের সাহায্যে জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব হইল—এই রাসায়নিক পদ্ধতির দ্বারা চিকিৎসার ইংরাজী নাম Chemotherapy। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইহার প্রচলনের সূত্রপাত। এহ-রলিকের এই নূতন আরসেনিক-ঘটিত ঔষধের পরে নানারকম রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুত সম্ভব হয়—বিশেষ কোনও উপসর্গের উপশমেই ব্যবহার্য হিসাবে ইহাদের প্রচলন হয়। ব্যাপকভাবে জীবাণুজাতীয় প্রাণীর উপর কার্যকরী কোনও বিশেষ ঔষধ প্রস্তুতের সংবাদ আমরা পাই না।

বহু বৎসর পরে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর ডোমাগ (Domagk) নূতনভাবে গবেষণার ফলে প্রনটোসিল (Prontosil) তৈয়ার করিয়া জীবাণুবিশেষের উপর তাহার প্রতিক্রিয়ার তথ্য জানাইলে বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক সমাজে আবার নূতন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। রক্তদূষিতকারী অথবা ক্ষতস্থানে প্রদাহকারী স্ট্রেপটোকক্কাস্ (Streptococcus) নামক জীবাণুর উপর এই ঔষধের বিশেষ ধ্বংসকারী প্রতিক্রিয়ার ফলে এই জীবাণুঘটিত কয়েকটি ব্যাধির চিকিৎসাও সম্ভব হয়। ডোমাগের কাজে অনুপ্রাণিত হইয়া ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বহু গবেষক নূতন ধারায় গবেষণা করিয়া দেখান যে প্রনটোসিল (Prontosil) হইতে শরীরের মধ্যে সালফোনামাইড (Sulphonamide) উদ্ভবের ফলে জীবাণু ধ্বংস সম্ভব হয়। সুতরাং পরবর্তী কালে এই সূত্র ধরিয়া নানাপ্রকার Sulphonamide জাতীয় ঔষধ তৈয়ার শুরু হয়। আমাদের দেশেও গবেষণা হয়। নানারকম নূতন ভাবে সংমিশ্রিত ঔষধ যথা—Sulfathiazole, Sulfaguanidine প্রভৃতি ঔষধের কার্যকারিতা আশ্চর্যভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় ও নানাবিধ জীবাণুর উপর যথেষ্ট প্রভাবশালী প্রমাণিত হয়। ফলে আরো নানাপ্রকার ব্যাধির চিকিৎসায় ব্যাপক ভাবে সালফা জাতীয় ঔষধাদির (Sulfa drugs) প্রচলন হয় ও বহু রোগ নিরাময়ে সুফল লক্ষিত হয়। যদিও ডোমাগের প্রনটোসিল স্ট্রেপটোকক্কাশের (Streptococcus) উপর কার্যকরী দেখান হয়, পরবর্তী ঔষধগুলি স্টাফাইলোকক্কাস (Staphylococcus), গনোকক্কাস (Gono coccus), নিউমোকক্কাস (Pneumococcus), মেনিনগোকক্কাস (Meningococcus), সিগা ফ্লেকসনার (Shiga Flexner) জাতীয় আমাশয়ের জীবাণু, কোলাই (Coli), টাইফয়েড (Typhoid) প্রভৃতি জীবাণু ধ্বংস করিতেও সক্ষম দেখা যায়। ফলে এই সকল জীবাণুঘটিত ব্যাধির চিকিৎসা সম্ভব হইয়াছে ও মৃত্যুহার যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। রক্তদূষিত হওয়ার ফলে (Septicaemia), দুষ্টব্রণ (Carbuncle), চর্মের প্রদাহ (Erysipelas), নিউমোনিয়া (Lobar Pneumonia), মেনিনজাইটিস (Meningitis) প্রভৃতি ভয়ানক ব্যাধির চিকিৎসার পূর্বে বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না, চিকিৎসকেরা বর্তমানে অনায়াসে সেগুলি দমন করিতে সক্ষম। ডোমাগের (Domagk) এই অমর দানের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার (Nobel Prize) দেওয়া হয়।

পল এহরেলিকের ও ডোমাগের বৈপ্লবিক রাসায়নিক চিকিৎসা-প্রথার (Chemotherapy) পরে আর এক অভিনব যুগের শুরু হয় ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে, প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ে যখন মানুষ তাহারই স্বজাতি-ধ্বংসের যজ্ঞে মত্ত। ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আলেকজান্দার ফ্লেমিং (Alexander Fleming) গবেষণাগারে কাজের সময় হঠাৎ এক জাতীয় ছত্রাকের (Fungus) সন্ধান পান। তিনি দেখেন এই ছত্রাকটি তাঁহার পরীক্ষাধীন জীবাণু স্টাফাইলোকক্কাস (Staphylococcus) সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেয়। এই দেখা হয়তো সাধারণের চক্ষে এমন কিছু চমকপ্রদ নহে, তবে যাঁহাদের দৃষ্টি গভীর ও সুদূরপ্রসারী তাঁহাদের মনে আলোড়ন তোলে। এই ছত্রাক ও জীবাণুর উপর তাহার প্রতিক্রিয়া ফ্লেমিংকে নূতন এক চিন্তা-জগতের দ্বারে পৌঁছাইয়া দেয়। ছত্রাকটি পেনিসিলিয়াম নোটেটম্ (Penicillium notatum)। তিনি এই জাতীয় ছত্রাক জীবাণুধ্বংসের কাজে ব্যবহার করিতে পারা যায় কি না সেই বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে নূতন করিয়া গবেষণা শুরু হয়; কৃত্রিম তরল আহারের মধ্যে ছত্রাক হইতে নিঃসৃত জীবাণুধ্বংসকারী

পদার্থটির পৃথকভাবে সন্ধান পান ও তাহার নির্যাস (Extract) তৈয়ারি করেন। যদিও নির্যাস নানারকম জীবাণুর বৃদ্ধিরোধ ও ধ্বংস করিতে সক্ষম হয়, তবু ইহার কার্যকরী শক্তি অতি অল্প দেখিয়া এবং উহাকে শুদ্ধ করার জন্য তিনি ফ্লোরী (Florey) ও চেন (Chain)-এর সাহায্য গ্রহণ করেন। ১৯৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা শক্তিশালী, বিশুদ্ধ নির্যাস তৈয়ার করিতে সক্ষম হন। পরে হাসপাতালে কয়েকপ্রকার জীবাণুজনিত ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর উপরও প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্যজনক সুফল পান। এই ঔষধই পেনিসিলিন (Penicillin) নামে খ্যাত এবং বর্তমানে প্রায় সকলেই এই নামের সহিত পরিচিত। এই জাতীয় জীবাণু-ধ্বংসকারী ছত্রাকের নির্যাসের সাধারণ নাম এন্টিবায়োটিক (Antibiotic) ; গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত, ইহার মূল মানে হইল—'জীবন হইতে প্রাপ্ত জীবনধ্বংসকারী পদার্থ'। ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিনের সাফল্যে নূতন নূতন এন্টিবায়োটি-কের সন্ধানে নানাস্থানে গবেষণা শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এই গবেষণা প্রসার লাভ করে ও আমাদের দেশেও কিছু কাজ হয়। পৃথিবীব্যাপী গবেষণার ফলে ক্ষিপ্রগতিতে এই জাতীয় নানা নূতন ঔষধের সৃষ্টি হইতে লাগিল। যুক্তরাষ্ট্রেই গবেষণার কেন্দ্রস্থল হওয়াতে ওদেশ হইতে ১৯৪৭-১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ যুগান্তকারী এন্টিবায়োটিক তৈয়ার সম্ভব হয়, নিম্নে উহাদের নামগুলি দেওয়া হইল :—

১৯৪৭ খ্রীঃ—ক্লোরোমাইসিটিন বা ক্লোরাম-ফেনিকল (Chloromycetin or Chloramphenicol)।

১৯৪৮ খ্রীঃ —অরিওমাইসিন বা ক্লোরটেট্রাসাই-ক্লিন (Aureomycin or Chlortetracycline)।

১৯৫০ খ্রীঃ—টেরামাইসিন বা অক্সিটেট্রাসাই-ক্লিন (Terramycin or Oxytetracycline)।

ইহার পূর্বে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াক্স-মান (Waksman) কর্তৃক স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin) নামক আর এক যুগান্তকারী এন্টিবায়োটিক আবিষ্কারের ফলে যক্ষার ন্যায় মহাব্যাধির চিকিৎসা সম্ভব হয়। অর্থাৎ ১৯৪২ হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাত্র আট বৎসরে ছয়টি যুগান্তকারী এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ আবিষ্কারের ফলে সাধারণতঃ প্রায় অধিকাংশ জটিল বা সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ অথবা চিকিৎসা সম্ভব হয়। শুধু মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রেই এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার সীমাবদ্ধ নহে—আরো নানাভাবে এই জাতীয় ভেষজ আমাদের বহু সমস্যার সমাধান করিয়াছে। পশুপক্ষীদের রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা, কৃষিকাজে নানা-জাতীয় শস্যের কীটাণু, জীবাণু বা ছত্রাক ধ্বংস করিয়া তাহাদের রক্ষা করা, টিনে সংরক্ষিত আহারে ইহা ব্যবহার করিয়া তাহাকে দীর্ঘদিন জীবাণুমুক্ত রাখা, উপরন্তু অল্পমাত্রায় পশুখাদ্যে ইহার সংমিশ্রণে পশুর পুষ্টিসাধন—এইভাবে নানা দৈনন্দিন কাজে আজ ইহাদের ব্যাপক ব্যবহার হইতেছে।

আমাদের ভেষজ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর দুইটি আবিষ্কার ডোমাগ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের সালফা জাতীয় ঔষধ ও ফ্লেমিং প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধের আবিষ্কার—বাস্তবিক চিকিৎসা-প্রণালীতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে।

মানুষের সমগ্র জীবন প্রশ্নমুখর। শৈশব হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত নানাভাবে—'কি ?' 'কেন ?' 'কোথায় ?' প্রভৃতি নানা জিজ্ঞাসা তাহার মনকে আলোড়িত করে। সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে তাহার বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি তাহাকে নানাভাবে ক্রমশঃ উৎকর্ষ ও প্রগতির পথে অগ্রসর

করে। এইভাবে নানা প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে একদিন সে এই বিচিত্র অদৃশ্য জগতের সন্ধান পায়। বহু সাধকের সাধনা ও আত্মোৎসর্গের ফলে আজ সে এক অপূর্ব সত্য আবিষ্কার করিয়াছে—ক্ষুদ্রের কি বিশাল শক্তি! আজ আর এক অজানা সীমাহীন মহাকাশের দিকে তাহার দৃষ্টি, সেই মহারহস্যের সমাধানের প্রয়াসে কতই না তাহার অভিনব অভিযান! কিন্তু অনন্ত অসীমের শেষ কোথায়?

মনীষীর মন যখন জটিলতম মহাকাশরহস্যের চিন্তায় ধ্যানস্থ হয়, তখন নিজ অন্তরের মধ্যে তিনি যে বাণী শোনেন, তাহার পরিচয় আমরা পাই মনীষীদের অন্যতম ইংলণ্ডের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ্ স্যার জেমস্ জীনসের (Sir James Jeans) কয়টি কথায়:

Today there is a wide measure of agreement, which on the physical side of science approaches almost to unanimity, that the stream of knowledge is heading towards a 'non-mechanical reality: the universe begins to look more like a great thought than like a great machine"

অর্থাৎ, জ্ঞানের ধারা যে একটি অযান্ত্রিক বাস্তবতার অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং এই স্বীকৃতি বিজ্ঞানের পদার্থতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রায় ঐকমত্যের সমীপবর্তী হইয়াছে; ব্রহ্মাণ্ড একটি বিরাট যন্ত্র অপেক্ষা এক বিরাট চিন্তার সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

নৈষা তর্কেণ

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর।'
সংশয়ের কালো মেঘে কেন ভরপুর
আমার হৃদয়াকাশ? মানববুদ্ধির
একসের ঘটি মাঝে চার সের নীর
কভু কি ধরিতে পারে? ঘন অন্ধকার
কৃষ্ণ পক্ষ বিস্তারিয়া রেখেছে আমার
চৈতন্য আবৃত করে। এ অন্তঃকরণ
যদি না সরল হয় শিশুর মতন
সংশয় কেমনে ঘুচে? চাই ষোল আনা
বিশ্বাসে বিশ্বাসে পূর্ণ রাখা মনখানা।
মহাসিন্ধু লঙ্ঘে হনু বিশ্বাসের বলে;
ভবসিন্ধু উত্তরিল প্রভু-পদতলে
অসংশয়ে আপনারে অর্পিয়া গিরিশ।
তবু নিত্য দহে চিত্তে কেন কূট বিষ?

প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও লিপি

শ্রীমতী আশা রায়

যে কোনও জাতির ভাষার উৎকর্ষ সেই জাতির কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের পরিচায়ক। যখন কোনও জাতি উন্নতির শীর্ষদেশে আরোহণ করে তখন সহজাত প্রেরণায় সেই জাতির ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করে। ভারতের যখন স্বর্ণযুগ ছিল, যখন তার যশঃসূর্যের উদ্ভাসিত আলোক বহির্জগতে সাড়া এনেছিল তখন সে-সভ্যতা মূলতঃ সংস্কৃত ও পরবর্তী কালে পালি ভাষার মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল।

আর্যগণ (আয না বলে ইন্দোইউরোপীয় বলা ঠিক হয়) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার কাসপিয়ান সাগরের নিকটবর্তী স্থান হতে ২৫০০ হতে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে মেসোপটেমিয়া ও পারস্যে উপস্থিত হয় এবং আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দলে দলে তারা আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে ভারতের পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রবেশ করে। পারস্যে তারা কিছুকাল অবস্থিতি করায় ঐ দেশের নাম দিয়েছিল আরিয়ানাদের দেশ; অনেক পণ্ডিত মনে করেন তা থেকে দেশটির নাম ইরানে পরিণত হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে এককালে ভারতের পরশুরাম কর্তৃক ঐ দেশ অধিকৃত হওয়ায় দেশের নাম পারশ্য হয়ে যায়। আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করলে যারা তাদের আরাধ্য দেবগণকে যজ্ঞাদি দ্বারা তুষ্ট করত না তাদের অর্থাৎ আদিম অধিবাসীদের (অনার্য) নিকৃষ্টার্থে দস্যু, অসুর বা রাক্ষস আখ্যা দিল।

আর্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ও পশ্চিম পাঞ্জাবে উপস্থিত হয় এবং এ অঞ্চলের নাম দিয়েছিল সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সাততি নদীর দেশ। এই সাততি নদীর নাম ছিল সিন্ধু, শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, বিতস্তা, যমুনা ও সরস্বতী। সরস্বতী তখন যমুনা ও শতদ্রুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এই সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে এবং পারস্যের পুরাতন সাহিত্যে হপ্তহিন্দু বলে উল্লেখ আছে। পারস্যে 'স'-এর উচ্চারণ 'হ' এবং সেহেতু সিন্ধু হতে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

এই সপ্তসিন্ধু হতে আর্যগণ পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে পূর্বপাঞ্জাব মধ্যদেশ এবং আরও পরে কাশী-কোশল, মগধ-বিদেহ-অঙ্গ-রাঢ়-বরেন্দ্র-কামরূপ প্রভৃতি দেশের ভাষা আত্মসাৎ করে আর্যভাষার প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ৫০০ বৎসর উত্তর-ভারতে বৈদিক সভ্যতার স্থিতি ও পরিণতির পর আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আর্যগণ বিন্ধ্যপর্বত লঙ্ঘন করে দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন। রামায়ণ কাহিনী ও অগস্ত্যযাত্রা এই দক্ষিণ-ভারত অভিযানের ইঙ্গিত। বর্তমান বেলারির নিকট কিষ্কিন্ধা কেবল তখন জনবহুল ছিল, তাছাড়া অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলাকীর্ণ ও ক্বচিৎ কখনও আর্যঋষিদের তপোবন ছিল। এটা নিশ্চিত যে, অনার্যগণের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছিল কিন্তু উত্তর-ভারতের ন্যায় দক্ষিণ-ভারতে ততটা আর্যপ্রভাব বিস্তার লাভ করেনি। সেখানে দ্রাবিড় কর্ণাট প্রভৃতি প্রান্তবর্তী দেশগুলিতে তারা প্রসার লাভ করলেও তাদের কথ্য ভাষাকে অপসারণ করতে পারেনি এবং পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকায় সৌবীর সভ্যতা অতি উন্নত থাকায় সে অঞ্চলেও আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার বিলম্বে ঘটে।

আদিম আর্যগণের সংস্কৃতি খুব উন্নত ছিল না।

কিন্তু তাদের প্রকাশশীল ভাষা ও দেবগীতিমূলক সাহিত্য এবং লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার তাদের সভ্যতা বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছিল। অনেক পণ্ডিত মনে করেন তারা চক্রযানের ব্যবহার জানতেন। বেদপূর্ব ভারতে লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার জানা ছিল না।

ঋক্‌বেদই আর্যদের প্রাচীনতম ধর্ম-সাহিত্য, ঋক্‌বেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলির রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ শতাব্দীর পরে নয়। ঋক্‌বেদের সূক্তগুলি যত প্রাচীন ঋক্‌বেদ-সংহিতা গ্রন্থনের কাল তত প্রাচীন নয়। সম্ভবতঃ ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কালে সূক্তগুলি সংকলিত হয়েছিল।

ঋক্‌বেদের ভাষা ও পারস্যের প্রাচীন গ্রন্থ আবেস্তার গাথার সাদৃশ্য দেখা যায় কারণ, ইরানীয় ও ভারতীয় ভাষা এক আদশাখারই উপশাখা।

ভাষাগুলির মৌলিক সম্পর্ক অন্বেষণে যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, সংস্কৃত, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসিক, আর্মানী, প্রাচীন জার্মানিক, প্রাচীন স্লাবিক, প্রাচীন গ্রীক, ল্যাটিন, প্রাচীন কেল্‌টিক ইত্যাদি ভাষাগুলি সমগোত্রীয়। এই প্রাচীন ভাষা-গোত্রের নাম দেওয়া হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী, কেননা এদের নিদর্শন অধুনা বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্বাপর প্রচলিত আছে।

বৈদিক সাহিত্য (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০—৬০০) তিন পর্যায়ে বিভক্ত। বেদ বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ প্রধানতঃ গদ্যে লিখিত। এই উপনিষদের ভাষাকে এক হিসাবে সংস্কৃতের পূর্বরূপ বলা যায়। প্রত্যেক বেদের একাধিক ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ আছে। ঋক্‌বেদের প্রধান ও প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ ঐতরেয়, এটির রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দ।

প্রাচীন ভারতীয় ভাষা দুইটি—একটি বৈদিক আর একটি ব্যবহারিক; এই ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষিত মানুষ ব্যবহার করতেন ও এটি লৌকিক (অবৈদিক) সাহিত্যের ভাষা ছিল। এই ভাষারই সংস্কার করে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি সংস্কৃত ভাষার রূপটি নির্ধারিত করেন। পুরাতন ব্যবহারিক ভাষার রচনার নিদর্শন অধুনা না পাওয়া গেলেও রামায়ণ-মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণের ভাষায় এর অস্তিত্ব থেকে গেছে।

পাণিনি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য বেশী কিছু পাওয়া যায় না। তিনি তক্ষশিলার নিকট শালাতুর গ্রামে সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁর পিতামহের নাম দেবল ও মাতার নাম ছিল দাক্ষী। তিনি সম্ভবতঃ মগধের রাজবৈদ্য বুদ্ধ-শিষ্য জীবকের সমসাময়িক। উভয়ই তক্ষশিলার মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, তিনি খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম বা সপ্তম শতাব্দীর লোক। পাণিনির ব্যাকরণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত বলে একে 'অষ্টাধ্যায়ী' বলা হয়। সংস্কৃতের ন্যায় বলীয়সী ভাষার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সহ ব্যাকরণ সৃষ্টি তাঁর আশ্চর্য মেধার পরিচায়ক এবং তাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ বলা যায়। ঐ কালে এই ভাষা-বিজ্ঞান রচনা মানুষের ধী-শক্তির এক অদ্ভুত কীর্তি। এর পর স্বভাবতই পূর্ব ও সমকালীন ব্যাকরণগুলি অনাদরে বিস্মৃত হয় ও অধিকাংশের লোপ ঘটে এবং অবৈদিক ব্যবহারিক ভাষার সংস্কৃত রূপটি নির্ধারিত হয়ে যায়। এর ফলে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হতে বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশ লেখাই পাণিনীয় ব্যাকরণ অনুযায়ী রচিত, একথা বলা চলে। তথাপি সেকালে দেশের সাধারণ লোক ব্যাকরণ-সুনিয়ন্ত্রিত পাণিনীয় ভাষা ব্যবহার করত না। পুরাণ কথা ধর্মতত্ত্ব কবিতা বা গাথায় কথ্য ভাষার প্রচলন ছিল এবং বৌদ্ধযুগে প্রাকৃত বা পালি, সংস্কৃত প্রাকৃত মিশ্র ভাষা—যাকে বৌদ্ধ-সংস্কৃত

ভাষা বলা হয়, তার প্রচলন হল।

অধ্যাপক সুকুমার সেন ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর দেখিয়েছেন—

(ক) প্রত্নভারতীয়-আর্য (বৈদিক-সংস্কৃত), খ্রীঃ পূঃ ষোড়শ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত;

(খ) মধ্য ভারতীয়-আর্য (অশোক ও অন্যান্য প্রত্নলিপির ভাষা, পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ), খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত;

(গ) নব্য ভারতীয়-আর্য (বাঙলা হিন্দী সিন্ধী মারাঠী ইত্যাদি) খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত।

প্রথম স্তরের বৈদিক ভাষা সরল সংস্কৃতে পরিবর্তিত হল এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর পর আর্যভাষার রূপ বদলে প্রাকৃতে পরিণত হল। প্রাকৃত কথার অর্থ 'প্রকৃতি'-র অর্থাৎ জনগণের কথ্য ও বোধ্য ভাষা। সংস্কৃত ভাষা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহক এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমত জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃত বাহক হল। দক্ষিণ ভারতে হীনযানী বৌদ্ধগণ পালি এবং উত্তর ভারতে মহাযানী বৌদ্ধগণ সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্র বা বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রহণ করলেন, জৈনরা প্রথম অর্ধমাগধী পরে অপভ্রংশ গ্রহণ করলেন।

লিপির ব্যবহার সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ব পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রাচীন চারটি লিপি থেকেই সব লিপির উৎপত্তি হয়েছে। এই চারটি লিপি—মিশরীয় লিপিচিত্র, ভারতীয় লিপিচিত্র, চীনীয় লিপিচিত্র এবং মেসোপটেমীয় বাণমুখ লিপিচিত্র। মিশরীয় লিপিচিত্র থেকে কালক্রমে আরামীয়-হিব্রু-আরবী প্রভৃতি সেমীয় (Semetic) বর্ণমালার উৎপত্তি হয়েছে। সেকালে ফিনীসীয়গণ মিশরীয় লিপিকে নিজেদের ভাষায় রূপান্তরিত করে। এরা চতুর দুর্ধর্ষ সমুদ্র-বিহারী বণিক জাতি ছিল এবং এদের বাণিজ্যতরী দেশ দেশান্তরে যাতায়াত করায় বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশবাসীর সঙ্গে আদান প্রদানের সুবিধার জন্য এদের লিপি থেকে গ্রীক রোমান প্রভৃতি ইউরোপীয় এবং অপরদিকে আরামীয়হিব্রু-আরবী প্রভৃতি সেমীয় বর্ণমালার উৎপত্তি হয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন লিপি দুইটি—খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। ভারতীয় লিপির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় অশোক-অনুশাসনে। সম্রাট অশোক ২৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অশোকের অনুশাসনগুলি চারভাবে খোদিত, গিরিগাত্রে, শিলাফলকে, স্তম্ভগাত্রে ও গুহাগাত্রে। গিরিলেখগুলির মধ্যে দুইটি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মানসেহ্‌রা (Mansehra) ও শাহ্‌বাজগঢ়ীর (Shahbazgari) লিপি খরোষ্ঠী। খরোষ্ঠী সেমীয় লিপি হতে উৎপন্ন। ব্রাহ্মী সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন ব্রাহ্মীলিপিও সেমীয় কিন্তু ফিনীসীয় লিপি ডান দিক থেকে বাঁদিকে লিখিত এবং ব্রাহ্মী বাঁদিক থেকে ডান দিকে লিখিত। এজন্য অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে এই লিপি সেমীয় নয়, ভারতীয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০) আবিষ্কার করে কতগুলি লিপিযুক্ত সীল পেয়েছেন। এই লিপিগুলির যদি পাঠোদ্ধার হয় তবেই নিঃসংশয়ে প্রমাণ হবে ব্রাহ্মীলিপি ভারতীয় কিনা।

সম্রাট অশোকের ব্রাহ্মীলিপি থেকেই ক্রম-পরিবর্তনে বর্তমান ভারতীয় এবং তিব্বতী বর্মী সিয়ামী যবদ্বীপী কোরীয় প্রভৃতি পূর্ব-এশিয় দেশের লিপিমালার পরিণতি ঘটেছে। গুপ্ত-শাসনকালে ব্রাহ্মীলিপি পূর্ব-ভারতে যে রূপ প্রাপ্ত হয় তাকে কুটিল লিপি বলে। এই কুটিল লিপি থেকেই বাঙলা লিপির ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

প্রাকৃতে লেখা আর একটি প্রাচীন অনুশাসন পাওয়া গেছে গোয়ালিয়রের বেস নগরে (প্রাচীন বিদিশানগরী)। গ্রীকরাজ অন্তলিকিত (Antalkidas)-এর দূত তক্ষশীলাবাসী যবন (গ্রীক) দিয়নের পুত্র হেলিওদোর (Helio-doros)-এর প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভ-লিপি। এই লিপির অর্থ "দেবদেব বাসুদেবের এই গরুড় স্তম্ভ নির্মিত হইল দিয়নের পুত্র তক্ষশিলাবাসী যবনদূত বৈষ্ণব হেলিওদোর যিনি মহারাজ অন্তলিকিতের কাছ হইতে আসিয়াছিলেন কৌৎসীপুত্র রাজা ভাগভদ্রের কাছে, মহারাজের বর্ধমান রাজ্য-শাসনের চতুর্দশ বৎসরে। তিনটি অমৃতপদ এখানে সু-অনুষ্ঠিত হইলে স্বর্গে লইয়া যায়—দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ।" এখানে লক্ষণীয় যে তখনকার দিনে যবন অর্থাৎ বিদেশী (Foreigner) গ্রীকগণ এদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি সাদরে গ্রহণ করতেন এবং উভয় জাতি বা দেশের মধ্যে বিবাহাদিও প্রচলিত ছিল। ভারতবাসী তাদের বিনা দ্বিধায় আপন করে গ্রহণ করতেন; ম্লেচ্ছ (অচ্ছুৎ) বলে কোনও কথা বা বিচারের তখন প্রচলন ছিল না এবং উভয় জাতির সঙ্গে আদান-প্রদানে উভয় জাতিই সমৃদ্ধ হয়ে এক নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল যেমন এদেশে ঘটেছিল আর্য অনার্য জাতির সংমিশ্রণে। এজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ একটি পত্রে মত প্রকাশ করেছিলেন—"যখনই ভারতবাসীরা 'ম্লেচ্ছ' শব্দ আবিষ্কার করিল ও অপর জাতির সহিত সর্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্বনাশের সূত্রপাত হইল।"

মহেঞ্জোদারোতে বহু লিপিযুক্ত সীল ছাড়া মাটি, পাথর, তামা, ব্রোঞ্জ হাতীর দাঁত, সোনা, রূপার দ্রব্য পাওয়া গেছে কিন্তু লোহার কিছু না পাওয়ায় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন এটি তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা। বৈদিক আর্যগণ লোহা ও ঘোড়া ব্যবহারে দক্ষ ছিলেন। সিন্ধু সভ্যতায় লিপির চলন ও নিদর্শন পেলেও অশোকের পূর্বে দেড় হাজার কি হাজার বছরের মধ্যে ভারতে কোনও লিপির নিদর্শন পাওয়া যায় না বলে ব্রাহ্মীলিপি ভারতীয় কি না প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণ নির্ণয় করতে পারেননি।

বেদ অপৌরুষেয়, এটি কোনও মানুষের রচিত নয়, এজন্য বেদ পূর্বে শিষ্য পরম্পরায় আসন্নবিদের মুখে মুখেই শ্রুত হত বলে এর অপর নাম শ্রুতি। তখনকার কালে বেদ লিপিবদ্ধ করা দূষণীয় ছিল, বেদ লিপিবদ্ধকারী নিরয়গামী হবে, এরূপ ধারণা ছিল। এজন্য মনে হয়, বৈদিকগণের লিপি সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ ছিল না।*

* এই প্রবন্ধে ভাষাবিষয়ক তথ্য সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক শ্রীসুকুমার সেনের পুস্তক 'ভাষার ইতিবৃত্ত' হতে এবং অন্যান্য তথ্য সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পুস্তক হতে সংগ্রহ করা হয়েছে, সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

আদিগঙ্গা ও শ্রীচৈতন্য

শ্রীপ্রসিত রায় চৌধুরী

(পূর্বানুবৃত্তি)

এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যে স্থানগুলির উল্লেখ দেখা যায়, সেই কালীঘাট, বৈষ্ণবঘাটা, মাহিনগর, বারুইপুর, কোদালিয়া, ছত্রভোগ, মগরাহাট, জয়নগর, বিষ্ণুপুর, বড়ু, বারাসত, সূর্যপুর, মালঞ্চ, বোড়াল, রসা, কল্যাণপুর, বড়দহ প্রভৃতি স্থান আজও বিদ্যমান। এগুলি মজা আদিগঙ্গার তীরবর্তী। শ্রীচৈতন্যের নীলাচল যাত্রাপথের যে বর্ণনা বৃন্দাবন দাস দিয়েছেন তাতে দেখা যায় —

"হেনমতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিল আসি 'আটিসারা' নগরেতে॥
সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥"

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্যখণ্ড, ২য় অঃ, পৃঃ ২৫৫—উপেন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)। এই আটিসারা নগরী বর্তমানে দক্ষিণ বারুইপুরের অন্তর্ভুক্ত। অনেকে অবশ্য বারুইপুরের নিকটবর্তী প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আকরভূমি আটঘরাকে আটিসারা বলে মনে করেন (চৈতন্য ভাগবত—অতুল গোস্বামী সম্পাদিত—পৃঃ ৩৮২)। বোধ করি, এটি ঠিক নয়। কারণ বারুইপুর বাজারের কাছে মহাপ্রভুতলা বলে জায়গাটিকে আগে আটিসারা বলা হ'ত। জায়গাটি একেবারে আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত। এখন এখানে একটি শ্মশান আছে। এখানেই ছিল শ্রীঅনন্ত সাধুর কুটির। এঁরই গৃহে শ্রীচৈতন্যদেব একরাত্রির জন্য অতিথি হয়ে কীর্তনানন্দে কাটিয়েছিলেন। আজও তাই জায়গাটির নাম 'কীর্তনখোলা'। বেশ কয়েক বছর আগে মজা আদিগঙ্গার তীরে পাওয়া গেছে অনন্তসাধুর প্রতিষ্ঠা করা বিগ্রহ। সেখানে বৈষ্ণবাচার্য রামদাস বাবাজী কর্তৃক তৈরী হয়েছে একটি মঠ। সেই স্থানটি আজ পরম তীর্থে পরিণত। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসে এখানে শ্রীচৈতন্যের আগমনতিথি স্মরণ করে উৎসব করা হয়। (আনুমানিক ৯১৬ বঙ্গাব্দের ১৭ই ফাল্গুন শ্রীচৈতন্যদেব এখানে পদার্পণ করেন)।

আটিসারার (বারুইপুর) আদিগঙ্গার তীরে তীরে শ্রীচৈতন্যদেব বর্তমান মথুরাপুর থানার অন্তর্ভুক্ত ছত্রভোগ বন্দর নগরে উপস্থিত হন।—

" ছত্রভোগ' গেলা প্রভু অম্বুলিংগ ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে॥"

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ২৫৬—উপেন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)। মজা আদিগঙ্গার খাতে ধানক্ষেতের মধ্যে একটা শ্মশানে আজ ছত্রভোগের স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে। অথচ তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবনতির পর সপ্তগ্রাম ও ছত্রভোগ সমুদ্রগামী জাহাজের শ্রেষ্ঠ বন্দররূপে গড়ে ওঠে। এই অঞ্চলে শাক্ত ও শৈব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। কাছেই 'খাড়ি' পল্লীতে (চৌষট্টি শাক্তপীঠের অন্যতম—The Sakta Pithas of Bengal—Dr. D. C. Sirkar, J. A. S. B. Vol.—14) আজও তান্ত্রিক দেবী নারায়ণীর মূর্তি রয়েছে। অদূরে মাধবপুরে সংকেতমাধব ও নীলমাধব নামে দুটি বিগ্রহ কিছুকাল পূর্বেও ছিল—আজ অদৃশ্য। নিকটবর্তী বড়াশী গ্রামে রয়েছেন স্বয়ং অম্বুলিঙ্গশিব—বদরিকানাথরূপে। স্থানটি তাই চক্রতীর্থরূপে মর্যাদা পেয়েছে; চাঁদ সওদাগর ছত্রভোগের ঘাটে জাহাজ ভিড়িয়ে কলস ভরে নিয়েছিলেন গঙ্গাজল—

'তীর্থক্ষেত্র চাঁদ রাজা করিল তথায়।
বদরিকা কুণ্ডুজল লইল নৌকায়॥'

(বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসা-মঙ্গল, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃঃ ১৫২)। ছত্রভোগের অম্বুলিঙ্গ ঘাটের পরেই দেখা যায় শতধারায়' আদিগঙ্গার স্রোত বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। একেই বলে শতমুখী। সাগরসঙ্গমে গঙ্গাকে শত-মুখী দেখে মহাপ্রভুর কবিচিত্ত আনন্দে উদ্বেলিত হয়। সপার্ষদ তিনি অম্বুলিঙ্গ ঘাটে স্নান করেন।

এই ছত্রভোগেই শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ হয় এই অঞ্চলের অধিপতি (ফৌজদার) রামচন্দ্র খাঁয়ের। চৈতন্য ভাগবতে এ ব্যাপারের উল্লেখ আছে,—

'সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খান।
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহাভাগ্যবান॥
　　*　　*　　*
দৈবগতি আসিয়া মিলিল সেই স্থানে॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ ভয় হইল মনে।
দোলা হইতে নামিয়া সত্বরে সেই ক্ষণে॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়েন পদতলে।
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ-জলে॥'

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ২৫৬—উপেন মুখোপাধ্যায়)।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রামচন্দ্র খাঁকে আদেশ করেন তাঁর নীলাচল (পুরী) যাত্রার ব্যবস্থা করতে। রামচন্দ্র কাতর হয়ে বলেন,—

"সভে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
সেদেশে এদেশে কেহ পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে 'জাশু' বলি লয় প্রাণে॥"

(ঐ, পৃঃ ২৫৬)

এ সময় গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের সহিত উৎকলের রাজা প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ চলছিল। কাজেই উৎকল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পুরীতীর্থে যাওয়া গৌড়বাসীর পক্ষে নিরাপদ ছিল না। কিন্তু মহাপ্রভুর নির্বন্ধাতিশয্যে রামচন্দ্র খাঁ নৌকার ব্যবস্থা করে দেন। সপার্ষদ মহাপ্রভু নদী পার হয়ে উৎকল রাজ্যের সীমানাভুক্ত প্রয়াগ ঘাটে অবতরণ করে পদব্রজে জলেশ্বর, বাঁশদা ও রেমুনা হয়ে যাজপুরে আসেন। ক্রমে কমলপুরে পৌঁছে জগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বজা দর্শন করেন।

'উত্তরিলা আসি প্রভু কমলপুরেতে'।

(ঐ, পৃঃ ২৬৪)

শ্রীচৈতন্যের নীলাচল যাত্রাপথের বিবরণ আছে তিন জনের লেখায়। শ্রীচৈতন্য-সেবক গোবিন্দ-দাস কর্মকারের কড়চায় দেখা যায় শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর থেকে গঙ্গা পার হয়ে বর্ধমান এসে-ছিলেন। নৌকায় দামোদর নদ পার হয়ে আসেন হাজিপুর, তারপর পদব্রজে মেদিনীপুর পৌঁছান। এর পর নৌকায় সুবর্ণরেখা অতিক্রম করে হরিহর-পুর উপস্থিত হন। বালেশ্বর আসেন পায়ে হেঁটে। তারপর নৌকায় বৈতরণী পার হয়ে হাঁটা পথেই পুরীতে উপস্থিত হন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রেনেল সাহেবের (Renell) আঁকা মানচিত্রে এমনি একটা পথের চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু পথটি বড় দুর্গম। তা ছাড়া অনেকে গোবিন্দ-দাসের কড়চাকে অপ্রামাণিক বলে মনে করেন।[৫]

জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে লিখেছেন—

'নানা মহোৎসবে　　রজনী বঞ্চিঞা
　　সুরনদী করিয়া বামে।
কাচমনি বেতড়া　　ডাহিনে থুইঞা
　　উত্তরিল কুলীন গ্রামে।
দেব নদ পার হঞা　　সেয়াখালি দিঞা
　　উত্তরিলা তমলিপ্তে।'

৫ মৃণালকান্তি ঘোষ: গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য

(শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান — বিমানবিহারী মজুমদার পৃঃ ২৪৪)। সেখান থেকে খানিক হেঁটে সুবর্ণরেখা নদী তীরে পৌঁছে নৌকায় পার হয়ে আসেন বারাসত। এর পর গোটাদুয়েক নদী পার হয়ে রেমুনা পৌঁছান। সেখান থেকে পদব্রজে ভদ্রক হয়ে যাজপুর আসেন। নৌকায় মন্দাকিনী পার হয়ে হাঁটা পথেই উপস্থিত হন কটকে। তারপর ধরেন পুরীর পথ। উপরিউক্ত তিনটি পথের মধ্যে বৃন্দাবন দাসের বর্ণিত পথটিকে সহজ বলে মনে হয়, কারণ সাড়ে চারশো বছর আগে আদিগঙ্গা ছিল নাব্য। এইটিই ছিল গঙ্গার মূল স্রোত। রাজমহলের কাছে গঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি ধারা পদ্মা নামে পূর্ববঙ্গের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়। আর মূল ধারাটি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়।

পৌরাণিক কাহিনীতে আছে ভগীরথ গঙ্গাকে এনেছিলেন—

'গঙ্গা কহিলেন বাপু, শোন ভগীরথ।
কতদূরে তোমার দেশের আছে পথ॥
ভ্রমিতেছি একবর্ষ তোমার সংহতি।
কোথা আছে ভস্মময় সগর সন্ততি॥

* * *

ভগীরথ বলেন মা এই পড়ে মনে।
পূর্ব ও দক্ষিণ দিক তার মধ্য স্থানে॥
যেইখানে আছিল কপিল মহামুনি।
সেইখানে মম বংশ মাতৃমুখে শুনি॥'

(কৃত্তিবাসের রামায়ণ, দ্বাদশ সংস্করণ, আদিকাণ্ড, পৃঃ ৩১, সুবোধ মজুমদার সম্পাদিত)।

ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও লিখেছেন –'এখনকার ন্যায় কলিকাতার পরে—পশ্চিমে শিবপুর অভিমুখে না গিয়া শত বৎসর পূর্বেও ইহা [ভাগীরথী] সোজা দক্ষিণদিকে কালীঘাট, বারুইপুর, মগরা প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত।' (বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ৩, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৩ সাল।) শিবপুরের পাশ দিয়ে যে ধারা মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার সীমানা চিহ্নিত করে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে তা হুগলী নদী। শিবপুরের বিপরীত দিকে যে ধারা কালীঘাট মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে দক্ষিণে গড়িয়া-বৈষ্ণবঘাটা পার হয়ে বোড়াল, নরেন্দ্রপুর, রাজপুর, হরিনাভি, কোদালিয়া, মালঞ্চ, মাহিনগর, বারুইপুর অতিক্রম করে জয়নগর, মথুরাপুর হয়ে ছত্রভোগে শতমুখী হয়েছে তাই আদিগঙ্গা। এই পথেই চৈতন্যদেব নীলাচল উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। কারণ তাঁর সমসাময়িক কালে আদিগঙ্গা-তীরবর্তী মাহিনগর গ্রামের গোপীনাথ বসু (ইনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূর্বপুরুষ—গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের নৌসেনাধ্যক্ষ ছিলেন) নৌকাযোগে গৌড়ে যাতায়াত করতেন।[৬] ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে Jao de Barros বলে এক পর্তুগীজ নাবিকের আঁকা মানচিত্রে আদিগঙ্গার স্রোত-রেখাটি বেশ গভীর ভাবে চিহ্নিত। তার তীরবর্তী নগর, বন্দরগুলির নামও রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি আজও গ্রামরূপে টিকে আছে। তবে যাঁরা বলেন, তিনি হাঁটা পথে গিয়েছেন, তাঁরা আদিগঙ্গা তীরবর্তী "দ্বারির জাঙ্গাল" বলে একটি পথের কথা বলেন। পথটির চিহ্ন আজও ধপ্‌ধপি, ধামুয়া প্রভৃতি গ্রামে দেখা যায়। মনে হয় মহাপ্রভু কিছু পথ নৌকায় কিছু পথ পদব্রজে অতিক্রম করেছেন। [ক্রমশঃ]

---

৬ সুভাষচন্দ্র বসু—ভারত পথিক, পৃঃ ১

সমালোচনা

Swami Santadas : Susil Kumar Ray. প্রকাশিকা : সুজাতা সেনগুপ্ত, ৫৮-সি বাঘা যতীন পল্লী, কলিকাতা-৩২। (১৯৭২); পৃ: ১০৩+২১, মূল্য ২'০০।

সাধু, মহাত্মার দেশ ভারতবর্ষ। তাঁহাদেরই অন্যতম স্বামী সন্তদাস—নিম্বার্কপন্থী বেদান্তবাদী সাধু রামদাস কাঠিয়াবাবার মন্ত্রশিষ্য। স্বামী সন্তদাস পূর্বজীবনে—কলিকাতা মহাধর্মাধিকরণের প্রতিষ্ঠাবান আইনজীবী তারাকিশোর চৌধুরী। আলোচ্য পুস্তকটিতে তারাকিশোরের শৈশব হইতে স্বামী সন্তদাসের মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত সুদীর্ঘ মহা-জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সংক্ষেপে নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রসংগক্রমে নিম্বার্কদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পরিশেষে স্বামী সন্তদাসের উপদেশাবলীও সংযোজিত হইয়াছে। পাঠকগণ তরুণ তারা-কিশোরের সত্যানুসন্ধিৎসা, বিচার-প্রবণতা ও দৃঢ়-সংকল্পতা, সংসারী তারাকিশোরের ভগবন্নির্ভরতা, নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা ও নিরভিমানিতা প্রভৃতি বিবিধ চারিত্রিক গুণাবলীর পরিচয় পাইবেন। সর্বোপরি, জীবনে সর্বোচ্চ সম্পদ যাঁহার আকাঙ্ক্ষিত, সংসারের অতুল বৈভব তিনি যে কিরূপ তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তারাকিশোরের জীবনে সে দৃষ্টান্ত সুপরিস্ফুট। এরূপ মহাজীবনালেখ্য রচনার উদ্দেশ্য জনসাধারণকে সত্যব্রতে উদ্বুদ্ধ করা ও সত্যানুসন্ধানীকে পথনির্দেশ দেওয়া। পুস্তক-টিতে সংসারী তারাকিশোর ও স্বামী সন্তদাসের দৈবীসম্পদসকলের কথা বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সম্পদসমূহ যে সুদীর্ঘ সাধনার ফলশ্রুতি তাহার কথা বিশদভাবে বলা হয় নাই। সাধক পাঠক ইহাতে কিছুটা হতাশ হইবেন।

যাহাই হউক, এরূপ মহাজনের জীবনী কেবল-মাত্র বিষয়বস্তুর গুণেই অবশ্য পাঠ্য। স্বার্থ-সংঘাত-জর্জরিত আজিকার সমাজজীবনে স্বামী সন্তদাসের সেবাময় সত্যনিষ্ঠ জীবন যেন অন্ধকার পথে আলোক বর্তিকা। আমাদের বিশ্বাস যাঁহারা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সন্তদাস বাবাজীর জীবন-কথা ও উপদেশাবলীর সহিত পরিচিত হইতে আগ্রহী. তাঁহাদের নিকট গ্রন্থখানি সমাদৃত হইবে। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে গ্রন্থটির মূল্য ও যৎসামান্য।

পুস্তকখানির যাহা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের নজরে আসিয়াছে তাহা হইতেছে, প্রথমতঃ—গ্রন্থান্তর্গত বিষয়সকলের অন্ততঃ সংক্ষিপ্ত একখানি সূচীপত্রের অভাব। পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয়ে বিহিত ব্যবস্থা করণীয়। দ্বিতীয়তঃ—গ্রন্থশেষে প্রদত্ত পরিভাষা (Glossary)-তে যে-সকল ইংরেজী প্রতিশব্দ অথবা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে উহা অন্ততঃ কয়েকটি ক্ষেত্রে যে সঠিক হইয়াছে একথা বলিতে পারা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ—"Srimat Bhagabata"কে "The Life Story of Krishna" বলিয়া অভিহিত করার কথাটির উল্লেখ করা যায়। পরবর্তী সংস্করণে এবিষয়েও যথাযোগ্য দৃষ্টিদান প্রয়োজন। পুস্তকটির একটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশ: ১৯৭৩-এর মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের সেবাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে মোট ৩২,১২,৯৬১'২৮ টাকা খরচ করা হইয়াছে। বিতরিত দ্রব্যের মূল্য উল্লিখিত হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নহে। জানুআরি '৭৪ হইতে মার্চ '৭৪ পর্যন্ত তিন মাসে কৃত সেবাকার্য নিম্নরূপ:

ঢাকা কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৩,৮২৫। বিতরিত হয়: বিস্কুট ৭২৪ কেজি., সি. এস্. এম্. শিশুখাদ্য ২১,৮৬৫ পাঃ, গুঁড়ো দুধ ২৫০ পাঃ, কম্বল ৪৫০, ধুতি ১৭৫, শাড়ী ৫৭৪, লুঙ্গি ৯৭, সোয়েটার ১,৮৬৭, গামছা ১৭, মশারি ১৩, শার্ট ১৫, শিশুদের পোশাক ১৯৫, পুরাণো কাপড় ৫৯৪, জুতা ৭ জোড়া ও সাবান ৫০২ খণ্ড।

বাগেরহাট কেন্দ্র ১১টি নলকূপ স্থাপন, তিনটি কুঁড়ে ঘর ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করে। ঐ কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১৩,৪৮২, বিতরিত হয়: বিস্কুট ১০০'৫ কেজি, গুঁড়ো দুধ ১৭৪ পাঃ, কম্বল ৪২, ধুতি ১৫২, শাড়ী ১,৭০১ ও পাঠ্য-পুস্তক ৪৫৬টি।

দিনাজপুর কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৫,৬১৭ এবং পাঁচটি কুঁড়ে ঘর তৈরি করা হয় ও বিতরিত হয়: গুঁড়ো দুধ ১০০০ পাঃ, ভিটামিন ট্যাবলেট ৮৯৯ ও শাড়ী ৪৯৫।

গুজরাত বন্যাত্রাণ কার্য: বনস্কণ্ঠ জিলায় নগরপরকার হইতে আগত উদ্বাস্তদের মধ্যে ৬০০ পশমের কম্বল এবং রাজকোটে অভাবগ্রস্তদের মধ্যে ২০০০ কেজি বজরা বিতরিত হয়।

পালানপুর জেলার দীশা তালুকে ভোয়ানের বন্যার্তদের জন্য একটি নূতন কলোনী গত ১৫ই এপ্রিল উৎসর্গ করা হয়। কলোনীতে ২০০টি পাকা বাড়ী, একটি সমাজ-গৃহ, একটি স্নানের ঘাট, গো-মহিষাদির জন্য পৃথক্ একটি পুকুর, জল তোলার ব্যবস্থাসহ একটি বাঁধানো কূয়া প্রভৃতি করা হইয়াছে। প্রকল্পটি ছয় লক্ষ টাকার।

গুজরাত দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ: এপ্রিল মাসে ৫,৪২৪ কেজি. বজরা ১,০০৬টি পরিবারের মধ্যে বিতরিত হয়।

উৎসব

চেরাপুঞ্জি: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৩শে মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। শেলা রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন ও উদ্‌যাপন করিয়া রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ চেরায় উপস্থিত হইলে শ্রীমেসিঙ্গ সাইয়েম অধ্যক্ষ মহারাজকে সমস্ত চেরাবাসীর পক্ষ হইতে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। তিনি বলেন: স্থানীয় জনগণ অত্যন্ত আনন্দিত যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা অনুসারে সকলে ধর্মসম্প্রদায়-নিরপেক্ষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করিতেছে এবং পূজ্যপাদ মহারাজজীর আগমনে প্রমাণিত হইতেছে যে, খাসী পাহাড়ের অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন যে সুন্দর কাজ করিতেছে তাহার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় সহানুভূতি রহিয়াছে।

২৩শে সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি লইয়া এক মনোমুগ্ধকর শোভাযাত্রা বাহির হয়। পুরোভাগে গৈরিক বস্ত্র পরিহিত মঠের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসিবৃন্দ এবং পশ্চাদ্‌ভাগে সর্বধর্মের সমন্বয় ও সার্বজনীন মৈত্রীর বাণী সম্বলিত পতাকা লইয়া খাসী ও জয়ন্তী পাহাড়ের সহস্র সহস্র আবালবৃদ্ধবনিতার সুদীর্ঘ শোভাযাত্রাটি

উচ্চ জয়ধ্বনি করিতে করিতে চেরার পথ পরিক্রমা করিয়া ইউরিম ময়দানে আসে। পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মিশনের কারিগরি ও বিজ্ঞান ভবন হইতে সমবেত মহতী জনতার উদ্দেশ্যে তাঁহার আশীর্বাদী ভাষণে বলেন: 'বন্ধুগণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উৎসবে তাঁকে ভক্তি-অর্ঘ নিবেদন করতে আপনারা বিভিন্ন গ্রাম থেকে এখানে এসে সমবেত হয়েছেন দেখে আমি বিশেষ আনন্দিত। আপনারা জানেন, শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতামাতা দরিদ্র কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ছিলেন এবং তিনি নিজেও যে-অর্থে বর্তমানকালে 'শিক্ষিত'-শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে 'শিক্ষিত' ছিলেন না। তথাপি আন্তরিক অধ্যাত্ম-সাধনসহায়ে তিনি ঈশ্বরলাভ করেন এবং আজ তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অধ্যাত্ম-গগনের প্রথম শ্রেণীর জ্যোতিষ্করূপে পরিগণিত। তিনি ঘোষণা করে গেছেন যে, ভগবান আছেন, তিনি বাস্তব সত্য আর তিনি তাঁকে দর্শন করেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং যে কেহ অধ্যাত্ম-সাধনা করবে সে-ই এই জীবনেই তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবে। এই নির্ভীক প্রত্যয়দৃঢ় বাণী ঈশ্বর-অস্তিত্বে সংশয়ী বিশ্বকে ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়েছে। অধিকন্তু তিনি বিভিন্ন ধর্মসমূহের নির্ধারিত সাধন-পদ্ধতি অনুশীলন করে একই লক্ষ্যে পৌছান অর্থাৎ প্রতি ধর্মপথেই ঈশ্বরলাভ করেন। ফলতঃ তিনি প্রচার করেন বিভিন্ন ধর্ম ঈশ্বরলাভের বিভিন্ন পথমাত্র—'যত মত, তত পথ।' সুতরাং তিনি কোন একটি ধর্মকে অপর সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করতেন না। অজ্ঞানবশতই মানুষ ঐরূপ চিন্তা করত এবং এই কারণে তিনি ধর্মান্তরিতকরণে বিশ্বাস করতেন না।

'শ্রীরামকৃষ্ণ একজন হিন্দুকে আরো ভাল হিন্দু, একজন খ্রীষ্টানকে আরো ভালো খ্রীষ্টান, একজন মুসলমানকে আরো ভালো মুসলমান এবং একজন বৌদ্ধকে আরো ভালো বৌদ্ধ হতে বলতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কেবল ধর্ম-পরিবর্তনই মানুষকে ঈশ্বর লাভে সাহায্য করবে না। প্রয়োজন অকপট আন্তরিক সাধনা। যদি কেউ তার নিজের ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী সাধনা করে, তবে সে নিশ্চয়ই শীঘ্রতর ঈশ্বর লাভ করবে।

'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উদার বাণী: 'ঈশ্বর সত্য এবং যে কোন ধর্মপথেই তাঁকে পাওয়া যায়'—জগতের চিন্তাধারাকে আকৃষ্ট করেছে এবং বিভিন্ন দেশের বহু মনীষী ও লেখক উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর এই বাণীতে জগতে এক শান্তি ও সমন্বয়ের নবযুগ আনবার শক্তি অন্তর্নিহিত। তাঁর এই বাণী ইতিমধ্যেই দূরে ও নিকটে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে যেমন, ফিনল্যাণ্ডে, ইউরোপের অনেক জায়গায়, আফ্রিকায়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, জাপানে, অস্ট্রেলিয়ায়, দক্ষিণ আমেরিকা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এবং দিনের পর দিন তা আরো বিস্তার লাভ করছে। বৈজ্ঞানিক মনোভাবযুক্ত বর্তমানের মানুষের কাছে এই বাণীর বিশেষ আবেদন থাকায় তা সর্বত্রই উৎসাহভরে গৃহীত হচ্ছে।

'আপনাদেরই একজন হিসাবে এই উৎসবে যোগদান করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভক্তি-অর্ঘ প্রদান করতে পেরে আমি অতিশয় আনন্দিত। আমাদের সকলের উপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক্। তাঁর কাছে এই আমার প্রার্থনা। নমস্কার।'

জন্মোৎসবের অঙ্গ হিসাবে ঐদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম আরাত্রিক ভজনাদি, প্রায় ছয় সহস্রাধিক লোকের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি হয়। উপস্থিত সকলকে লইয়া এক সমষ্টি ভোজের পর 'শদ সুধ মাইনসিয়েম' (ঈশ্বরের প্রীতি লাভার্থে খাসী-নৃত্য বিশেষ) অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ নর্তকদের পুরস্কার দেন। রাত্রে ছায়াছবি প্রদর্শনের পর উৎসব শেষ হয়।

দিনাজপুর (বাংলাদেশ) : গত ২৪শে ফেব্রুআরি রামকৃষ্ণ আশ্রমে মহাসমারোহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বৈদিক স্তোত্রপাঠ ও উষাকীর্তনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। শ্রীব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য যথাক্রমে চণ্ডী ও গীতা পাঠ করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন স্বামী কালিকাত্মানন্দ। বিশেষ পূজা ও ভোগ-রাগাদির পর প্রায় দুই হাজার ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। অপরাহ্ণে শ্রীগৌরাঙ্গ ঘোষ ও সহশিল্পিবৃন্দ সুমধুর কণ্ঠে রামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন গাহিয়া সকলকে প্রভূত আনন্দ দান করেন। সাধারণ সভায় আশ্রমের কার্যবিবরণী পাঠের পর শ্রীমতী মিনা ভট্টাচার্য উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন। দিনাজপুর জিলা বোর্ডের সম্পাদক শ্রীদেবপ্রসাদ দাসগুপ্ত মহাশয় সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। অধ্যাপক মতিয়র রহমান, অধ্যাপক শান্তিনারায়ণ চক্রবর্তী ও জনাব আব্‌দুল জব্বার মিঞা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রী জনাব ইউসুফ আলী সাহেব বর্তমান সমস্যা-পরিপূর্ণ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শকে অনুসরণ করিবার জন্য জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। দিনাজপুর পঞ্চগড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় সভাপতির ভাষণে দিনাজপুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবধারা প্রচারের জন্য শিক্ষিত জনসাধারণকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করেন। ধন্যবাদ প্রদানের পর সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুস্মিতা বসু। সন্ধ্যারতির পর ভক্তিমূলক সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন ওস্তাদ ছাইমুদ আলী খাঁ, ওস্তাদ কছির উদ্দিন, নিভা ভাদোড়, সন্ধ্যা ভট্টাচার্য, আবদুস সাত্তার, বৈদ্যনাথ গোস্বামী প্রমুখ শহরের বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শত শত ভক্ত নরনারী এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

পুরুলিয়া : রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের নব-নির্মিত প্রার্থনা-গৃহের উদ্বোধন গত ৮ই মার্চ, ১৯৭৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। চারদিন ব্যাপী এই উৎসবে স্থানীয় জনসাধারণ, বিদ্যাপীঠের শিক্ষক, কর্মী ও ছাত্রবৃন্দ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সমাগত সাধু ব্রহ্মচারিগণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মূল উৎসবটিতে পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী। ৮ই মার্চের প্রত্যূষে শোভাযাত্রা সহকারে পুরাতন প্রার্থনাগৃহ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি আনয়ন করিয়া নূতন প্রার্থনা-গৃহের বেদীমূলে স্থাপিত করা হয়। সারাদিন ধরিয়া বিশেষ পূজা ও হোম সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণে আশ্রমপ্রাঙ্গণে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ভাষণ দেন। বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় দুই হাজার গ্রামবাসী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সারাদিন ধরিয়া খোল-করতাল সহযোগে নাম-কীর্তন করা হয়। সকলকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। একটি গ্রামের মুসলমানগণ লাঠি খেলা দেখাইয়া সমবেত জনগণকে তৃপ্ত করেন।

মূল উৎসবটিকে কেন্দ্র করিয়া গত ৩রা মার্চ স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে (বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা বাদে) একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। স্বামী

গম্ভীরানন্দজী পুরস্কার বিতরণ করেন। ৬ই, ৭ই ও ৮ই মার্চ প্রতি সন্ধ্যায় নাট্যাভিনয় ছৌ-নৃত্য আদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও ছিল।

বাগেরহাট (বাংলাদেশ): গত ৭ই চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৯তম শুভ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের প্রথমদিন পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও আলোচনা হয়। বৈকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি আলোচনাসভায় সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ ওয়াজেদুল হক সাহেব। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীকুবেরচন্দ্র বিশ্বাস এম. পি.। সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবধারা অবলম্বনে বক্তৃতা করেন শ্রীবিনোদবিহারী সেন, শ্রীশিবপদ বসু ও অধ্যাপক হালিমুজ্জমান সাহেব।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে পূর্বাহ্ণে ভাগবত পাঠ ও আলোচনা করেন পণ্ডিত শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ। বৈকালে আশ্রমপ্রাঙ্গণে আয়োজিত সর্বধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী উমানন্দ। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শেখ ফজলুল হক মনি ও জনাব মীর মোশরাফ আলী। বেদ কোরান বাইবেল ও ধম্মপদ পাঠান্তে সভার কার্য আরম্ভ হয়। সভায় আশ্রমের 'কার্য-বিবরণী' পাঠ করেন স্বামী পরদেবানন্দ। অতঃপর আলোচনা সভায় ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন জনাব মেসবাহ্‌উদ্দীন ইকবালী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), খ্রীষ্টধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন রেভারেণ্ড ফাদার এম. ক্রেস্তানী (সেন্ট জোশেফ্‌স্ চার্চ), হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন ডঃ রামমোহন চক্রবর্তী। সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি সকল ধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ নিজ নিজ ভাষণে উল্লেখ করেন। বাগেরহাট বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ মঙ্গলবাদ্যের মাধ্যমে সমবেত অতিথিবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সভান্তে রাত্রে আশ্রমপ্রাঙ্গণে পদাবলী কীর্তন হয়।

উৎসবের তৃতীয় দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাহ্ণে পণ্ডিত রামমোহন চক্রবর্তী কর্তৃক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও আলোচনা এবং মধ্যাহ্নে পদাবলী কীর্তন হয়। এই দিনের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল দরিদ্রনারায়ণ-সেবা। বৈকালের আলোচনা সভায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন মিসেস্ আসফিয়া সা'দ, প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডঃ রামমোহন চক্রবর্তী। নারীসমাজে সারদাদেবীর অবদান—এই সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী গীতা সাহা, শ্রীশিবপদ বসু, শ্রীকুবেরচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

সুবর্ণ জয়ন্তী

শেলা: রামকৃষ্ণ মিশনের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব গত মার্চ মাসে মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে মার্চ উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। চেরাপুঞ্জি হইতে ৪০ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত এই শেলা গ্রাম। অবিস্মরণীয়-কীর্তি স্বামী প্রভানন্দ (কেতকী মহারাজ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের যে কার্য শুরু করেন, কালক্রমে তাহা বিপুল আকার ধারণ করে এবং চেরাপুঞ্জি আদি অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। এই দিন শেলা আশ্রমের ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে অধ্যক্ষ মহারাজ প্রমুখ রামকৃষ্ণ মঠের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসিগণের শুভাগমনে শেলার চতুর্দিকের ও দক্ষিণ খাসী পাহাড়ের গ্রামবাসী ভক্তগণের যে বিরাট সমাবেশ হয়, তাহা অভূতপূর্ব। অধ্যক্ষ মহারাজ নব-

নির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির এবং ৫০০ জনের উপযুক্ত প্রার্থনা-গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন কার্য শত শত সমবেত উৎসাহী ভক্তের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করেন।

স্বামী চিতানন্দ নূতন মন্দিরে বিশেষ পূজা করেন ও প্রার্থনা-গৃহে বৈদিক স্তোত্র পাঠ ও ভজন গান হয়। প্রাতঃকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি সহ এক মিছিল গ্রামের রাস্তা উচ্চ জয়ধ্বনি সহকারে পরিক্রমা করে। মধ্যাহ্নে ভক্তসেবা ও সন্ধ্যায় রামনাম কীর্তন হয়। শেলার গ্রামবাসীরা এবং বাংলাদেশের সংলগ্ন স্থান হইতে আগত অন্যান্য সকলে অধ্যক্ষ মহারাজের পুণ্য দর্শনে পরম প্রীত হন। পূজ্যপাদ মহারাজজী শেলা বাজারে আগমন করিলে এক বিরাট জনতা জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানায়। সর্বত্র এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্ট হয়।

এতদুপলক্ষে একটি সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ২০শে বৈকালে স্বামী গোকুলানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও খাসী ভাষায় তর্জমা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

২১শে মার্চ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে শেলা গ্রামে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী ভূতেশানন্দ প্রমুখ ইংরেজীতে এবং সর্বশ্রী ফিলন সিংহ, রামানন্দ রায় ও হেম দত্ত খাসীতে ভাষণ দেন।

২৫শে মার্চ, ১৯৭৪ সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি দিবসে চেরাপুঞ্জি বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী স্মারক ভবনে এক জনসভা আহূত হয়। ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন স্বামী শুদ্ধবোধানন্দ, যিনি চেরা কেন্দ্রের প্রাক্তন পরিচালক হিসাবে জীবনের ২৪ বৎসর এই অঞ্চলের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রধান অতিথি ছিলেন উত্তর-পূর্ব পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ্মশ্রী ডাঃ চন্দ্রন দেবনেসান। খাসী স্কুলের শিশুদের উদ্বোধন সঙ্গীত এবং শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়ের পরিচালনাধীনে খাসী ভাষায় ভারতীয় স্বদেশী সঙ্গীত দ্বারা অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়।

মিশনের গ্রামাঞ্চলের স্কুলের ছাত্রদেরও উৎসব নানারূপ নৃত্য গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণ শিক্ষক শ্রীদীয়ন রয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী প্রভানন্দ (কেতকী মহারাজ) সম্বন্ধে খাসী ভাষায় উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করেন।

ডাঃ দেবনেসান রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেন এবং বলেন তিনি মাদ্রাজ ও সুদূর ফিজি দ্বীপে মিশনের কাজের সঙ্গে বহু বৎসর ধরেই বিশেষভাবে পরিচিত। ধর্মীয় সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি বর্তমানে অচল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক শিক্ষানুযায়ী সর্বধর্মসমন্বয় ও পরধর্মসহিষ্ণুতার অনুশীলন করিতে তিনি বলেন। তিনি চেরা রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যালয়সমূহের পুঁথিগত বিদ্যার সহিত নানা প্রকার হাতের কাজ ও কারিগরি শিক্ষা দানের ব্যবস্থাতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। খাসীদের স্বীয় রাজ্য ও তাহার সম্পদের উন্নতিকল্পে তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে কাজে লাগাতে বলেন। তিনি খাসী ছাত্রদের স্বীয় কৃষ্টির উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গুণগ্রাম ভারতীয় কৃষ্টির উন্নতিকল্পে প্রদান করিতে এবং ভারতের অন্যান্য অংশের যাহা কিছু ভাল তাহা আয়ত্ত করিতে বলেন।

অতঃপর অধ্যাপক কপিল চ্যাটার্জী এই সব পার্বত্য অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের মঙ্গলকর কার্যের উল্লেখ করেন এবং বিশেষরূপে খাসী তরুণদিগকে অগ্রসর হইয়া নিঃস্বার্থ মানবসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করিতে আহ্বান জানান। তিনি তাহাদের অনুন্নত হিসাবে কৃপাপাত্র হইয়া না থাকিয়া অভ্যুত্থিত হইয়া আত্মত্যাগের মাধ্যমে জাতির সেবায় নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া প্রমাণ করিতে বলেন যে, তাহারা অন্যান্য অংশের ভারতবাসীর সমকক্ষ।

সভাপতির ভাষণে স্বামী শুদ্ধবোধানন্দ বলেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রটি উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে এবং উপজাতীয় লোকদের প্রগতি ও জাতীয় ঐক্যের দিকে পরিচালিত করিতেছে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা জনগণকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে বলেন কারণ, এই পথেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্প্রসারিত হইবে এবং জাতির উন্নতির জন্য উদার দৃষ্টিলাভের ও উপজাতীয় লোকদের ভারতের অধিক অগ্রসর জনগণের সহিত সমপর্যায়ে উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে।

শ্রী এ কে বর্মন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা: গত ৩০শে ও ৩১শে চৈত্র পশ্চিমরাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম দিন 'অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের' পরিচালনায় 'যুব শিক্ষণ শিবির'-এ যুবকগণ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ, মনঃসংযোগ ক্লাস, আবৃত্তি ও ড্রিল ইত্যাদি করেন। শ্রীতুষার বোস, শ্রীতনু পাল ও শ্রীবুদ্ধ দাসগুপ্ত প্রভৃতি এই শিবির পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় দিন মঙ্গলারতি, কথামৃত পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও প্রসাদ বিতরিত হয়। বৈকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ। বক্তা ছিলেন স্বামী জিতাত্মানন্দ। সভায় প্রচুর লোক সমাগম হয়। সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের সৌজন্যে 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ছায়াছবি দেখান হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে খ্যাতনামা লেখকদের প্রবন্ধ সম্বলিত একটি মনোরম স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংসদে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের চারদিনব্যাপী আবির্ভাব-উৎসব গত ১৬ই মার্চ হইতে যথাযোগ্য সমারোহে বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বিগত ২২ বৎসর যাবৎ এইরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

১৬ই মার্চ উৎসবের প্রারম্ভ দিনে বিশেষ পূজা হোম চণ্ডী ও গীতা পারায়ণ এবং ভজনাদি হয়। স্বামী চিৎসুখানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা করেন এবং রামকৃষ্ণ-সারদা লীলাগীতি করেন শ্রীগণপতি পাঠক। মধ্যাহ্নে প্রায় ১০০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় কালীকীর্তন ও রামকৃষ্ণ-পুঁথি পাঠের পর ধর্মসভায় স্বামী অমৃতত্বানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

১৭ই ও ১৮ই মার্চ রামনাম সংকীর্তন, সাঁথি অমৃত সঙ্ঘ কর্তৃক 'মহিষাসুরবধ' যাত্রা অভিনয়, স্বামী দেবানন্দজীর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা এবং তরজা গান হয়।

উৎসবের শেষদিন ১৯শে মার্চ সন্ধ্যায় মহিলা সভায় প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় ও গৌরী ভট্টাচার্যের ভক্তিগীতির মাধ্যমে মহোৎসব পরিসমাপ্ত হয়।

চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ): গত ২৬শে ফাল্গুন ১৩৮০, রবিবার হইতে চার দিনব্যাপী ধুম বিবেকানন্দ সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি ভজন কীর্তন পূজা পাঠ ভোগ হোম, শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ নগর পরিক্রমা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি ও কথামৃত পাঠ, প্রত্যহ অপরাহ্নে ধর্মসভা, সন্ধ্যারতি, আলোক-

সন্ধ্যা এবং রাত্রে রামায়ণ কীর্তন, নাট্যাভিনয় ইত্যাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী কপিলানন্দ। বক্তৃতা করেন স্বামী মুকুন্দানন্দ গিরি, অধ্যাপক নগেন্দ্রলাল দে, অধ্যাপক বাদলকান্তি পালিত প্রমুখ বক্তাগণ। সমিতির কাম-বিবরণী পাঠ করেন সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মুকুল কর চৌধুরী, লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন প্রখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীগোপাল-কৃষ্ণ ব্যানার্জি। শেষদিন অখণ্ড তারকব্রহ্মনাম কীর্তন হয় ও প্রায় আড়াই হাজার লোক বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ত্রিপুরা: কুমারঘাট রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৭ই এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ইহা কুমারঘাটের প্রথম উৎসব। কীর্তনসহ নগর পরিক্রমা, পূজা হোমাদি, দরিদ্রনারায়ণ সেবা, জনসভা, উত্তর ত্রিপুরা সংস্কৃতি সঙ্ঘের গান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সরকারের তথ্য প্রচার সংস্থা কর্তৃক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের লীলা-কাহিনী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পরিবেশন ইত্যাদি বিবিধ অনুষ্ঠান হয়। উৎসবে উপস্থিত প্রায় ৪।৫ হাজার নরনারী প্রাণে বিপুল উল্লাস ও প্রেরণা লাভ করেন।

দিনহাটা: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৮ই, ৯ই ও ১০ই এপ্রিল স্থানীয় চওড়াহাট কালীবাড়ীতে বিশেষ পূজা, পাঠ ভজন ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্যাহ্নে প্রায় চার হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতিসহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী রুদ্রেশ্বরানন্দ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীহৃষীকেশ সাহা ও অধ্যক্ষ বিষ্ণুপদ মুখার্জি। ছায়াচিত্রে স্বামীজীর চিত্রপ্রদর্শন ও বক্তৃতা করেন শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস। শ্রীরণজিৎ কুমার ঘোষ "বিবেকানন্দ লীলাগীতি" পরিবেশন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বলিত একটি প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল।

দুর্গাপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, জননী সারদাদেবী ও শ্রীমৎ স্বামীজীর জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১৭।৩।৭৪ তারিখে প্রত্যূষে স্তোত্র, ভজন ইত্যাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ নগর-কীর্তন বাহির হয় এবং শহরের কয়েকটি অঞ্চল পরিক্রমা করা হয়। বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পর প্রায় এক হাজার ব্যক্তিকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ দিন বৈকালে এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীচিত্তরঞ্জন গুহ মজুমদার। ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী মিত্রানন্দ ও শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। বক্তৃতার পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘের সভ্যাবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। পরদিন বৈকালেও জনসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীমতী গীতা ঘোষ। ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধ-প্রাণা ও ডঃ জি. পি. চ্যাটার্জি এবং সভাশেষে ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রখ্যাত বেতারশিল্পী শ্রীহীরালাল সরখেল, শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়। তবলা সঙ্গতে ছিলেন শ্রীগোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

দোমড়া: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৭ই চৈত্র, ১৩৮০, রবিবার, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৯তম জন্মোৎসব মঙ্গলারতি প্রভাতফেরী বিশেষ পূজা হোম প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্র-নারায়ণসেবার মাধ্যমে পালিত হয়। প্রায় সাড়ে তিন হাজার নর-নারায়ণ খিচুড়ি প্রসাদ পান। বৈকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী পাঠ ও আলোচনা হয় এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজন কীর্তনাদি হয়।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

[পুনর্মুদ্রণ]

গোবরা।

(কবিবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

(পূর্বানুবৃত্তি)

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময় কেন ?" মেম উত্তর করিল, "নিত্য কে আমাকে একটী ফুলের তোড়া দিয়া যায়। চাপরাসীকে জিজ্ঞাসা করি, কে ? বলে—একটী স্ত্রীলোক—কিছু বলে না,—বলে মেম সাহেবকে দিও,—বুঝিতে পারিবে। আজ আমি তাহাকে ডাকাইয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করায় বুঝিতে পারিলাম, সে কোন বড়মানুষের আয়া ছিল। যে বাবাকে মানুষ করিয়াছিল, তাহার এক্ষণে তোমাদ্বারা সাজা হইবার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত আমার উপাসনা করা। তাহার কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আশ্চর্য্য !" পরদিন আসিয়া বাদীর অভাবে মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলেন।

উমাচরণের প্রায়ই আর কিছু নাই। সর্ব্বস্ব আদাদরে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। মকদ্দমা করিতে পারিলে কিছু সম্পত্তি ফিরিয়া পাওয়া যায়। মকদ্দমাও রুজু হইয়াছে, জিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু আর দুই তিন হাজার টাকা ব্যতীত খরচা চলে না, টাকারও কোথাও যোগাড় নাই। উকীল টাকা দিতে চায় না, অনেক "আউট অফ পকেট" খরচা সে নিজ হইতে দিয়াছে। মকদ্দমা যে জিত হইবে, সে এরূপ বুঝিতেছে না; একপ্রকার সঙ্কল্পই করিয়াছে যে, টাকা না পাইলে আর মকদ্দমা চালাইবে না। কোনও উপায় নাই—সব দিক শূন্য ! মুদীখানায় ধারে দ্রব্য দেয় না এরূপ অবস্থা ! হঠাৎ মণি বাগ্দিনী আসিয়া পাঁচ হাজার টাকার নোট দিয়া গেল। বলিয়া গেল, "গোবরা, আর একবার তোর সঙ্গে দেখা হবে। আমি ঠিক দেখিয়াছি মকদ্দমায় জিতিবি, কিন্তু বুঝিয়া চলিস্। তোর ঠেঙ্গে কখনও কিছু চাই নাই—আর একদিন আসিয়া একটী জিনিস চাহিব। আমি তোরে মানুষ করেছি আমায় দিস্।"

মকদ্দমা জিত হইল। সব দিকে সচ্ছল;—কিন্তু এবার মণি বাগ্দিনী একটী দৃঢ় ছাপ তাহার হৃদয়ে দিয়াছে। এ দুঃখিনী বাগ্দিনী টাকা কোথা পাইল ? ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গোপনে শুনিয়াছিল,—যে, কোনও এক স্ত্রীলোকের অনুরোধে সে বাঁচিয়াছে ! একজিকিউটারেরও অদ্ভুত ব্যাপার। ইহাও শুনিল যে তাহার স্ত্রীর বসন্তরোগে একটী রমণী শুশ্রূষা করিয়াছে। রাস্তায় গাড়ী হইতে পড়িয়াছিল—বাগ্দিনী তথায়;—মহা দুর্দ্দিনে টাকা আনিয়া দিল। পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল,—মাতার মৃত্যুশয্যার কথা,—পিতার যন্ত্রণা—আপনার চরিত্র—স্মৃতিপথে উঠিতে লাগিল। যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই, দেবসেবায় পিতা তাঁহার সম্পত্তি দিয়া যাবেন,—সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার জনমে, তাঁহার সে সঙ্কল্প ভঙ্গ হইল। সেই দেব-উৎসর্গ অর্থ, বেশ্যা, শুঁড়ী, বদ্‌মাইসে খাইয়াছে,—অকলঙ্ক কুলে প্রতারণার দাগ পড়িয়াছে ! ক্রমে তীব্র হইয়া স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। সুদিন,—সহচরেরা ফিরিল, আর স্থান পাইল না। পরিবার মরিয়াছে; বেশ্যার

প্রেমে আর দারপরিগ্রহ করে নাই ; সুতরাং আপনার বলিবার আর কেহই ছিল না। সর্ব্বদা নির্জ্জনেই বাস। একদিন দেখিল বাগ্দিনী !—বাগ্দিনী কাঁপিতেছে,—অতি কষ্টে শ্বাস ত্যাগ করিতেছে। বাগ্দিনী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—"গোবরা, আজ আমি মরিব। তোর নিকট সেই জিনিস চাহিতে এসেছি। ভয় নাই,—তুই ব্রাহ্মণের ছেলে,—তোকে আমি সৎকার করিতে বলিব না,—আমি আপনি মায়ের গর্ভে গিয়া মরিতে পারিব,—তারপর আমার আর ভয় কি ? তোর মনে আছে—তোর বাপ আমায় তাড়াইয়া দেয়,—আমি কাঁদি নাই,—তোকে দেখিবার সাধ করি নাই। তুই কাছে গেলে, দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতাম। কেন জানিস্ ? - আমায় কে দেবতা বলিয়া দিল যে, ব্রাহ্মণ তোর ভালর নিমিত্ত আমাকে তাড়াইতে চায়, - তাই চলিয়া গেলাম। তোর ভাল হবে—এই ধারণায়,—তোর অকল্যাণ হবে - এই ভয়ে, চক্ষের জল ফেলি নাই। পাছে তুই স্নেহবশতঃ আমার কাছে আসিস্. তাই দূর ছাই করিতাম। তোর মা যে সামগ্রী পাঠাইত, তাহা ব্রাহ্মণ সজ্জনকে দিয়া তোর কল্যাণ চাহিতাম। কিন্তু আমার খাবার সময় বড় কষ্ট হইত। আমি মনে মনে তোকে কাছে বসাইয়া—তোকে খাওয়াইয়া খাইতাম। ক্রমে তুই আমার কাছে আসিতিস্, তুই জানিস্ না তুই আসিতিস্। তুই কোথা যাইবি,—কি করিবি,—আমায় বলিয়া যাইতিস্। তোর বিপদ হবে,—এ কথা কে আমাকে বলিয়া দিত,—আমি সেই দিন তোর সঙ্গে থাকিতাম। আমি তোর নিমিত্ত আত্মবঞ্চনা করিয়া সোনা দানা যা' তোদের বাড়ীতে পাইয়াছিলাম, তাহা পোদ্দারকে দিয়া,—ঘুঁটে বেচিয়া,— শ্রম করিয়া—পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। তোর শত সহস্র দোষ। তত্রাচ আমি নিরাশ হই নাই। দেখিয়াছি—তোর পিতামাতার প্রতি অচলা ভক্তি,—তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি অতি শ্রদ্ধার সহিত করিয়াছিলি। আমিও তোর মা—শাস্ত্রমত মা—ভিক্ষা মা। আমারও তোর উপর অধিকার আছে। আমার একটী কার্য কর্,—আর কুপথে চলিস্ না। যে বংশে জন্মিয়াছিস্—সেই বংশের মুখ উজ্জ্বল কর্। তা'হলে তোর পিতামাতার নিকট গিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারিব,—ছাখ্ - তোরা পারিস্নি, আমি তোদের ছেলে শুধরাইয়া দিয়াছি। উমাচরণ কাঁদিয়া বলিল, "মা, আমি শুধরাইব।" "তবে আয়—আমার সঙ্গে আয় !"—বাগ্দিনী ধীরে ধীরে গঙ্গা অভিমুখে চলিল। অতি কষ্টে চলে,—উমাচরণ ধরিতে যায়,—বাগ্দিনী নিষেধ করিল। উমাচরণ সভয়ে নিষেধ মানিল।—সম্মুখে তেজস্বিনী দেবী দেখিতেছে,—ধীরে ধীরে সঙ্গে চলিল। বাগ্দিনী অর্দ্ধ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ স্থলে শয়ন করিয়া বলিল,—"গোবরা, আমায় নাম শোনা।" উমাচরণ হরিনাম শুনাইল। বাগ্দিনী হরিনাম করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। বৈষ্ণব ডাকাইয়া উমাচরণ চন্দন কাষ্ঠে শবদাহ করাইল ও চিতা পরিবেষ্টন করিয়া হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিল। চিতায় জল ঢালিয়া হরি হরি ধ্বনি করিতে করিতে বাটী ফিরিল। বাগ্দিনীর উদ্দেশে অকাতরে দান ধ্যান করিয়া, আপনার সমস্ত সম্পত্তি বেচিয়া,—গঙ্গার ঘাট ও শিব প্রতিষ্ঠা করিল। সাহেবের উপদেশে নানাবিধ কার্য্য শিখিয়াছিল। স্বয়ং রোজকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আপনার মত রাখিয়া - দুঃখীদিগকে দান করে। ক্রমে সমস্ত সৎকার্য্যে ব্রতী। যথায় হয়—কিঞ্চিৎ আহার হইলেই হইল। এই রূপে অতি সৎকার্য্যে, উমাচরণের জাহ্নবীতীরে কার্য্যের অবসান হইল। সকলে বলিল,—কুলতিলক জন্মিয়াছিল।

বর্ত্তমান ভারত।

(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভারতবর্ষে আবার বিষয়ভোগতৃপ্ত মহারাজগণ অন্তে অরণ্যাশ্রয়ী হইয়া অধ্যাত্মবিদ্যার প্রথম গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অত ভোগের পর বৈরাগ্য আসিতেই হইবে। সে বৈরাগ্য এব গভীর দার্শনিক চিন্তার ফলস্বরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বে একান্ত অনুরাগ এবং মন্ত্রবহুল ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা, উপনিষদ্, গীতা এবং জৈন ও বৌদ্ধদের গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে প্রচারিত। এস্থানেও ভারতে পৌরোহিত্য ও রাজন্যশক্তিদ্বয়ের বিষম কলহ। কর্ম্মকাণ্ডের বিলোপ পুরোহিতের বৃত্তিনাশ, কাজেই স্বভাবতঃ সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের পুরোহিত প্রাচীন রীতিনীতির রক্ষায় বদ্ধপরিকর, অপরদিকে শাপ ও চাপ উভয়হস্ত জনকাদি ক্ষত্রিয়কুল, সে বিষম দ্বন্দ্বের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পুরোহিত যে প্রকার সর্ব্ববিদ্যা কেন্দ্রীভূত করিতে সচেষ্ট, রাজা সেই প্রকার সকল পার্থিবশক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে যত্নবান। উভয়েরই উপকার আছে। উভয় বস্তুই সময় বিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য আবশ্যক, কিন্তু সে কেবল সমাজের শৈশবাবস্থায়। যৌবনপূর্ণদেহ সমাজকে বালোপযোগী বস্ত্রে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিলে, হয় সমাজ স্বীয় তেজে বন্ধন ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হয় ও যথায় তাহা করিতে অক্ষম, সেথায় ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার অসভ্যাবস্থায় পরিণত হয়।

রাজা প্রজাদিগের পিতামাতা, প্রজারা তাঁহার শিশুসন্তান। প্রজাদের সর্ব্বতোভাবে রাজমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত এবং রাজা সর্ব্বদা নিরপেক্ষ হইয়া আপন ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে পালন করিবেন। কিন্তু যে নীতি গৃহে গৃহে প্রযোজিত, তাহা সমগ্র দেশেও প্রচার। সমাজ গৃহের সমষ্টি মাত্র। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' যদি প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজশিশু কি সে ষোড়শবর্ষ কখনই প্রাপ্ত হয় না? ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল সমাজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধে জয় পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে। ভারতবর্ষ ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মই এ দেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বারম্বার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা ধর্ম্মের নামে সংসাধিত। চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্ম্মতরঙ্গ, পশ্চাতে নৈতিক অভাবের পূরণ। অর্থহীন শব্দনিচয়ের উচ্চারণে যদি সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কে আর বাসনাতৃপ্তির জন্য কষ্টসাধ্য পুরুষকারকে অবলম্বন করিবে? সমগ্র সমাজশরীরে যদি এই রোগ প্রবেশ করে, সমাজ একেবারে উদ্যমবিহীন হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। কাজেই প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাকদিগের হাড়্‌মাংসভেদী শ্লেষের আবির্ভাব। পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্ম্মকাণ্ডের প্রাণনিষ্পীড়ক ভার হইতে সমাজকে সদাচার ও জ্ঞানমাত্রাশ্রয় জৈন এবং অধিকৃতজাতিদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে নিম্নস্তরস্থ মনুষ্যকুলকে বৌদ্ধবিপ্লব ভিন্ন কে উদ্ধার করিত? কালে যখন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল সদাচার মহা অনাচারে পরিণত হইল ও সাম্যবাদের আতিশয্যে স্বগৃহে প্রবিষ্ট নানা

বর্ব্বর জাতির পৈশাচিক নৃত্যে সমাজ টলমলায়মান হইল, তখন যথাসম্ভব পূর্ব্বভাব পুনঃস্থাপনের জন্য শঙ্কর ও রামানুজের চেষ্টা। আবার কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ না জন্মগ্রহণ করিলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ও কৃশ্চীয়ানের সংখ্যা যে ভারতে অনেক অধিক হইত, তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই।

ভোজ্যদ্রব্যের ন্যায় নানাধাতুবিশিষ্ট শরীর ও অনন্ত ভাবতরঙ্গশালী চিত্তের আর কি প্রকৃষ্ট উপাদান? কিন্তু যে খাদ্য দেহরক্ষা ও মনের বলসমাধানে একান্ত আবশ্যক, তাহারই শেষাংশ যথাসময়ে শরীর হইতে বহিষ্কৃত হইতে না পারিলেই সকল অনর্থের মূল হয়।

সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্ত্তব্য। শুধু কর্ত্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব। প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার? সমাজের চক্ষে অনেকদিন ঠুলি দেওয়া চলে না। উপরে আবর্জ্জনারাশি যতই কেন সঞ্চিত হউক না, সেই স্তূপের তলদেশে প্রেমস্বরূপ, নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্য্যে যুগযুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

তমসাচ্ছন্ন পাশবপ্রকৃতি মানুষ আমরা, সহস্রবার ঠেকিয়া এ মহান্ সত্যে বিশ্বাস করি না, সহস্রবার ঠকিয়াও আবার ঠকাইতে যাই—উন্মত্তবৎ কল্পনা করি যে, আমরা প্রকৃতিকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম। অত্যল্পদর্শী, মনে করি, যে কোন প্রকারে হউক, নিজের স্বার্থসাধনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য্য, যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্ব্বার সঞ্চারের জন্য, এ কথা মনে থাকে না, গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত।

প্রজাসমষ্টির শক্তিকেন্দ্ররূপ রাজা অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যান যে, তাঁহাতে শক্তিসঞ্চয় কেবল 'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং'। বেণ রাজার ন্যায় তিনি সর্ব্বদেবত্বের আরোপ আপনাতে করিয়া, অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষ্যত্বমাত্র দেখেন, সু হউক বা কু হউক, তাঁহার ইচ্ছার ব্যাঘাতই মহাপাপ। পালনের স্থানে কাযেই পীড়ন আসিয়া পড়ে - রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ। যদি সমাজ নির্বীর্য্য হয়, নীরবে সহ্য করে, রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীঘ্রই বীর্য্যবান অন্যজাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয়। যেথায় সমাজশরীর বলবান, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতিদূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।

যে মহাশক্তির ভ্রূভঙ্গে 'থরথরি রক্ষনাথ কাঁপে লঙ্কাপুরে,' যাহার হস্তধৃত সুবর্ণভাণ্ডরূপ বকাণ্ডপ্রত্যাশায় মহারাজ হইতে ভিক্ষুক পর্য্যন্ত বকপংক্তির ন্যায় বিনীতমস্তকে পশ্চাদ্‌গমন করিতেছে, সেই বৈশ্যশক্তির বিকাশই পূর্ব্বোক্ত প্রতিক্রিয়ার ফল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল, আমি সেই বিদ্যা উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে

চলিবে, দিন কতক তাহাই হইল। ক্ষত্রিয় বলিলেন, আমার অস্ত্রবল না থাকিলে বিদ্যাবল সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও, আমিই শ্রেষ্ঠ ; কোষমধ্যে অসিঝনৎকার হইল, সমাজ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিল। বিদ্যার উপাসকও সর্ব্বাগ্রে রাজোপাসকে পরিণত হইলেন। বৈশ্য বলিতেছেন, উন্মাদ! 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমরা যাঁহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী, অনন্তশক্তিমান, আমার হস্তে। দেখ, ইহার কৃপায় আমিও সর্ব্বশক্তিমান। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি, ইহারই প্রসাদে, আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্র শস্ত্র, তেজ বীর্য্য, ইহার কৃপায় আমার অভিমত সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানা সকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধুপান করিবে কে ?—আমি যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি। [ক্রমশঃ]

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

(১) ধ্যান করবে মনে, বনে, আর কোণে।

(২) প্রথম অবস্থায় একটু নির্জ্জনে বসে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়, তার পর যখন ঠিক অভ্যাস হয়, তখন যেখানে সেখানে ধ্যান করতে পারে। যেমন গাছ, যখন ছোট ছোট থাকে, তখন তাদের যত্ন করে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, তা না হ'লে গরু ছাগলে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে, পরে যখন গুড়ি মোটা হয়, তাতে দশটা গরু ছাগল বাঁধলেও কিছুই করতে পারে না।

(৩) সত্ত্বগুণীর ধ্যান কিরূপ জান, তারা রাত্রে মশারি খাটিয়ে তাহার ভিতর বসে ধ্যান করে। লোকে মনে করে যে ঘুমুচ্চে। তাঁদের বাহ্যিক লোক দেখান ভাব একেবারে নাই।

(৪) "ধ্যানসিদ্ধ যে জন মুক্তি তার ঠাই"। ধ্যানসিদ্ধ কাহাদের বলে জান, যারা ধ্যান করতে বসলেই ভগবানের ভাবে বিভোর হয়ে যায়।

(৫) নেংটা তোতাপুরীকে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তোমার যে অবস্থা, তাহাতে রোজ ধ্যান করবার আবশ্যক কি ? তোতাপুরী উত্তরে বলিয়াছিল, ঘটী যদি রোজ রোজ না মাজা যায়, তা'হলে কলঙ্ক পড়ে। নিত্য ধ্যান না করিলে চিত্ত অশুদ্ধ হয়। পরমহংসদেব উত্তরে বলিলেন, যদি সোনার ঘটী হয় তা হ'লে পড়ে না। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ লাভ করিলে আর সাধনের দরকার নাই।

(৬) (সাধকের) ধ্যানের সময় মধ্যে মধ্যে এক প্রকার নিদ্রার মতন আসে, তাহাকে যোগনিদ্রা বলে। সে অবস্থায় অনেক সাধক ভগবানের রূপ দর্শন পায়।

ভগবদ্গীতা-

শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[১০ম শ্লোকের পর শাঙ্করভাষ্যের কিয়দংশ, বঙ্গানুবাদসহ। —বর্ত্তমান সম্পাদক]

মহাভাষ্যম্।

(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্নকর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভাষ্য-মূল।

দশম্যাং পুত্রস্য।—যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি। "দশম্যুত্তরকালং পুত্রস্য জাতস্য নাম বিদধ্যাদ্ ঘোষবদাদ্যন্তরন্তঃস্থমবৃদ্ধং ত্রিপুরুষানূকমনরিপ্রতিষ্ঠিতং, তদ্ধি প্রতিষ্ঠিততমং ভবতি দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্য্যান্ন তদ্ধিতমিতি।" ন চান্তরেণ ব্যাকরণং কৃতস্তদ্ধিতা বা শক্যা বিজ্ঞাতুম্। দশম্যাং পুত্রস্য।

বঙ্গানুবাদ।

"দশম্যাং পুত্রস্য।" "দশম দিবসের পরে পুত্রের।" নবাভিজাত পুত্রের দশম দিবসের পরে ঘোষবদাদি (অর্থাৎ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব হ ইহাদিগকে ঘোষবান্ বর্ণ কহে। এই সকল বর্ণ যাহার আদিতে থাকে; এইরূপ।) অন্তঃস্থমধ্য (অর্থাৎ য, র, ল, ব ইহাদিগকে অন্তঃস্থবর্ণ বলে) (এই সকল বর্ণ যাহার মধ্যে আছে; এইরূপ) অবৃদ্ধ, ত্রিপুরুষানূক (অর্থাৎ পিতা নামকরণের অধিকারী, তাঁহার পূর্ব্ব তিন পুরুষের নাম বর্ণযুক্ত) শত্রুনামবিহীন, দুই অক্ষর বা চারি অক্ষর বিশিষ্ট কৃৎপ্রত্যয়ান্ত নাম অতিশয় প্রতিষ্ঠিত হয়; তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত নাম করিবে না। ব্যাকরণশাস্ত্রে জ্ঞান ব্যতিরেকে কৃৎপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয় জানিতে পারা যায় না। "দশম্যাং পুত্রস্য।" "দশম দিবসের পরে পুত্রের।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

"সুদেবো অসি।"—সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্তসিন্ধবঃ।
অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যং সুষিরামিব॥"

সুদেবো অসি বরুণ সত্যদেবোঽসি যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ সপ্ত বিভক্তয়ঃ। অনুক্ষরন্তি কাকুদম্। কাকুদং তালু। কাকুর্জিহ্বা সাস্মিন্নুদ্যত ইতি কাকুদম্। সূর্ম্যং সুষিরামিব। তদ্যথা। শোভনামূর্মিং সুষিরামগ্নিরন্তঃ প্রবিশ্য দহতি এবং তে সপ্তসিন্ধবঃ সপ্তবিভক্তয় স্তালন্বনুক্ষরন্তি তেনাসি সত্যদেবঃ। সত্যদেবঃ স্যামিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। সুদেবো অসি।"

বঙ্গানুবাদ।

"সুদেবো অসি।" "বরুণ! তুমি সুদেব!" হে বরুণ! তুমি সুদেব অর্থাৎ সত্যদেব! যে তোমার সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সপ্ত বিভক্তি তালুতে অনুক্ষরিত হইতেছে অর্থাৎ প্রকাশিত হইতেছে। কাকুশব্দের অর্থ জিহ্বা, তাহাতে উদিত হয় অর্থাৎ উৎক্ষিপ্ত হয়, এই অর্থে কাকুদ শব্দে তালু। সুষিরা সূর্মির ন্যায়। সুন্দর উর্মি সূর্মি। (১) যেমন অগ্নি ছিদ্রস্থানে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করে, তদ্রূপ, তোমার সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সপ্তবিভক্তি তালুতে অনুক্ষরিত হইতেছে; সেই কারণবশতঃ তুমি সত্যদেব। সত্যদেব হইব, এই নিমিত্ত ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। "সুদেবো অসি।" "বরুণ! তুমি সত্যদেব।" এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

ভাষ্য-মূল।

কিং পুনরিদং ব্যাকরণমেবাধিজিগাংসমানেভ্যঃ প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে ন পুনরন্যদপি কিঞ্চিৎ।

বঙ্গানুবাদ।

ইহা কি কেবলমাত্র যাঁহারা ব্যাকরণশাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষী, তাঁহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজন বলা হইল, অন্য কিছুই নহে কি? (অর্থাৎ যাঁহারা বেদশাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষী, তাঁহাদিগের নিমিত্তও বলা হইল।)

ভাষ্য-মূল।

ওঁ ইত্যুক্ত্বা বৃত্তান্তশঃ শমিত্যেবমাদীন্ শব্দান্ পঠন্তি। পুরাকল্প এতদাসীৎ। সংস্কারোত্তর-কালং ব্রাহ্মণা ব্যাকরণং স্মাধীয়তে। তেভ্যস্তত্তৎস্থানকরণনাদানুপ্রদানজ্ঞেভ্যো বৈদিকাঃ শব্দা উপদিশ্যন্তে তদদ্যত্বে ন তথা। বেদমধীত্য ত্বরিতা বক্তারো ভবন্তি। বেদান্নো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধা লোকাচ্চ লৌকিকাঃ অনর্থকং ব্যাকরণমিতি। তেভ্য এবং বিপ্রতিপন্নবুদ্ধিভ্যোঽধ্যেতৃভ্যঃ সুহৃদ্ ভূত্বা আচার্য্য ইদং শাস্ত্রমন্বাচষ্টে। ইমানি প্রয়োজনান্যধ্যেয়ং ব্যাকরণমিতি। উক্তঃ শব্দঃ। স্বরূপমপ্যুক্তম্। প্রয়োজনান্যপ্যুক্তানি।

---

(১) এই স্থলে মূলে "সূর্ম্যং সুষিরামিব।" এই পাঠ আছে। "সূর্ম্যম্" এইটি বৈদিক প্রয়োগ। লৌকিক ভাষায় "সূর্মিম্" এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

বঙ্গানুবাদ।

"ওঁ" ইহা উচ্চারণ করিয়া প্রপাঠকক্রমে (১) "শম্" (২) ইত্যাদি শব্দ সকলকে পাঠ করে। পূর্ব্বকল্পে এই নিয়ম ছিল,—ব্রাহ্মণগণ সংস্কারলাভের পর ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা বর্ণের স্থান, করণ, নাদ ও অনুপ্রদান (৩) জ্ঞাত হইলে তাহাদিগকে বৈদিকশব্দ উপদেশ করা হইত। এক্ষণে তাহা নাই। সত্বর বেদ অধ্যয়ন করিয়া বক্তা হয়। বেদ হইতে আমাদিগের বৈদিকশব্দসমূহ এবং লোক হইতে লৌকিকশব্দসমূহ সিদ্ধ আছে; অতএব, ব্যাকরণশাস্ত্র অনর্থক। যে অধ্যেতৃগণ এইরূপ বিপ্রতিপন্নবুদ্ধি, তাহাদিগের নিমিত্ত আচার্য্য সুহৃৎ হইয়া এই ব্যাকরণশাস্ত্রের অনুশাসন করিতেছেন। এই সকল প্রয়োজন আছে, অতএব, ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। শব্দ উক্ত হইয়াছে। শব্দের স্বরূপও বলা হইয়াছে। এবং ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজনও বলা হইয়াছে।

ভাষ্য-মূল।

শব্দানুশাসনমিদানীং কর্ত্তব্যম্। তৎ কথং কর্ত্তব্যম্। কিং শব্দোপদেশঃ কর্ত্তব্য আহোস্বিদপশব্দোপদেশ আহোস্বিদুভয়োপদেশ ইতি। অন্যতরোপদেশেন কৃতং স্যাৎ। তদ্যথা, ভক্ষ্যনিয়মেনাভক্ষ্যপ্রতিষেধো গম্যতে। পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ইত্যুক্তে গম্যতে এতদতোঽন্যেঽভক্ষ্যা ইতি। অভক্ষ্যপ্রতিষেধেন বা ভক্ষ্য নিয়মঃ। তদ্যথা,—অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুক্কুটঃ, অভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকর ইত্যুক্তে গম্যতে এতদারণ্যো ভক্ষ্য ইতি। এবমিহাপি। যদি তাবচ্ছব্দোপদেশঃ ক্রিয়তে গৌরিত্যেতস্মিন্ উপদিষ্টে গম্যতে এতদ্ গাব্যাদয়োঽপশব্দা ইতি। অথাপ্যপশব্দোপদেশঃ ক্রিয়তে গাব্যাদিষ্ উপদিষ্টেষু গম্যত এতদ্ গৌরিত্যেস শব্দ ইতি।

বঙ্গানুবাদ।

এক্ষণে শব্দসমূহের অনুশাসন করা উচিত। তাহা কি প্রকারে করা উচিত? শব্দসমূহের উপদেশই করা উচিত, অথবা অপশব্দসমূহের উপদেশ করা উচিত, অথবা শব্দ ও অপশব্দ এই উভয়েরই উপদেশ করা উচিত? একটির উপদেশ করিলেই কার্য্য সাধিত হয়। যেমন, ভক্ষ্যের নিয়ম করিলেই অভক্ষ্যপ্রতিষেধ বুঝিতে পারা যায়, "পঞ্চ পঞ্চনখ (৪) ভক্ষ্য।" ইহা বলিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহার অন্য অভক্ষ্য। অভক্ষ্যপ্রতিষেধের দ্বারাও ভক্ষ্য নিয়ম হয়। যেমন,—"গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য।" "গ্রাম্য শূকর অভক্ষ্য।" ইহা বলিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহাদিগের বন্য অর্থাৎ বন্য কুক্কুট বা বন্য শূকর ভক্ষ্য। এই স্থলেও এইরূপ। যদি শব্দসমূহের উপদেশ করা হয়, তবে, 'গো' এই শব্দটী উপদেশ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গাবী প্রভৃতি অপশব্দ। আর যদি অপশব্দসমূহের উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে গাবী প্রভৃতির উপদেশ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, 'গো' এইটি শব্দ।

[ক্রমশঃ]

---

(১) বেদের অংশবিভাগবিশেষকে প্রপাঠক কহে।

(২) "শম্" এইটি মঙ্গলবোধক শব্দ।

(৩) স্থান, করণ, নাদ ও অনুপ্রদান এইগুলি পরে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

(৪) শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতো দতঃ॥ মনু।

সজারু, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ ও খরগোস এই পাঁচটীকে পঞ্চ পঞ্চনখ কহে; ইহাদিগের মাংস ভক্ষ্য।

দিব্য বাণী

সমাহিতা যে প্রবিলাপ্য বাহ্যং
শ্রোত্রাদি চেতঃ স্বমহং চিদাত্মনি।
ত এব মুক্তা ভবপাশবন্ধৈ-
র্নান্যে তু পারোক্ষ্যকথাভিধায়িনঃ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৩৫৬

শ্রোত্রাদি বহিরিন্দ্রিয় চিত্তাদি অন্তরিন্দ্রিয়
মমতা-আস্পদ যাহা, জ্ঞানস্বরূপেতে
নিঃশেষে করিয়া লয় সমাধিতে স্থিত রয়
যাঁরা, শুধু তাঁরা মুক্ত ভবপাশ হতে।
আর যারা শাস্ত্রকথা মুখে মাত্র বলে সদা
ভববন্ধমুক্ত তারা নয় কোনমতে।

কথাপ্রসঙ্গে

সেব্যসেবকভাব

একমাত্র হরিই আছেন এবং সেই হরিতে 'আমি' 'তুমি' 'তিনি' 'ইহা' 'তাহা' ইত্যাদি ভেদ নাই—এই অদ্বৈতসিদ্ধান্তকে অনেকেই অপসিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করেন। অপরপক্ষে যাঁহারা এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী, তাঁহাদেরও অধিকাংশই কাযকালে এই সিদ্ধান্ত বিস্মৃত হন। এমন কি, 'ভিন্না জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ'—এই দ্বৈতসিদ্ধান্তটিও তাঁহাদের সম্পূর্ণ মনে থাকে না। মনে থাকে না, 'হরির অনুচরসমূহ'—এই অংশটুকু। মনে থাকে শুধু, উচ্চনীচভাবাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন জীবের কথা। ফলে, উচ্চতম অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বিশ্বাসী হইয়াও, ঈর্ষা দ্বেষ ভয় শোক আদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব হয় না। জীবকুল ভিন্ন হইলেও, স্বরূপতঃ 'হরিরই অনুচর'—এই কথাটিও যদি কার্যক্ষেত্রে মনে থাকিত, তাহা হইলে জগতে এত বিদ্বেষ, এত সংঘর্ষ, এত অশান্তি কখনই বিরাজ করিত না।

'ধর্মের সাধন-প্রণালী ও উদ্দেশ্য'-শীর্ষক একটি বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: "ধর্মের মহান্ তত্ত্বসমূহ, উহার কার্যক্ষেত্র ও পরিকল্পনা সেই স্মরণাতীত যুগেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যে-যুগে জ্ঞানের চরম এবং পরম বাণী বলিয়া কথিত—বেদের সেই 'সোঽহম্' তত্ত্বটি মানুষ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। · এই মহান্ তত্ত্ব আমাদের জন্য পূর্বেই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে; ইহার বাহিরে যাওয়া আমাদের সাধ্য নাই। আমাদের কর্মে, আমাদের জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে উহাকে সার্থক করিতে হইবে, পূর্ণ করিতে হইবে।...বেদান্ত শুধু তত্ত্বটি প্রচার করে এবং সাধন-প্রণালী তোমার উপর ছাড়িয়া দেয়। যে-কোন পথ অনুসরণ কর, যে-কোন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের অনুগামী হও—তাহাতে কিছু আসে যায় না। শুধু লক্ষ্য রাখিও সাধনপথটি যেন তোমার সংস্কার অনুযায়ী হয়, তাহা হইলেই তোমার উন্নতি নিশ্চিত।"

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বেদের ঐ মহত্তম তত্ত্বটি শুনিয়া নিজেদের সংস্কার ও অধিকার বিবেচনা না করিয়াই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বুলিটি আওড়াইতে থাকি এবং মনে করি আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধক আর কে থাকিতে পারে! কেবল বাহ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই 'সোঽহং'-সাধনার অধিকারী হওয়া যায়, ইহা মনে করা মস্ত ভুল। কর্ম ও উপাসনার পর্ব শেষ না করিয়া যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কর্ম- ও উপাসনা-সহায়ে চিত্তশুদ্ধি করিয়া তবেই 'সোঽহং'-সাধনার অধিকার অর্জন করিতে হয়, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন: 'যাদের দেহবুদ্ধি আছে, তাদের সোঽহং এ ভাব ভাল না।' 'সোঽহং সোঽহং করলেই হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। নরেন্দ্রের চোখ সুমুখঠেলা।' "রাজা বসে আছেন, খানসামা যদি রাজার আসনে গিয়ে বসে, আর বলে, 'রাজা তুমি যা আমিও তা' লোকে পাগল বল্‌বে। তবে খানসামার সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা একদিন বলেন, 'ওরে, তুই আমার কাছে বোস্, ওতে দোষ নাই; তুইও যা, আমিও তা।' তখন যদি সে গিয়ে বসে, তাতে দোষ হয় না। সামান্য জীবেরা যদি বলে, 'আমি সেই', সেটা ভাল না।" "ভক্তির পথ ধ'রে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ভগবান সর্বশক্তিমান, মনে করলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন।···সেব্যসেবকভাব খুব

ভাল।...'আমিই সেই', এ অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবুদ্ধি থাকতে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়; এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায়, আবার নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝতে পারে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী সারদানন্দজী ভক্তিমার্গকে 'ইতি ইতি'-সাধনপথ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ঐ পথে সেবা ঈশ্বরের অভীপ্সিত রূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া সাধক কেমন করিয়া জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া ব্রজগোপিকাগণের স্থায় আপন ইষ্টের সহিত একত্বানুভব করেন অর্থাৎ 'সোঽহং'-অবস্থায় উপনীত হন, তাহা লীলাপ্রসঙ্গের সাধকভাবের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী সেব্যসেবকভাব বা বিচারমার্গ যাহা অনুকূল মনে হয়, অবলম্বন করিয়া সেই নির্বিভাগ চিদ্‌বস্তু সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশে আছে: "রামচন্দ্র নামক একজন জটাজুটধারী ব্রহ্মচারী একদিন ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করতে এসেছিলেন। তিনি বসে অন্য কোন কথাবার্তা না বলে, কেবল 'শিবোঽহম্' 'শিবোঽহম্' করতে লাগলেন। ঠাকুর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বল্লেন, 'কেবল 'শিবোঽহম্' 'শিবোঽহম্' করলে কি হবে? যখন সেই সচ্চিদানন্দ শিবকে হৃদয়ে ধ্যান করে তন্ময় হয়ে গিয়ে বোধে বোধ হয়, সেই অবস্থায় বলা চলে। তা ছাড়া শুধু মুখে 'শিবোঽহম্' বল্লে কি হবে? যতক্ষণ তা না হয়, ততক্ষণ সেব্যসেবক-ভাবে থাকাই ভাল।' ঠাকুরের এইরূপ নানা উপদেশে ব্রহ্মচারীর চৈতন্য হল এবং তিনি নিজের ভ্রম বুঝতে পারলেন। যাবার সময় দেয়ালের গায়ে লিখে রেখে গেলেন 'স্বামি-বাক্যে আজ হতে রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী সেব্য-সেবকভাব প্রাপ্ত হল'।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব রামচন্দ্র ব্রহ্মচারীকে যাহা বলিয়াছিলেন, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই একই কথা বলিয়াছেন: যাঁহারা অচিন্ত্য অনির্দেশ্য কূটস্থ অব্যক্ত অক্ষরকে উপাসনা করেন—'আত্মত্বেন উপগম্য উপাসতে', 'আমিই সেই অব্যক্ত অক্ষর' এই ভাবে উপাসনা করেন— তাঁহাদের ক্লেশ অধিকতর হয়। সেব্যসেবকভাবে উপাসনাতেও ক্লেশ যে নাই, তাহা নহে; ক্লেশ আছেই, কারণ, অনাদি সংস্কারবশে জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাম বহির্মুখ। সেই বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহকে চিরাভ্যস্ত বিষয়সেবা হইতে প্রত্যাহৃত করা ক্লেশকর, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেব্যসেবকভাবে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে ভগবৎকৃপায় সাধক ক্রমশঃ জিতেন্দ্রিয় ও জিতমনা হইয়া কৃতকৃত্য হন। এই পথ অপেক্ষাকৃত সুগম, 'সোঽহং'-উপাসনা দেহাভিমানী জীবের পক্ষে অতীব দুর্গম ও ক্লেশকর।

অদ্বৈতবেদান্তের অধিকারী না হইয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বিচারে প্রবৃত্ত হইলে জ্ঞানোদয় হয় না, জ্ঞানাভিমানই বর্ধিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—'যাঁরা জ্ঞানাভিমানী, তাঁরা শাস্ত্রমীমাংসা তর্কযুক্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন; বুদ্ধিমান ভক্তেরা ভগবানের কৃপালাভ ক'রে এ সংসারে পরমানন্দ ভোগ করেন।' এই কারণে সর্বসাধারণের জন্য তাঁহার ও তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যগণের শিক্ষাই ছিল এই যে, দ্বৈতের মাধ্যমে অদ্বৈততত্ত্বে পৌঁছাইতে হইবে। ইহাই সহজ পন্থা। অদ্বৈতসিদ্ধান্ত না জানিলে মানুষ উদার হয় না, সুতরাং ঐ সিদ্ধান্ত অবশ্যই জানিতে হইবে, কিন্তু নিজের আধ্যাত্মিক পরিস্থিতি কি, তাহাও বিশেষভাবে বিচার করিয়া বুঝিয়া তবেই একটি নির্দিষ্ট সাধন-পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ, নিজ সংস্কার কি তাহা সম্যক্ আত্মবিশ্লেষণপূর্বক না জানিয়া প্রতিকূল

সাধনমার্গ অবলম্বন করিলে, আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রতিপদে ব্যাহত হইতে বাধ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী স্বামী বাসুদেবানন্দকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। স্বামী বাসুদেবানন্দ লিখিয়াছেন :

"১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে এলাহাবাদ আশ্রমের ছাতে শুয়ে শুয়ে হরিপ্রসন্ন মহারাজ নানান্ বিষয় আলোচনা করতেন ; আকাশের নক্ষত্রগুলি দেখিয়ে জ্যোতিঃশাস্ত্র বুঝাতেন ; কখন কখন রামানুজ-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হোত। বলতেন, 'শ্রীভাষ্যটা বেশ ভাল করে পড, সেব্যসেবকভাব নিয়ে শরীরধারণ করাই ভাল। শংকরের অদ্বৈত নিয়ে থাকা খুব উত্তম অধিকারীর পক্ষেও কঠিন। রামানুজ চার ভাবে উপাসনার কথা বলেছেন, প্রথম, বৈকুণ্ঠনাথ—সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী ভগবান, অনন্ত অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, অনন্তকল্যাণ-গুণ-মহোদধি ; দ্বিতীয়, অন্তর্যামিরূপে সর্বজীব ও জড়ে বর্তমান—সুতোয় যেমন মালা গাঁথা, তাঁতে তেমনি জীবজগৎ গ্রথিত রয়েছে, তৃতীয়, অবতার ; যিনি লোকশিক্ষা, সাধু ও ধর্মরক্ষা আর ভক্তদের দর্শন দেবার জন্য আবির্ভূত হন ; এবং চতুর্থ, অর্চা (বিগ্রহ), যেখানে ভক্তিতে প্রকট হয়ে থাকেন। এর মধ্যে সবগুলোই বেশ ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় এবং এর কোন একটির সহিত সম্বন্ধ পাতিয়ে সংসারে বেশ সেব্যসেবকভাব নিয়ে থাকা যায়'।"[১]

১ উদ্বোধন, ২৩।১২৯

নামমাদুলি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আলোর কথা বলবে সে কে ?—খসেছে যার চোখের ঠুলি।
ধন্য যে হয় মা-কে দেখে—সে-ই ওঠে মা-র নামে দুলি'।
মা-র নামে কে দুলে ওঠে ?—বেসেছে যে মা-কে ভালো।
তার নয়নেই শুধু ফোটে করুণ রাতে অরুণ আলো।
বেদনায়ও শান্তি ঝরে মা-র করুণায়—দেখে ধ্যানী,
শূন্য হৃদয় ওঠে ভ'রে বিশ্বে শুনে মায়ের বাণী।
মা-র প্রসাদে খসে তারি বাঁধন যত, চোখের ঠুলি,
অভয় পেয়ে হয় দিশারি সে-ই—প'রে মা-র নামমাদুলি॥

মা-র জাদু ঘটায় অঘটন : ঝড়তুফানেও জ্বলে তারা :
চাউনিতে মা-র লক্ষ ভুবন ধায় পুলকে আপনহারা।
কেবল, যদি ফাঁকি থাকে—যায় না দেখা—কাঁটাবনে
কার-সে ছোঁওয়ায় গোলাপ জাগে, শরণ নেওয়া চাই চরণে।
ডাকতে হবে শিশুর ম'তই কান্না কেঁদে : "আয় মা কাছে !"
মা-র আদরে দুলব যতই—মিলবে মা-কে বুকের মাঝে।
মায়ার বাঁধন কাটবে তখন—পড়বে খ'সে চোখের ঠুলি,
মা-কে বরণ করব যখন প'রে মায়ের নামমাদুলি॥